

Live MCQ™

৪৯তম স্পেশাল বিসিএস (শিক্ষা) বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

বিষয়: ইতিহাস (১৮১)

Compendium PDF

(সিলেবাস অনুসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও এমসিকিউ-এর সমন্বয়ে রচিত)

Mentor:

ফাইরুজ আনিকা তালুকদার

প্রভাষক (ইতিহাস)

৪০তম বিসিএস

মেধাক্রম-৫ম।

প্রিয় শিক্ষার্থী, ৪৯তম স্পেশাল বিসিএস (শিক্ষা)-এর বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি হিসাববিজ্ঞান অংশের নির্ধারিত সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত সকল ক্লাস সম্পন্ন হয়েছে। আসন্ন চূড়ান্ত পরীক্ষাকে সামনে রেখে লাইভ এমসিকিউ একাডেমিক টিম আপনাদের প্রস্তুতিকে শাণিত করতে বিশেষ কমপেনডিয়াম পিডিএফ প্রদান করছে। এখানে যা যা থাকছেঃ

Contents

পিএসসি নির্ধারিত সিলেবাস ও মানবন্টন.....	3
১. বিশেষ গুরুত্বের টপিক	6
২. পড়াশোনার জন্য কৌশল:.....	6
২. মুখস্থ করার কৌশল.....	6
৩. অনুশীলনের কৌশল	6
৪. পরীক্ষার হলে কৌশল	6
৫. বিশেষ টিপস.....	6
বুকলিস্ট	7
সূচিপত্র:.....	7
মৌর্য শাসনামলে বাংলা	8
ভৌগোলিক আবিষ্কার	23
মুসলিম শাসন	56
মুঘল সাম্রাজ্য.....	59
ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন.....	67
যুদ্ধ.....	70
নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন	75
বঙ্গভঙ্গ	79
বয়কট' আন্দোলন	80
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য	93
মুক্তিযুদ্ধ	101
গুরুত্বপূর্ণ ২০০ প্রশ্ন.....	108

পিএসসি নির্ধারিত সিলেবাস ও মানবন্টন

৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫ এর সিলেবাস

HISTORY
(POST RELATED)
Subject Code: 181
Total Marks-100

Part-I
Marks-50
History of Bangladesh
(From earliest times to 1971 A.D)

Group-I: Ancient

10

- Maurya and Gupta rule in Bengal
- Sasanka
- Pala rule in Bengal: Rise of the Palas; Dharmapala; Devapala; Mahipala I; Samantra Rebellion during the reign of Mahipala II; Ramapala; glories of Palas
- Dynasties of South-Eastern Bengal: the Devas; the Chandras; the Varmans
- Sena rule in Bengal: VijayaSena; VallalaSena; Laksmansena; Glories of the Senas.

Group-II: Medieval

20

- Coming of the Muslims: Bakhtiyar Khalji; Ghitasuddin Iwaz Khalji
- Circumstances leading to the independence of Bengal
- Independent Sultanate: Shamsuddin Ilyas Shah; Ghiyasuddin Azam Shah; Alauddin Hussain Shah; Glories of the Hussain Shahi Period.
- Foreign Accounts on Bengal: Ibn Barutah; Ma-Huan
- Portuguese in Bengal
- Mughal occupation of Bengal and the Bara Bhuiyas;
- Mughal Subahdars: Shaista Khan; Mir Jumla; Murshid Quli Khan
- Bengal under the Nawabs: Alivardi Khan; Sirajuddaula

Group-III: Modern

20

- Coming of the English: Battle of Plassey; Battle of Buxar; Grant of Diwani to the East India Company
- The Permanent Settlement
- Early Resistance Movements against the British: Fakir-Sannyasi movement; Titumir
- Reform Movements: the Faraizi Movement; Rammohan Ray
- Partition of Bengal, 1905; Swadeshi and Non-Cooperation Movement
- Bengal Politics, 1937-1946; Lahore Resolution; Partition of 1947
- 1952 Language Movement and the Election of 1956
- Disparity between the two wings of Pakistan
- The demand for autonomy of East Pakistan; Six-Point Programme
- Eleven Point Movement of 1969
- Election of 1970 and its aftermath
- The War of Liberation and the emergence of Bangladesh

HISTORY

Part-II
Marks-50

Part-A
Marks-25

History of the Indian Subcontinent, 1206-1947
(Selected topics)

Group-I: Sultanate Period

- a. Coming of the Muslims: invasion of Sindh; invasion of Sultan Mahmud of Ghazni; Ghori invasion
- b. Sultans: Iltutmish; Ghiyasuddin Balban; Alauddin Khalji; Muhammad bin Tughlaq

Group-II: Mughal period

- a. Battle of Panipath and the foundation of Mughal rule; Badur
- b. Humayun's struggle with Sher Shah; Sher Shah's Reforms
- c. Akbar: Conquests, Revenue Reforms, Rajput Policy, Religious Policy: Mansabdari System
- d. Art and Architecture under Shahjahan; War of Succession
- e. Aurangzeb: Deccan Policy; Decline of Mughal Rule

Group-III: British period

- a. Battle of Plassey; Battle of Buxar and the Grant of the Diwani
- b. Consolidation of British rule: Warren Hastings; Cornwallis
- c. Expansion of British Rule: Wellesley; Dalhousi
- d. Social & Administrative Reforms: Ripon; Bentinck
- e. War of 1857
- f. Growth of Nationalism: Indian National Congress and the Muslim League; Partition of Bengal of 1905 and its aftermath; Swadeshi and Khilafat Movements; Act 1935; Lahore Resolution, 1940.
- g. Partition of 1947

Part -B
Marks-25

History of Europe, 1453 1945
(Selected Topics)

Group-I

- a. Geographical Discoveries; Impact on the subsequent course of history
- b. Martin Luther and Protestant Reformation
- c. Counter Reformation
- d. Benevolent Despots: Frederick; Peter; Catherine II; Joseph II
- e. Absolute Monarchy: Louis XIV of France

Group-II

- a. French Revolution: background and cause; role of the philosophers
- b. Napoleon: rise and conquests; reforms; fall of Napoleon
- c. congress of Vienna and Metternich
- d. French Revolutions of 1830 and 1848
- e. Unification of Germany
- f. Unification of Italy
- g. The Eastern Question; the Crimean War; the Berlin Congress

৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫ এর সিলেবাস

- h. World War I: background and causes; results; Versailles Treaty
- i. Rise of Socialism in Europe: the Bolshevik Revolution
- j. Rise of Hitler in Germany and Mussolini in Italy
- k. World War II: Background and cause; the Allied and Axis Powers; American involvement
- l. Yalta Conference; Potsdam Declaration
- m. The establishment of the UNO

✍ ১. বিশেষ গুরুত্বের টপিক

- মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট।
- দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতি (সার্ক, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক)।
- আধুনিক বিশ্বে বাংলাদেশ: জাতিসংঘে যোগদান, শান্তিরক্ষা মিশন।

📖 ২. পড়াশোনার জন্য কৌশল:

- প্রতিটি অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, ব্যক্তি, ঘটনা, চুক্তি মুখস্থ করুন।
- কারণ → ঘটনা → ফলাফল ফরম্যাটে অনুশীলন করুন।
- আগের বিসিএস প্রশ্নপত্র অনুশীলন বাধ্যতামূলক
- বারবার পড়ুন, ছোট নোট করুন – MCQ মূলত fact-based (তারিখ, ব্যক্তি, ঘটনা) হয়, তাই ছোট নোট থেকে বারবার পড়লে মনে থাকে।
- Timeline তৈরি করুন – কোন ঘটনা কবে ঘটেছে সেটা MCQ-তে বেশি আসে।
- কারণ-ঘটনা-ফলাফল আলাদা আলাদা করে পড়ুন।
- Similar Topics তুলনা করুন – যেমন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বনাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফারাজেজি বনাম তিতুমীর আন্দোলন।

✍ ২. মুখস্থ করার কৌশল

- Mnemonics ব্যবহার করুন → দীর্ঘ তালিকা সহজে মনে রাখতে সংক্ষিপ্ত রূপ বানান।
- Flash Card ব্যবহার করুন → একপাশে প্রশ্ন, অন্যপাশে উত্তর লিখে প্র্যাকটিস করুন।
- Daily Quiz → প্রতিদিন অন্তত ২০-৩০টি MCQ অনুশীলন করুন।

✍ ৩. অনুশীলনের কৌশল

- আগের বছরের বিসিএস MCQ বারবার সমাধান করুন – কমন পাওয়ার সুযোগ বেশি।
- Model Test দিন – সময় বেঁধে ৫০-১০০ MCQ প্র্যাকটিস করুন।
- ভুল উত্তর মার্ক করুন – কোন টপিকে বেশি ভুল হচ্ছে সেটা আলাদা করে পড়ুন।

✍ ৪. পরীক্ষার হলে কৌশল

- প্রথমে যেগুলো নিশ্চিত জানেন সেগুলো উত্তর দিন।
- Elimination Method – যেসব উত্তর জানেন না, সেগুলো থেকে ভুল অপশন কেটে বাদ দিন।
- সন্দেহজনক প্রশ্নে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করবেন না – পরে ফিরে আসুন।
- যদি নেগেটিভ মার্কিং থাকে 📖 তখন কেবল ৬০-৭০% নিশ্চিত হলে উত্তর দিন।
- সময় ব্যবস্থাপনা – প্রতিটি প্রশ্নে ৩০-৪০ সেকেন্ডের বেশি নেবেন না।

✍ ৫. বিশেষ টিপস

- প্রতিদিন সকালে বা রাতে আগের দিনের পড়া MCQ একবার রিভিশন করুন।
- তারিখ, বছর, চুক্তি, যুদ্ধ, নেতা → এগুলো MCQ-তে বেশি আসে।
- ছোট খাতা/মোবাইল নোটে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একসাথে লিখে রাখুন।

📖 সংক্ষেপে:

(Facts + Regular MCQ Practice + Elimination Method + Time Management) = MCQ-তে ভালো করার মূল চাবিকাঠি।

বুকলিস্ট

- হিস্টোরি অব বেঙ্গল (History of Bengal - ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার
- * বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১) - ড. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত
- * নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
- * উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিহাস বই
- বাংলাদেশের ইতিহাস: আধুনিক যুগ (১৯৪৭ পর্যন্ত
- মানুষের ইতিহাস

নূরুন নাহার বেগম

- Wikipedia
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এইসএসসি কোর্সের বই।

সূচিপত্র:

1. প্রাচীন শাসন ও শশাঙ্ক, পালদের উত্থান, পরবর্তী পাল ও আঞ্চলিক রাজবংশ, সেন শাসন ও পর্যালোচনা
2. মুসলিমদের আগমন ও স্বাধীন সুলতানি আমল, স্বাধীন সুলতানি আমল, বিদেশী বিবরণ ও মুঘল দখল, মুঘল সুবেদার ও নবাবগণ
3. ব্রিটিশ বিজয়, প্রাথমিক প্রতিরোধ ও সংস্কার আন্দোলন
4. বঙ্গভঙ্গ ও রাজনৈতিক উন্নয়ন (ঙ ও চ), দেশভাগ-পরবর্তী রাজনীতি ও বৈষম্য (ছ ও জ), পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামের সূচনা, স্বায়ত্তশাসন ও গণআন্দোলন (ঝ ও ঞ), ১৯৭০ এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ (ট ও ঠ), বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও চূড়ান্ত পর্যালোচনা (ঠ)
5. দিল্লি সলতানাত: সুসংহতকরণ ও বিস্তার, খিলজি ও তুঘলক রাজবংশ বিষয়: সিন্ধু বিজয়; সুলতান মাহমুদ ও তার অভিযান; ঘুরিদের আক্রমণ।
6. মুঘল আমল
7. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
8. বাংলায় ব্রিটিশ বিজয় এবং সুসংহতকরণ, ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার, সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ, : ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান ভৌগোলিক আবিষ্কার; মার্টিন লুথার এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট সংস্কার; প্রতি-সংস্কার; হিতৈষী স্বৈরশাসক: ফ্রেডরিক, পিটার, ক্যাথরিন II, জোসেফ II; নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র: ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই। ফরাসি বিপ্লব; নেপোলিয়ন; ভিয়েনা কংগ্রেস এবং মেটারনিখ; ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ সালের ফরাসি বিপ্লব; জার্মানি ও ইতালির একত্রীকরণ।
9. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (পটভূমি, কারণ, ফলাফল, ভার্সাই চুক্তি); ইউরোপে সমাজতন্ত্রের উত্থান (বলশেভিক বিপ্লব); জার্মানিতে হিটলার ও ইতালিতে মুসোলিনির উত্থান;
10. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (পটভূমি, কারণ, মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তি, আমেরিকার অংশগ্রহণ); ইয়াল্টা সম্মেলন, পটসডাম ঘোষণা; UNO প্রতিষ্ঠা।

মৌর্য শাসনামলে বাংলা

দিগ্বিজয়ী গ্রিকবীর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মনোবাসনা ছিল, পৃথিবীর প্রতিটি অংশকেই তিনি জয় করে নেবেন। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষ আয়তনে ছিল বিশাল, ধনসম্পদেরও ছিল না কোনো কমতি। তাই, বাকি সকলের মতো আলেকজান্ডারেরও দৃষ্টি পড়েছিল এই ভূমির উপরে।

তবে, ভারতবর্ষের ধূসর মাটিতে তার ক্ষমতাকাল বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। দাঁড় করালেন এক সেনাবাহিনী, হারালেন নন্দ রাজবংশকে। এভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাত ধরেই লৌহ যুগে মৌর্য রাজবংশের গোড়াপত্তন। খ্রি.পূ. ৩২২ অব্দ থেকে খ্রি.পূ. ১৮৫ অব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের পূর্ব এবং পশ্চিমের বৃহৎ এক অংশ ছিল তার শাসন আওতায়।

মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় চাণক্যের ভূমিকা

চাণক্যের সাথে মৌর্য সাম্রাজ্য ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও রাজ-উপদেষ্টা। সুপ্রাচীন রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থ ‘অর্থশাস্ত্র’ তাঁরই হাতেই রচিত। এই চাণক্য, কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও সুপরিচিত ছিলেন। চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। চাণক্যের রাজনৈতিক কূটকৌশলের আরও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় বিশাখদত্ত রচিত মুদ্রারাক্ষস নাটকে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্বদিকে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে অবস্থিত মগধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই মৌর্য সাম্রাজ্য। পাটলিপুত্র ছিল এর রাজধানী। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের স্বেচ্ছা অবসরের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পুত্র বিন্দুসার।

মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের (২৬৯-২৩২খ্রি.পূ.) রাজত্বকালে উত্তর বাংলার বৃহদাংশ মৌর্যদের দখলে গিয়েছিল বলে জোরালো ঐতিহাসিক অভিমত রয়েছে। মহাস্থানগড় এর নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত একটি শিলালিপির ভাষ্য হতে বাংলাদেশে মৌর্য শাসন বিস্তৃত হয়েছিল বলে ধরা হয়। এই শিলালিপিতে যদিও অশোকের নাম সরাসরি উল্লেখ নেই, তবে এই লিপির ভাষ্য বিশ্লেষণ করে ‘পু-রবর্ধন ভুক্তিটির’ রাজধানী হিসেবে আজকের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়কে চিহ্নিত করা হয়। পু-রবর্ধনের তখনকার নাম ছিল ‘পু-রনগর’। অন্যদিকে অজ্ঞাতনামা গ্রিক বিবরণ পেরিপ্লাস অব দ্যা ইরিথ্রিয়ান সী, টলেমির ভূগোল-বর্ণনা, বিভিন্ন প্রাচীন গ্রিক এবং অন্যান্য বিবরণীতে বাংলায় মৌর্য শাসন বিস্তৃত হওয়ার ধারণা পাওয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হলে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে উন্মত এক সংস্কৃতির পত্তন করেছিলেন মৌর্য বংশের রাজারা। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে মহাস্থানগড়ে ধারাবাহিকভাবে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন ও মুসলিম যুগের নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং ইতিহাসের বিচারে মহাস্থানগড় অঞ্চলটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তর বাংলা মৌর্য রাজবংশের কাছে পরাভূত হলে মহাস্থানগড়ে একটি প্রদেশ গড়ে তোলা হয়। তখন এর নাম ছিল ‘ভুক্তি’। উত্তর বাংলার এই মৌর্য প্রদেশের নামই ‘পু-রবর্ধন ভুক্তি’ ছিল বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন। আজকের এই মহাস্থানগড় অঞ্চলের ‘পু-রবর্ধন ভুক্তি’র রাজধানী ছিল পু-রনগর। পু-রনগর বা মূল রাজধানী শহরটি ছিল অনেকটা দেয়াল ঘেরা দুর্গের মতো। বর্তমানে বাংলাদেশের সবথেকে বড় ও প্রাচীন দুর্গনগরী হিসেবে পু-রনগরীর ধ্বংসাবশেষকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বগুড়া শহরের প্রায় ১৩ কিমি উত্তরে অবস্থিত এই নগরীর ধ্বংসাবশেষটি নদীর সমতল থেকে আনুমানিক ৬ মিটার উঁচু প্রতিরক্ষা প্রাচীর দিয়ে চারদিকে বেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রবাহিত করতোয়া নদী মহাস্থান দুর্গ নগরীকে প্রাকৃতিক নিরপত্তা নিশ্চিত করেছিল। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এই এলাকাকে পু-রনগরীর ধ্বংসাবশেষ হিসেবে আবিষ্কার করেন স্যার

আলেকজান্ডার কানিংহাম।

কলিঙ্গ যুদ্ধ সম্রাট অশোককে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছিল। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা এতোই তীব্র ছিল যে, প্রায় ১ লক্ষ মানুষ এতে প্রাণ হারিয়েছিলেন, নির্বাসিত হয়েছিল দেড় লক্ষেরও বেশি। তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হন তিনি। এই যুদ্ধের পরেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, জীবনে আর কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা সংঘর্ষে জড়াবেন না। তিনি সকলকেই হানাহানি, সন্ত্রাস রাহাজানি এসব ত্যাগ করে শান্তিতে বসবাসের আহ্বান জানান। হয়ে যান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক, শান্তিকামী, প্রজাবৎসল এক রাজা। তার আমলে শুধু মৌর্য সাম্রাজ্যই নয়, এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর শুরু হয় সাম্রাজ্য পতনের ধারা। অশোকের প্রয়াণের ৫০ বছর

পর, মৌর্য রাজবংশের শেষ সম্রাট **বৃহদ্রথ** খুন হন তার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক **পুষ্যমিত্রের** হাতে। এই পুষ্যমিত্র **শুঙ্গ রাজবংশের** প্রতিষ্ঠাতা।

শুঙ্গ যুগ

মৌর্য আমলের পর বাংলার ইতিহাসে শুঙ্গদের আগমনের বিষয়টি অনুমান করা হয়।

কুষাণ যুগ

ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ধারণা করা হয়, উমহাদেশে **প্রথম স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন কুষাণ সম্রাটগণ** যা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে ধরা যায়। কুষাণ সম্রাট **বীম কদফিসেসই** সম্ভবত সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করেন যেখানে মুদ্রার উপরিপৃষ্ঠে বেদিতে যজ্ঞরত রাজার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রত্যেকাত্তিকগণ মনে করেন, এই বিশেষ প্রতিকৃতি পার্থিয়ান রাজা গোটার্জেসের স্বর্ণমুদ্রার নকশা দ্বারা প্রভাবিত।

গুপ্ত যুগ

তথ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায়, খ্রিস্টীয় প্রায় ৪ শতকের শুরুতে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রথম গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মগধ বা বরেন্দ্রের অধিপতি ছিলেন গুপ্তদের আদিপুরুষ **শ্রীগুপ্ত**। এরপর তার পুত্র **ঘটোটকোচ** গুপ্ত ততটা সুবিধা করতে না পারলেও শাসক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন গুপ্ত বংশের সম্রাট **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত** (খ্রিস্টীয় ৩২০-৩৪০ অব্দ)। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের হাত ধরে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একে একে **সমুদ্রগুপ্ত** (খ্রিস্টীয় ৩৪০-৩৮০ অব্দ), **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য** (খ্রিস্টীয় ৩৮০-৪১৫ অব্দ), **১ম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য** (খ্রিস্টীয় ৪২৫-৪৫৫ অব্দ), **স্কন্ধগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের** (খ্রিস্টীয় ৪৫৫-৪৬৭ অব্দ) প্রবল পরাক্রান্ত শাসন লক্ষ করা যায়। তবে পরবর্তীকালের গুপ্ত শাসকগণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলেন। তারপর **হুনদের** আক্রমণের মধ্য দিয়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সমুদ্রগুপ্ত সাত ধরনের স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন।

বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগেরই সর্বোচ্চ লিপিতাত্ত্বিক সূত্র পাওয়া যায়। বেশিরভাগ তামার পাত্রে লিখিত এইসব লিপিকে বলা হয় **‘তাম্রশাসন’**। গুপ্ত শাসনামলে বাংলায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ করা যায়। একে সংস্কৃত ভাষা চর্চা ও সাহিত্যিক উন্নয়নের **স্বর্ণযুগ** হিসেবেও অভিহিত করা হয়। গুপ্ত আমলের **গুপ্তব্রাহ্মী লিপির** মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা ফুটিয়ে তোলা হতো যা ইতিহাসের সূত্র হিসেবে টিকে আছে খ্রিস্টীয় ৪ থেকে ৭ শতক পর্যন্ত গুপ্ত সম্রাটরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করেন **স্বাধীন বঙ্গরাজ্য** : **গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব** প্রাথমিকভাবে সমতটে বৈশ্যগুপ্তের পূর্বের কোনো রাজার নাম অদ্যাবধি জানা যায়নি। ফলে **বৈশ্যগুপ্তকেই** গুপ্তগুপ্তের বাংলার প্রাচীনতম রাজা বলে মনে করা হয়। ইতিহাসের আবর্তনে গুপ্ত শাসনের পরে (৬-৮ শতক) গৌড় ও বঙ্গে স্বাধীন রাজত্বের বিকাশ ঘটে, খ্রিস্টীয় ৬ শতকে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। মুদ্রা ও লিপিমাল্য এ রাজ্যের তিনজন রাজার নাম জানা যায় গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। বস্তুত তাঁরা ছিলেন বঙ্গের শক্তিশালী শাসক যারা খুব সম্ভবত **কোটালিপাড়া** থেকে রাজ্য শাসন করতেন।

গৌড়রাজ শশাঙ্ক

গুপ্ত রাজবংশের শেষদিকে উত্তর বাংলার মহাসামন্ত **শশাঙ্ক** ক্রমশ শক্তিশালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি তার অধীনে থাকা উত্তরবঙ্গ তথা গৌড়ের স্বাধীন নরপতি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। বিহারের রোটাসগড়ে একটা পাহাড়ের গায়ে প্রাপ্ত সিলে ‘**শ্রী শ্রী মহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবস্য**’ কথামালা উৎকীর্ণ ছিল, যার অর্থ একজন মহাসামন্ত বা শাসক হিসেবে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

স্বাধীন গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর শশাঙ্ক খুব শক্তিশালী রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। গুপ্তগুপ্তের কালের সম্রাট শশাঙ্ক গৌড়ধিপতি হিসেবে উত্তর ও পশ্চিম বাংলার বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁর রাজ্য গড়ে তোলেন। পাশাপাশি মগধ বা দক্ষিণ বিহার, উৎকল ও কঙ্গোদ বা উত্তর উড়িষ্যার উপরেও তিনি আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

তিনি তার জীবদ্দশায় অনেক রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরসূরীর অভাবে এসব রাজ্যের অনেকটাই আবার হাতছাড়া হয়ে যায়।

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের অবসানের পর উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় **কর্ণসুবর্ণকে** কেন্দ্র করে **শাধীন গৌড় রাজ্যের** উদ্ভব ঘটেছিল। সপ্তম খ্রিস্টাব্দে আগত চীনা পর্যটক **হিউয়েন সাঙের** বিবরণী ও **বাণভট্টের** লেখা **হর্ষচরিত** গ্রন্থ থেকেও রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। গৌড় শৈব ধর্মানুসারী শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন যার প্রমাণ রয়েছে হিউয়েন সাং এর বিবরণীতে। তবে হিউয়েন সাং ব্যক্তিগতভাবে শশাঙ্ককে

পছন্দ করতেন না। শশাঙ্কের শত্রু থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন ছিলেন হিউয়েন সাঙের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। অপর একজন বর্ণনাকারী বাণভট্টও ছিলেন শশাঙ্কের বিরোধী।

নাথ ও রাত রাজবংশ

রাত রাজবংশের পর সমতটের রাজধানী দেবপর্বতের সিংহাসন দখল করে খড়্গবংশ। **লোকনাথ** ছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন শক্তিশালী রাজা যিনি সমতটেশ্বর রাত-রাজ্যের অংশবিশেষ দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খড়্গ রাজবংশ

রাত রাজবংশের পর সমতটের রাজধানী দেবপর্বতের সিংহাসন দখল করে খড়্গবংশ।

দেব রাজবংশ

খড়্গ রাজবংশের পতনের পর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় দেব রাজবংশের উত্থান ঘটে। দেব রাজবংশের চারজন বিখ্যাত রাজার নাম শ্রী শান্তিদেব, শ্রী বীরদেব, শ্রী আনন্দদেব ও শ্রী ভবদেব। সাত শতকের শেষ ভাগ থেকে আট শতকের প্রথমার্ধে (৭৫০-৮০০খ্রি.) দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ দেব রাজবংশের অধীনে শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের রাজধানী ছিল বর্তমান **লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের দেবপর্বত**। ময়নামতির শালবন বিহার খনন করে এই রাজবংশের চারটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। দেববংশের রাজারা প্রাথমিক যুগের পাল রাজাদের সমসাময়িক ছিলেন। পাল রাজারা ময়নামতি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এর নিদর্শন শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার প্রভৃতির কথা বলা যায়। **আনন্দদেব** ছিলেন দেব রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি প্রায় ৩৯ বছর দেবপর্বতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা **আনন্দদেবের আনন্দবিহার ও ভবদেবের সময় নির্মিত শালবন বিহার তথা ভবদেব মহাবিহার** ঐ সময়ে বিকশিত বৌদ্ধ সংস্কৃতির কথা জানান দেয়।

হরিকেল রাজত্ব

ময়নামতির আশেপাশের দেবপর্বতে দেব রাজবংশের পতনের পর অষ্টতম থেকে দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে হরিকেল রাজ্যের বিকাশ ঘটেছিল যা চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হরিকেল রাজ্যের তিনজন রাজার নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন, দেবাতিদেব, কান্তিদেব ও আত্মাকরদেব।

চন্দ্র রাজবংশ

হরিকেল রাজ্যের পর দশম শতকের প্রথমভাগে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে উত্থান ঘটে শক্তিশালী চন্দ্র বংশের। তারা দোর্দ-প্রতাপের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ শাসন করেছিলেন। চন্দ্র রাজবংশের পাঁচজন শক্তিশালী শাসক ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র প্রায় ১৫০ বছর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা শাসন করেছিলেন। তবে এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **শ্রীচন্দ্র**। ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের রাজত্বকালে অনেকগুলো লিপি ও তাম্রশাসন পাওয়া যায়। বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে অবস্থিত **মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর** ছিল চন্দ্র রাজাদের রাজধানী।

বর্ম রাজবংশ

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে বর্মরাজাদের উত্থান ও ক্রমবিকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগার শতকের শেষভাগে বঙ্গে বর্মরাজাদের উত্থান ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। সেন রাজাদের হাতে পরাজিত হওয়ার পূর্বে ১০৮০ থেকে ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বর্মরাজগণ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার অধীশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বর্মবংশের বিখ্যাত রাজা জাতবর্মী, হরিবর্মী, সামলবর্মী এবং ভোজবর্মী এই অঞ্চল শাসন করেন। বাংলাদেশে বর্মদের চারটি লিপি পাওয়া গেছে যা থেকে তাদের ইতিহাস পুনর্গঠন করা হয়ে থাকে।

পাল শাসনপর্বের গুরুত্ব

শশাঙ্কের রাজ্যের পতনের পর বাংলা অঞ্চলে নৈরাজ্য দেখা দেয়। এই সময় এই অঞ্চলে কোনও কেন্দ্রীয় শাসক ছিলেন না। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপতিরা নিরন্তর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সমসাময়িক গ্রন্থে এই অবস্থাতিকে ‘মাৎস্যন্যায়’ (অর্থাৎ বড়ো মাছ যেমন ছোটো

মাছকে খেয়ে ফেলে, সেই রকম অবস্থা) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সময়েই গোপাল প্রথম পাল রাজা হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাৎস্যন্যায়ের সময়টি ছিল মোটামুটিভাবে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যকার প্রায় একশো বছর।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সুদীর্ঘ পাল শাসনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ সময়ে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার কারণে শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। উত্থান-পতন আর শক্তিমত্তার বিচারে বাংলায় পাল শাসনকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা: ক) গোপাল কর্তৃক বাংলায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে পাল শাসনের উন্মেষপর্ব; খ) ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৮১-৮২১ খ্রি.) ও দেবপালের (আনুমানিক ৮২১-৮৬১ খ্রি.) মাধ্যমে পাল রাজত্বের উত্থানপর্ব এবং গ) প্রথম মহীপালের (আনুমানিক ৯৯৫-১০৪৩ খ্রি.) নেতৃত্বে সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন হলেও এসময় থেকেই পাল রাজত্বের গৌরবে ভাটা পড়ে। রামপালের (আনুমানিক ১০৮২- ১১২৪ খ্রি.) উত্তরাধিকারীদের দুর্বল শাসনের যুগকে তাই পালদের ইতিহাসে অবনতি ও পতনের যুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ধর্মপাল ও ত্রি-পক্ষীয় সংঘর্ষ

অষ্টম শতকের শেষের দিকে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাষ্ট্রকূট, মালব-রাজপুতনার গুর্জর প্রতিহার ও গৌড়-বরেন্দ্র-মগধ অঞ্চলের পালদের মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এই সংঘর্ষে পালরাজ ধর্মপাল বার বার পরাজিত হলেও তার শক্তিমত্তা অটুট থাকে। মর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিক্রমশীল বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁর। নয় শতক থেকে বারো শতক পর্যন্ত সমগ্র ভারতে এটি ছিল বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারও ধর্মপালের আরেক কীর্তি।

দেবপাল

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবট দেবপাল নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

পালদের দুর্বলতা ও কৈবর্ত বিদ্রোহ

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল রাজারা সামরিক শক্তিতে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েন। ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলার কিছু অংশবিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ কম্বোজরাজ রাজ্যপালের অধীনে চলে যায়। এরপর ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী কৈবর্তসম্প্রদায়ের সাথে সামন্তবর্গ একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁরা উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী দিব্যের নেতৃত্বে অত্যাচারী পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। বাংলার ইতিহাসে এই প্রতিরোধ ‘কৈবর্ত বিদ্রোহ’ হিসেবে পরিচিত। বরেন্দ্র বিদ্রোহ (যা কৈবর্ত বিদ্রোহ নামেও পরিচিত) ছিল উত্তর বাংলার সামন্তপ্রভু কৈবর্ত সর্দার দিব্য (দিব্যক) এর নেতৃত্বে রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের মাধ্যমে কৈবর্তরা বরেন্দ্রকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিল। এই বিদ্রোহটি ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ পরবর্তীকালে মহীপালের ভাই রামপাল সামন্তবর্গের সহযোগিতায় পাল রাজত্ব পুনরুদ্ধার করেন। রামপাল গৌড়ের কাছে রামাবতী নামে একটি নগর গড়ে তোলেন এবং সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। সন্ধ্যাকর নন্দি তাঁর ‘রামচরিত কাব্যে’ রামাবতী নগরীর বিপুল ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করেছেন। তবে রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজত্ব আর বেশি দিন টিকতে পারেনি। ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ সাম্রাজ্য অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাংলায় সেন শাসনামল

বাংলার ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় একটি বহুলআলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ শাসনকাল হচ্ছে সেন শাসনামল। এগার শতকের শেষ দিকে আনুমানিক ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দে সেনযুগের সূচনা। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় সেন শাসনামল স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। সেন রাজারা বাংলার ভূমিপুত্র নয়। তাদের আগমন ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট বা কর্ণাটক রাজ্য থেকে। পাল এবং চন্দ্র রাজাদের সৈন্যবাহিনীতে চাকরির সুবাদে তাদের অনেকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। একসময় শক্তি অর্জন করে তারা পুরো বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। পরবর্তীকালে তুর্কি সেনানায়ক বখতিয়ার খলজীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাদের এই ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

বিজয় সেন

পাল রাজাদের দুর্বলতা ও চন্দ্র রাজাদের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে বিজয় সেনের হাত ধরে গৌড় ও বঙ্গ জনপদে সেন শাসনপর্বের উত্থান ঘটে।

বল্লাল সেন

বিজয় সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রি.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সেনদের বিশাল সাম্রাজ্যের ঐক্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। শাসক হিসেবে শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি কবি ও পণ্ডিত হিসেবেও বল্লাল সেনের খ্যাতি ছিল। তিনি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্রতসাগর, আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর। তবে অমৃতসাগর এর রচনাকাজ তিনি জীবদ্দশায় শেষ করতে পারেননি। পরে তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন এর কাজ শেষ করেন। কিন্তু অমৃতসাগর ও দানসাগর বাদে অন্য তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। পিতা বিজয়সেনের মতো শিবের উপাসক বল্লাল সেন গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে পরম মহেশ্বর উপাধি ধারণ করেন। বঙ্গীয় কুলজি গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী বল্লাল সেন কৌলিণ্য প্রথার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। বল্লাল সেনের সময় বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনেক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় সমাজে নতুন করে শ্রেণিভেদ প্রথার শেকড় গ্রোথিত হয়। উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণরা নিম্নশ্রেণির মানুষকে ধর্মীয় আধিপত্যের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন নিয়মনীতি ও আইন কানুনের শিকলে বেঁধে ফেলে। তারা নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে শোষণ ও অত্যাচার শুরু করে। শাসক হিসেবে তিনি অধিরাজ নিঃশংক শংকর ও গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেছিলেন। শাসক হিসেবে তিনি অধিরাজ নিঃশংক শংকর ও গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন

বল্লাল সেনের পর বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন লক্ষ্মণ সেন। পিতার যোগ্য উত্তরসূরী লক্ষ্মণ সেনের দক্ষতা ও রণকৌশলের গুণেই সেন রাজত্ব উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। আবার এই লক্ষ্মণ সেনের শাসনামলেই সেন শাসনামলের পতন ঘটে।

প্রচলিত ইতিহাসে লক্ষ্মণ সেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন পঞ্চরত্ন অর্থাৎ ৫জন--

১) গোবর্ধন আচার্য, ২) শরণ, ৩) নথোয়ী, ৪) উমাপতিধর, ৫) জয়দেব

লক্ষ্মণসেনের বাবা বল্লাল সেনের মন্ত্রী ছিলেন হলায়ুধ মিশ্র। তিনি সেকশুভদয়া রচনা করেছেন।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজি রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করে। লক্ষ্মণ সেন নদীপথে পালিয়ে পূর্ববঙ্গের রাজধানী বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১২৩০ সাল পর্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন নামমাত্র শাসন করে।

সেন বংশের শেষ রাজা হচ্ছেন লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেন।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি (বখতিয়ার খলজি):

তিনি ছিলেন একজন তুর্কি-আফগান সেনাপতি, যিনি ১১৯৮ থেকে ১২০২ সালের মধ্যে বাংলা ও বিহার জয় করেন এবং সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলার খলজি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

গিয়াসউদ্দিন ইউয়াজ খলজি:

তিনি বখতিয়ার খলজির একজন গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি এবং পরে বাংলার একজন শাসক ছিলেন।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসকগণ দিল্লির সুলতানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনামলে বাংলাকে সোনারগাঁও, লখনৌতি ও সাতগাঁও এই তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের (তাতার খান) মৃত্যু হলে 'ফখরা' বা ফখরুদ্দিন নামে তাঁর একজন সিলান্দার (বর্মরক্ষক) সাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি 'মুবারক শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। এ সময় দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় বাংলায় ফখরুদ্দিনের বিরুদ্ধে তিনি কোন অভিযান প্রেরণ করতে পারেননি। ফলে বাংলা দিল্লির প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ফখরুদ্দিন বাংলায় তাঁর কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করলে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলায় দু'শো বছরের সাধীন ইতিহাসের সূচনা হয়।

সোনারগাঁও-ই হল সাধীন বাংলার প্রথম রাজধানী।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ছিলেন বাংলার প্রথম সাধীন সুলতান। একজন যোগ্য শাসক ও কূটকৌশলী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি নিজ নামে মুদ্রা জারি করেন। তিনি তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অনেকটা সম্প্রসারণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিজয় করেন এবং এ পর্যন্ত সমগ্র

ভূ-ভাগে তাঁর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে ছিল। লখনৌতি দখলের জন্য বার বার চেষ্টা করেও তিনি সফলতা পাননি। তিনি চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণী

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজত্বকালে সুদূর আফ্রিকার মরক্কো থেকে ইবনে বতুতা নামে একজন মুসলিম পর্যটক ১৩৪৫-৪৬ খ্রি. বাংলায় আসেন। তাঁর ‘রেহেলা-ই-ইবনে বতুতা’ নামক ভ্রমণ বিবরণীতে সমসাময়িক বাংলায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তিনি তৎকালীন বাংলার কৃষি, বাণিজ্য, সামাজিক অবস্থা, সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, নারীর মর্যাদা ইত্যাদির প্রশংসা করেছেন। ইবনে বতুতা সিলেটের প্রখ্যাত সাধক হযরত শাহজালালের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তীকালে তিনি চীনের রাজদরবার গমনের উদ্দেশ্যে বাংলা ত্যাগ করেন।

সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২-১৩৫৮ অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলিম শাসক।

তিনি ১৩৪২ সালে সোনারগাঁও বিজয়ের পর লখনৌতির সুলতান হন।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম স্বাধীন সুলতান ছিলেন এবং ইলিয়াস শাহী বংশের সূচনা করেন, যা ১৫২ বছর ক্ষমতায় ছিল।

ইলিয়াস শাহী বংশ ১৩৪২ সাল থেকে ১৪১৫ সাল পর্যন্ত একটানা ৭৩ বছর অবিভক্ত বাংলা শাসন করে এবং এরপর প্রায় ২০ বছর বিরতি দিয়ে আরো ৫২ বছর তাদের শাসন চলেছিল। সুলতান ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সুলতান সিকান্দার শাহ ক্ষমতায় আসেন। [বাংলার ইতিহাসে তাকে মহাবীর আলেক্সান্ডারের সাথে তুলনা করা হয়। ইলিয়াস শাহকে মধ্যযুগীয় মুসলিম বাংলার ইতিহাসে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বলা যায়। তার শাসনামল থেকেই বাঙালিরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ ‘বাঙালি’ নামে পরিচিত হতে থাকে, এবং বাংলার বাইরে থেকেও তাদেরকে বাঙালি বলে অভিহিত করা হয়। ইলিয়াস শাহ ‘শাহ-ই-বাঙ্গলাহ’ ও ‘শাহ-ই-বাঙালি’ উপাধি ধারণ করে বাঙালিদের জাতীয় নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কারণে তাকে মধ্যযুগীয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক বলা যায়।

আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ ১৩৫৮ – ১৩৯০

যিনি সাধারণত সিকান্দার শাহ নামেই বেশি পরিচিত, ছিলেন বাংলার দ্বিতীয় সুলতান। ইলিয়াস শাহী রাজবংশোদ্ভূত সিকান্দার ছিলেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের ছেলে। ১৩৫৯ সনে তিনি দিল্লির সুলতানকে পরাজিত করেন। ১৩৫৮ সালে তিনি পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন।

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ:

শাসনকাল: ১৩৯০-১৪১১ ছিলেন ইলিয়াস শাহী রাজবংশের তৃতীয় সুলতান। তার প্রকৃত নাম আজম শাহ। সিংহাসন আরোহণের পর তিনি গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নাম ধারণ করেন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ পণ্ডিত ও কবিদের সমাদর করতেন। পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তার পত্রবিনিময় হত। বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তার বিখ্যাত রচনা ইউসুফ জুলেখা এ সময়ে সম্পন্ন করেন। এসময় কৃতিবাসের রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করা হয় ১৪১১ সালে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ৫৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে তার মাজার রয়েছে। এটি বাংলাদেশের সুলতানি আমলের অন্যতম দৃশ্যমান নিদর্শন, যা সোনারগাঁও উপজেলার শাহচিলাপুরে অবস্থিত হোসেন শাহী রাজবংশ হোসেন শাহী রাজবংশ ১৪৯৪ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা শাসন করে।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। তার রাজত্বকালে বাংলায় এক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ দেখা যায়। তিনি কামরূপ, কামতা ও উড়িষ্যার জাজনগর অধিকার করেছিলেন। তার রাজ্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালেই চট্টগ্রামে পর্তুগিজ বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়। তার আমলে বর্তমান বাংলাদেশ-র ভারত সীমান্তবর্তী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা-র শিবগঞ্জ উপজেলা-র ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয়।

হোসেন শাহের শাসনামলে বাংলা সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। হোসেন শাহের অধীন চট্টগ্রামের শাসক পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর তার পান্ডববিজয় রচনা করেন। এটি মহাভারতের একটি বাংলা সংস্করণ। একইভাবে পরাগল খানের উত্তরাধিকারী

হিসেবে চট্টগ্রামের গভর্নর হওয়া তার পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের আরেকটি সংস্করণ বাংলায় রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তার পাণ্ডববিজয় গ্রন্থে হোসেন শাহকে কলি যুগের কৃষ্ণের অবতার হিসেবে প্রশংসা করেছেন। [বিজয় গুপ্ত তার মনসামঙ্গল এসময় রচনা করেন। তিনি হোসেন শাহকে অর্জুনের সাথে তুলনা করেছেন। এতে হোসেন শাহকে নৃপতি-তিলক (তিলক অর্থ রাজার চিহ্ন) ও জগৎ-ভূষণ (বিশ্বের সৌন্দর্য) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হোসেন শাহের একজন কর্মকর্তা যশরাজ খান কিছু সংখ্যক বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। তিনিও তার একটি পদে হোসেন শাহের সুনাম করেছেন। হোসেন শাহের আমলে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ইমারত গড়ে উঠে। ওয়ালি মুহাম্মদ গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন।

নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ

বাবরের ভারত অভিযানকালে নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ আফগান নেতাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। যদিও তিনি নিজে নিরপেক্ষ থাকেন। নুসরাত শাহ বাবরের সঙ্গে চুক্তি করে বাংলাকে বাবরের অভিযানের হাত থেকে রক্ষা করেন। নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহ এর সময় বাংলা সালতানাত তার সোনালী যুগে পৌঁছে। শাসনের প্রথমদিকে নতুন অঞ্চল জয় করে সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করলেও ১৫২৬ সালের পর তাকে মোগলদের সাথে ঘাঘরার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়।

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ এই বংশের শেষ সুলতান যিনি গৌড় থেকে রাজ্যশাসন করতেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে তাকে আফগান শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। ১৫৩৮ সালে আফগানরা গৌড় অধিকার ও লুণ্ঠন করে। এরপর মুঘল আগ্রাসনের পূর্বে কয়েক দশক তারা গৌড়েই বসবাস করেছিলেন।

প্রাচীন বাংলায় পর্যটক

ফা হিয়েন

আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৩৯৯ অব্দে পায়ে হেঁটে বাংলা ভ্রমণে আসেন চীন দেশের ফা হিয়েন। তিনি মূলত একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিব্বতের পামীর মালভূমির দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সঙ্গীদের সাথে তিনি এখানে আসেন। ৩৯৯-৪১২ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করেন। তার লেখা ভ্রমণকাহিনীতে প্রাচীন বাংলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন- সে সময়ে এখানে চণ্ডাল ছাড়া কেউ প্রাণীহত্যা করতো না।

হিউয়েন সাং

হিউয়েন সাং একাধারে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, পর্যটক এবং অনুবাদক ছিলেন। ৬৩০-৬৪০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে চীনের এই পরিব্রাজক বাংলা ভ্রমণ করেন। চীন ও ভারতের মধ্যকার যোগসূত্র স্থাপনে তার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। মূলত গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও নিদর্শন পরিদর্শন এবং অন্যান্য ভিক্ষুদের রচনাবলী সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি এই ভ্রমণ শুরু করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তিনি সমতট (কুমিল্লার কিছু অংশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী ও চাঁদপুর অঞ্চল), পুণ্ড্র, হরিকেল (চট্টগ্রাম, কুমিল্লার কিছু অংশ, ত্রিপুরা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা) ও চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল) জনপদ ভ্রমণ করেন। তার লেখা ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায় ঐ সময়ে তিনি সমতটের প্রায় ৩৫টি বিহার ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন। সেখানে তার সাথে অধ্যাপক শীলভদ্রের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে প্রায় ৭০০ ভিক্ষু দেখেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

ই-সিং

সপ্তম শতকে বাংলায় আসেন আরেক চীনা নাগরিক 'ই-সিং'। তিনি হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল ঘুরে দেখেছিলেন। তার বর্ণনামতে তখনকার সময়ে শালি ধানের ভাত বেশ জনপ্রিয় ছিল। মাষকলাই, তিল, মুগ ও যবের চাষ হতো প্রচুর পরিমাণে। নানারকম পিঠা পায়েস ও মিষ্টির চল ছিল। কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছ আর পাট শাক ছিল চরম উপাদেয়। তৎকালীন লোকেরা গবাদিপশু রক্ষায় এবং নানা ধরণের বিপদে-আপদে মন্ত্ৰের সাহায্য নিতো। নবম শতকে, মতান্তরে ১১৫১ সালে, বাংলা ভ্রমণে এসেছিলেন আরব দেশের পর্যটক সোলায়মান। তার লেখা ভ্রমণ কাহিনীর নাম 'সিল সিলাত আল তাওয়ারিখ'। এই বইটি পরে লন্ডন থেকে প্রকাশ করা হয়। তিনি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও এই অঞ্চলের মানুষের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ইবনে বতুতা

দিব্লি সফরে আসেন তখন দিব্লির সুলতান ছিলেন মুহাম্মদ বিন তুঘলক।

ইবনে বতুতা ৯ই জুলাই, ১৩৪৬ সালে বাংলায় এসে পৌঁছান। তিনি প্রথমে বাংলার যে অংশে প্রবেশ করেন তার গ্রন্থে তিনি সেই জায়গার নাম উল্লেখ করেছেন ‘সাঁদকাও’ (চাটগাঁও) সেখান থেকে তিনি কামরূপের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন।

তার গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন,

একটানা ৪৩ দিন সাগরে ভেসে আমরা বাংলাদেশে এসে পৌঁছালাম। সবুজে শ্যামলে ঘেরা বিশাল এক দেশ। এখানে প্রচুর চাল পাওয়া যায়। অন্য সব জিনিস এত সস্তায় পাওয়া যায় যা অন্য কোথাও আমি দেখিনি। তবে দেশটির কিছু হতাশাব্যঞ্জক দিক রয়েছে খোরাসানের (আফগানিস্তান) লোকেরা দেশটিকে বলে ‘প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা জাহান্নাম’- দোজখ-ই-পুর নিয়ামত’ ইবনে বতুতার বর্ণনায় পাওয়া যায় তৎকালীন বাংলাদেশ ১ দিরহাম দিয়ে আটটি মুরগি পাওয়া যেত। এছাড়া এক দিরহাম দিয়ে ১৪টি কবুতর পাওয়া যেত। দুই দিরহামের পাওয়া যেত একটি ভেড়া। দাস-দাসী কিনতে পাওয়া যেত এক স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও কম মূল্যে।

মালদ্বীপে থাকা অবস্থায় তিনি বলেন, এখানকার মানুষ কড়ি সংগ্রহ করে বাংলাদেশ থেকে চাল আমদানি করতো। এক স্বর্ণ দিনারের মান ৪ লাখ করি। বাংলাদেশেও তখন কড়ির সাহায্যে লেনদেন হতো।

ইবনে বতুতার লেখায় বাংলার চারটি অঞ্চলে ও তিনটি নদীর নাম পাওয়া যায়। অঞ্চল চারটি হলো সুদকাও, কামরু, হবংক, সনরকাও।

তিনি হবিগঞ্জ ও সোনারগাঁও শহরে যান ১৩৪৬ সালের ১৪ আগস্ট

তৎকালে এখানকার শাসক ছিলেন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ। ইবনে বতুতার বাংলাদেশে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করা। শাহজালাল (রহ.) ইবনে বতুতাকে একটি ভেড়ার পশমের পোশাক উপহার দেন। এরপর সেখান থেকে সোনারগাঁও আসেন তিনি। সেখানে কিছুদিন থেকে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তার বর্ণনা মতে, সাঁদকাও আসা থেকে ইন্দোনেশিয়ার জাভা উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া পর্যন্ত প্রায় দুই মাস বাংলায় অবস্থান করেন (১৩৪৬ সালের জুলাই ও আগস্ট)

মা ছুয়ান

১৪০৬ সালে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ-এর রাজত্বকালে প্রথম বাংলায় আসেন। তিনি অ্যাডমিরাল বেং হে-এর চারটি সমুদ্রাভিযানে তার সঙ্গ দিয়েছিলেন এবং ১৪৩০-এর দশকে তার শেষ অভিযানে তিনি বাংলায় আসেন।

বিস্তারিত তথ্য

প্রথম আগমন: মা ছুয়ান ১৪০৬ সালে প্রথম বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। বাং হির সঙ্গে যাত্রা: তিনি অ্যাডমিরাল বেং হে-এর পশ্চিম মহাসাগরের অভিযানের অংশ হিসেবে তিনটি অভিযানে যোগ দেন।

বাংলার বিবরণ: মা ছুয়ান বাংলায় আসেন চট্টগ্রাম বন্দরে এবং সেখানে তিনি ১৪০৬ সালে নৌবহরের সঙ্গে উপস্থিত হন।

পরবর্তী সফর: তিনি ১৪৩১-৩৩ খ্রিস্টাব্দে তার শেষ সফরে বাংলা, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, গৌড় এবং কালিকট ভ্রমণ করেন।

এই অভিযানগুলির মাধ্যমে মা ছুয়ান বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন, যা তার লেখালেখিতে ফুটে ওঠে।

তার লেখা বই ‘Yingyai Shenglan’ বিশ্বব্যাপী মিং রাজবংশের সামুদ্রিক আবিষ্কার, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাথমিক উৎস বলে বিবেচনা করা হয়। ১৪৩১ সালে তিনি চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও এবং কালিকট ভ্রমণ করেন। তার বর্ণনামতে সে সময়কার মেয়েরা প্রসাধন ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলো। চন্দনের গুঁড়া, জাফরান, মৃগনাভি ব্যবহার করতো তারা। ঠোঁটের রং হিসেবে মাখতো লাক্ষা গাছের রস। তখন প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। মাছরাঙ্গা পাখির রঙ-বেরঙের পালক দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফেব্রার পথে চীন দেশের রাজার জন্য কিছু পালক সাথে করে নিয়েও গিয়েছিলেন তিনি। সে সময়ে গাছের বাকল থেকে তৈরি হতো হরিণের চামড়ার চেয়েও মসৃণ কাগজ। সোনারগাঁয়ের টাকশালে তৈরি হতো টাকা।

ফেই-সিন

সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদের শাসনামলে চীনা পর্যটক ফেই-সিন বাংলা ভ্রমণে আসেন। এ দেশকে তিনি ‘পাংকোলা’ নামে অভিহিত করেছেন। গ্রামে-গঞ্জে তিনি একধরনের গানের আসর দেখেছেন যা শুরু হয় ডিমেতালে, কিন্তু শেষ হয় উচ্চস্বরে। তার মতে তখন নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে কাপড় তৈরি ও চাষাবাদ করতো। মা-হুয়ান এবং ফেই-সিন ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

নিকোলা মানুচি

আনুমানিক ১৬৫৫ সালে ইতালীর নিকোলা মানুচি বাংলায় এসেছিলেন। তিনি মুঘল রাজদরবারে দারাকোষের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তখন ঢাকার সুবেদার ছিলেন মীর জুমলা। সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে ঢাকা আসতে তার সময় লেগেছিলো ৪০ দিন। ‘Storia do mogor’ তার লেখা ভ্রমণের বই।

বাংলায় পর্তুগিজ

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বাণিজ্য করতে আসে পর্তুগিজগণ। বাংলায়ও পড়েছিল তাদের বাণিজ্য ছাউনী ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজরাই প্রথম ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে হালকা ও দ্রুতগামী জাহাজের তৈরী ও ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে অক্ষাংশ নির্ণয়ে কৌণিক উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহারে পর্তুগিজদের দক্ষতা তাদের সমুদ্রযাত্রায় যথেষ্ট সহায়তা করে। ভাস্কো দা গামা প্রথম পর্তুগিজ যার নেতৃত্বে পর্তুগিজরা কালিকট বন্দরে জাহাজ নোঙর করাতে সমর্থ হয়। ভাস্কো দা গামার এই অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রিন্স অঁরি দ্য নেভিগেটর। তখন থেকেই উপমহাদেশে পর্তুগিজ প্রভাবের শুরু।

ভাস্কো দা গামার ভারতবর্ষে আগমনের কয়েক দশকের মধ্যেই বাংলায় পর্তুগিজদের আগমন ঘটে। প্রথম পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৫১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে। ধারণা করা হয় বাংলায় পর্তুগিজদের আগমন ঘটে সুলতান হুসেন শাহের শাসনামলে। ফ্লোরেন্সের বণিক গিওভান্নি ডি এম্পলি কর্তৃক প্রেরিত পর্তুগিজ বণিক যোয়াও কোয়েলহো ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে গঙ্গায় এসে পৌঁছেন। এটিকেই বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের সূচনা বলে ধরে নেওয়া যায়।

... ব্যবসা ও জীবনযাপন —

পর্তুগিজদের বাংলায় আগমনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যবসা। শান্তিপূর্ণ নাহয় জোরজবরদস্তি, যেভাবেই হোক না কেন ব্যবসার প্রসারই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। বলা হয়ে থাকে রোমান মেয়েদের নিকট ঢাকাই মসলিন ছিল এক বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। এছাড়া সুজলাসুফলা বাংলায় মসলাসহ নানা পণ্যের উৎপাদন ছিল প্রচুর। আরব বণিকরা এসব পণ্যের চালান দিত ভেনিস জেনোয়া ইত্যাদি বন্দরে। তাদের ব্যবসায় ভাগ বসানোই ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জ। বাংলায় উৎপন্ন পণ্যের বিপণনের জন্য পূর্বে ও পশ্চিমে গড়ে উঠেছিল দুটি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র। পূর্বে ছিল চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে সপ্তগ্রাম। পর্তুগিজরা মূলত এ দুটি কেন্দ্র থেকেই ব্যবসা করত।

চট্টগ্রামের নাম তারা দিয়েছিল ‘পোর্ট-গ্রান্ডী’, যার অর্থ বড় স্বর্গ। সপ্তগ্রামের নাম তারা দিয়েছিল ‘পোর্ট-পিকানো’, যার অর্থ ছোট স্বর্গ। তখনকার বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়।

১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর হুগলী নদীর তীরে বসতি স্থাপনের জন্য পর্তুগিজদের অনুমতি প্রদান করেন। পর্তুগিজরা তাদের বসতিকে বলত Porto Pequeno। ষোড়শ শতকে জায়গাটি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম পর্তুগিজদের ব্যবসার মূল সময়কাল ছিল বর্ষাকাল।

তৎকালীন ঐতিহাসিক বর্ণনামতে জানা যায় পর্তুগিজরা বিলাসী জীবনযাপন করত। তারা নবাবদের মত পোশাক-আশাক পরিধান করত, তাদের বাড়িতে দাস-দাসী থাকত প্রচুর। তাদের মূল কাজ ছিল আম, কমলা-লেবু থেকে মিষ্টান্ন তৈরী করা। পর্তুগিজ ময়রারা কেক পেস্তা ইত্যাদি পদ তৈরী করত। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে দুধ থেকে ছানা তৈরীর প্রক্রিয়াটি পর্তুগিজদের কাছ থেকে আয়ত্ত করা।

তাছাড়া আমাদের দৈনন্দিন খাবারের অনেক উপকরণ পর্তুগিজদের অবদান। আনারস (পর্তুগিজ ভাষায় আনানাস), গোল-আলু, মরিচ, টেঁড়স, কামড়াঙা, কাজু বাদাম পর্তুগিজরাই প্রথম এনে চাষ করেছিল। বাঙালীর তামাক খাওয়াও শুরু হয় তাদের দেখাদেখি। এ নিয়ে পুঁথিও রচিত হয়েছে (তামাকু মাহাত্ম)। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত ছিল প্রায় ২০ হাজার, যদিও এর মধ্যে মাত্র ৩০০ জনের মত ছিল বিশুদ্ধ। এর কারণ হিসেবে বলা চলে পর্তুগিজরা শুরু থেকেই স্থানীয় মহিলাদের বিয়ের ব্যাপারে আপত্তি করেনি।

... বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতিতে পর্তুগিজ প্রভাব —

পর্তুগিজদের বাংলা আগমনকালে এখানকার শাসকরা ছিল মুসলিম। প্রধানত দুই ধর্মের মানুষের বাস ছিল, হিন্দু এবং মুসলিম। পর্তুগিজরাই প্রথম বাংলার মাটিতে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করে। তারা বিশ্বাস করত খ্রিষ্টধর্মের প্রচারে সহযোগীতা করলে তাদের পূণ্য হবে পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধাও পাওয়া যাবে।

তারা চট্টগ্রাম, বরিশাল, হুগলী, আরাকান সহ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার দরিদ্র মানুষদেরকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করত। এমনকি মোগল রাজদরবারেও ছিল তাদের প্রবেশাধিকার। সম্রাট আকবর পর্তুগিজ পাদ্রীদের নিকট থেকে খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপারে জানতেন। সমুদ্র তীরবর্তী স্থান থেকে শত মাইল দূরেও তারা ধর্ম প্রচারে চলে যেতেন। এমনকি তারা কয়েকজন জমিদারকেও খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন বলে জানা যায়।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বেশ কিছু পর্তুগিজ শব্দ পাওয়া যায়। যেমন –আলমারি,চাবি,বালতি,বোতল ,বারান্দা ইত্যাদি। পর্তুগিজ ভাষা এদেশে এতটা প্রভাব বিস্তারকারী ছিল যে লর্ড ক্লাইভ পর্যন্ত অনর্গল পর্তুগিজ বলতে পারতেন।

বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লিখেছেন পর্তুগিজ পাদ্রী মনোএল দ্য আসসম্পুসাঁউ।

১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে তিনটি বাংলা বই বের হয়। ব্রাহ্মন-রোমান ক্যাথোলিক সংবাদ,কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ,বাংলা ও পর্তুগিজ ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণ।

আরেক পর্তুগিজের কথা না বললেই নয়। তিনি হচ্ছেন এন্টনি ফিরিঙ্গি(১৭৮৬-১৮৩৬) তাঁর আসল নাম হ্যান্সম্যান এন্টনি। তিনি ছিলেন কবিয়াল,বাংলা ভাষার প্রথম ইউরোপীয়ান কবিয়াল।সৌদামিনি নামে একজন বাঙালি ব্রাহ্মন মহিলাকে সতীদাহের হাত থেকে বাঁচিয়ে বিয়ে করে তিনি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন।তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় গানটি হল-‘সাধন ভজন জানিনে মা,জেতে তো ফিরিগি’।

মধ্যযুগে বাংলায় ইউরোপীয়দের ফিরিঙ্গি বলা হত। আর পর্তুগিজ জলদস্যুদের বলা হত হার্মাদ। ফিরিঙ্গি শব্দটি এসেছে ‘ফ্রাঙ্ক’ হতে।

... দমন ও প্রস্থান —

সম্রাট আকবরের জীবদ্দশায় পর্তুগিজদের সাথে মোগল সেনাবাহিনীর সরাসরি সংঘর্ষ হয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে মোগলদের সাথে পর্তুগিজ জলদস্যুদের বৈরিতা শুরু হয় এবং এই বৈরিতাই পর্তুগিজ জলদস্যুদের বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহ যখন দ্বিতীয়বারের মত বারো ভূঁইয়াদের দমন করতে বাংলায় আসেন তখন রাজা প্রতাপাদিত্যের নৌ সেনাপতি হিসেবে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ফ্রান্সিস কার্ভালো,রডা গঞ্জালেস প্রমুখ পর্তুগিজগণ। একই সাথে তারা হুগলীতে হামলাও অব্যাহত রেখেছিল। পর্তুগিজ জলদস্যু ও তাদের দোসর কর্তৃক মেঘনা ও কর্ণফুলিতে বাণিজ্যতরী আক্রমণ করে কর আদায়,মক্কাগামী হজযাত্রীদের জাহাজে লুটপাট,হিন্দু দেবমূর্তি ভাঙা ইত্যাদি অভিযোগ সম্রাট জাহাঙ্গীরের কানে পৌঁছলে তিনি পর্তুগিজ দমনের আদেশ দেন। সেইসাথে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। ঢাকার নতুন নাম দেন ‘জাহাঙ্গীর নগর’।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে শুরু হওয়া পর্তুগিজবিরোধী অভিযান সম্রাট শাহজাহানের (১৫৯২-১৬৬৬)শাসনামলে আরো তীব্র ১৬৬৬ সালে মোগল সেনাপতি বুজুর্গ উমেদখান চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন এবং চট্টগ্রাম দখল করেন।সেসময় বাংলার সুবাদার ছিলেন শায়েস্তা খান।বুজুর্গ উমেদ খান ছিলেন তাঁর পুত্র।এ অভিযানে শায়েস্তা খান ২৮৮ টি রণতরী প্রেরণ করেছিলেন।মগ ও হার্মাদদের নির্মূলের জন্য বাংলার দক্ষ নৌবাহিনী তিনিই তৈরী করেছিলেন।এর মাধ্যমেই বাংলায় পর্তুগিজদের ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটে। ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সাথে ব্যবসায় টীকতে না পেরে পর্তুগিজ বণিকেরা ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে চলে যান। ১৭৩৩ সালে ইংরেজরা পর্তুগিজদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক না রাখার জন্য তাদের কর্মচারীদের নির্দেশ দেয়।তারপরও হুগলীতে ১৭৪০ সালে পর্তুগিজ বাণিজ্যিক জাহাজ আগমনের নথিপত্র পাওয়া যায়,যা থেকে মনে করা হয়ে থাকে পর্তুগিজরা বাংলায় আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাণিজ্য করে গেছে।

বার ভূঁইয়া

১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই বাংলার কররানী বংশের শেষ বাদশাহ দাউদ শাহ কররানীকে পরাজিত করে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলার উপর নিজের আধিপত্য বিস্তারের প্রাথমিক কাজটি শেষ করেন। বাংলা বলতে অবশ্য পুরো বাংলা না। বাংলার খুব সামান্য অংশই তখন পর্যন্ত মুঘলদের অধীনে ছিল। ঐতিহাসিক শহর তাড়াকে কেন্দ্র করে মুঘল সাম্রাজ্যের এ প্রদেশটির সীমানা ছিল মালদহ আর দিনাজপুর হয়ে উত্তরে ঘোড়াঘাট আর পূর্বে করতোয়া নদী পর্যন্ত।

সমগ্র বাংলা বিজয়ের ক্ষেত্রে মুঘলদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিলো ভাটি অঞ্চলের জমিদাররা। ‘বার ভুঁইয়া’ নামেই যারা বেশি পরিচিত ছিলেন। বার ভুঁইয়ারা মূলত বাংলার অসামান্য ভৌগোলিক সুবিধা পেয়েছিলেন। প্রবল বর্ষণের কারণে বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় এ অঞ্চলটি পানির নিচে থাকতো। নদ-নদীগুলো এ সময় ফুলেফেঁপে উঠতো। নদী আর এর শাখা-প্রশাখাগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকায় মুঘল নৌবহর এই অঞ্চলে চলাচলের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধায় পড়তো। ভাটির ভুঁইয়ারা ঠিক এই দিকটি দিয়েই এগিয়ে ছিলেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবদুল করিম সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলের ‘বার ভুঁইয়াদের’ নামের একটি তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি এখানে দিয়ে দিলাম।

সম্রাট আকবরের সমসাময়িক সময়ের বার ভুঁইয়ার নামের তালিকা

১. মসনদ-ই-আলা ইশা খান, ২. ইবরাহীম নারাল, ৩. করিমদাদ মুসাজাই, ৪. মজলিশ দিলাওয়ার, ৫. মজলিশ প্রতাপ, ৬. টিলা গাজী, ৭. বাহাদুর গাজী, ৮. চাঁদ গাজী, ৯. সুলতান গাজী, ১০. সেলিম গাজী, ১১. কাসিম গাজী, ১২. কেরার রায়, ১৩. শের খান।

সম্রাট জাহাঙ্গিরের শাসনামলের বার ভুঁইয়ার নামের তালিকা

১. মসনদ-ই-আলা মুসা খান, ২. আলাওল খান, ৩. আবদুল্লাহ খান, ৪. মাহমুদ খান, ৫. বাহাদুর গাজী, ৬. সোনাগাজী, ৭. আনোয়ার গাজী, ৮. শয়খ পীর, ৯. মির্জা মুমিন, ১০. মাধব রায়, ১১. বিনোদ রায়, ১২. পাহলোয়ান, ১৩. হাজী শামস উদ্দিন বাগদাদী।

ভাটি বাংলার বার ভুঁইয়াদের মূল নেতা ছিলেন মসনদ-ই-আলা ঈশা খান। ঈশা খানের মৃত্যুর পর এই নেতৃত্ব যায় তার পুত্র মুসা খানের হাতে। বার ভুঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী ছিলেন বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেরার রায়। এছাড়া সোনারগাঁও শাসন করতেন ইবরাহীম নারাল, আর মহেশ্বরদীর জমিদার ছিলেন করিমদাদ মুসাজাই। মজলিশ দিলাওয়ার আর মজলিশ প্রতাপ ছিলেন জোয়ানশাহী আর খালিয়াজুরি পরগণার জমিদার। এছাড়াও প্রভাবশালী ভুঁইয়াদের তালিকায় ছিলেন গাজীপুরের গাজী পরিবারও। এই পরিবারের উত্থান হয় ফজল গাজীর হাত ধরে, তবে আকবরের সমসাময়িক ছিলেন টিলা গাজী, বাহাদুর গাজী, কাসিম গাজী, সেলিম গাজী, সুলতান গাজী, চাঁদ গাজী প্রমুখ। প্রভাবশালী ভুঁইয়াদের তালিকায় আরও আছেন বরিশালের (চন্দ্রদ্বীপ) কন্দর্প নারায়ণ, ভুসনার (খুলনা-ফরিদপুর) মুকুন্দ রায়। এছাড়াও আছেন ভুলুয়ার (নোয়াখালী) লক্ষণ মাণিক্য, দিনাজপুরের প্রমথ রায়। রাজশাহীতে প্রভাবশালী ছিলেন পীতাম্বর রায়, বীর হাম্বির ছিলেন বাঁকুড়ার ক্ষমতায়, নাটোরে ছিলেন কংস নারায়ণ।

বাদারি ও নবাবি— এ দুই পর্বে বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হয়। বারোভুঁইয়াদের দমনের পর সমগ্র বাংলায় সুবাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল প্রদেশগুলো ‘সুবা’ নামে পরিচিত ছিল। বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম সুবা। সতেরো শতকের প্রথম দিক থেকে আঠারো শতকের শুরু পর্যন্ত ছিল সুবাদারি শাসনের স্বর্ণযুগ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দিল্লির দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে মুঘল শাসন শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এ সুযোগে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। মুঘল আমলের এই যুগ ‘নবাবি আমল’ নামে পরিচিত।

সুবাদারি ও নবাবি আমল:

সুবাদারি ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে বারোভুঁইয়াদের দমন করে সমগ্র বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন সুবাদার বাংলার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তবে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে সুবাদার মীর জুমলা ক্ষমতা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত কোনো সুবাদারই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে ইসলাম খান চিশতি (১৬১৭-১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ) এবং দিল্লির সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ (১৬১৭-১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর খুব অল্প সময়ের জন্য সুবাদার নিযুক্ত হন দারার খান, মহব্বত খান, মুকাররম খান এবং ফিতাই খান।

সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বাংলার সুবাদার হিসেবে কাসিম খান জুয়িনীকে নিয়োগ করেন ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে। হুসেন শাহি যুগ থেকেই বাংলায় পর্তুগিজরা বাণিজ্য করত। এ সময় পর্তুগিজ বণিকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। ক্রমে তা বাংলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাসিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন। কাসিম খানের পর সুবাদার ইসলাম খান মাসহানি (১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) চার বছর শাসন করেন। অতঃপর শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। সুজা বিশ বছর দায়িত্বে ছিলেন। মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল সুজার শাসনকাল। বিদেশি বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজরা এ সময় সুবাদারের কাছ থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা লাভ করছিল। এতে বাণিজ্যের পাশাপাশি ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্রের প্রত্যেকেই সম্রাট হওয়ার জন্য বিদ্রোহ করেন। এ সময় আওরঙ্গজেবের সাথে শাহ সুজার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই

ভাইরের যুদ্ধে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে শাহ সুজা পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে তিনি আরাকান গমন করেন। সেখানে পরে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা সুজাকে দমন করার জন্য বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত এসেছিলেন। ভাই সম্রাট আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে (১৬৬০-১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব দেন। কুচবিহার এবং আসাম বিজয় মীর জুমলার সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর সময়েই কুচবিহার সম্পূর্ণরূপে প্রথমবারের মতো মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। আসাম অভিযানের দ্বারা তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্ত আসাম পর্যন্ত বর্ধিত করেন।

মীর জুমলা

বাংলার সুবাদার দের মধ্যে অন্যতম মীর জুমলা (১৫৯১-১৬৬৩)। তৎকালীন ঢাকায় পৌঁছার অল্পদিন পরই মীরজুমলা বাংলার সুবাদার হিসেবে তাঁর নিয়োগের ফরমান লাভ করেন ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে। সে সময়কার পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাংলার নাম করা সুবাদার ছিলেন। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতিনিধি ছিলেন মীর জুমলা।। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কারণ তিনি নিজে ব্যবসায়ী ছিলেন। মীর জুমলার আমলে পতুগীজদের অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে। তবে ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানিগুলোর উত্থান ঘটে।

১৬৬০ সালে ৬৯ বছর বয়সে বাংলার সুবেদার হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন মীর জুমলা। মোঘল সাম্রাজ্য তখন ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। বিশেষ করে বাংলার অবস্থা ছিল করুণ। মীর জুমলা প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকাকে বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি ঢাকাসহ বাংলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুর্গ, সেতু এবং রাস্তা নির্মাণ করা শুরু করেন। মীর জুমলার একটি দুর্গ ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ রোডের পাশে টঙ্গী জামালপুরে। এই দুর্গের সাহায্যে তিনি উত্তরাঞ্চলের সাথে ঢাকার যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করতেন। নারায়ণগঞ্জ জেলায় তার অন্য দুটি দুর্গ রয়েছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের পাগলায় তিনি একটি সেতু (পাগলা পুল) নির্মাণ করেন যার ধ্বংসাবশেষ হিসেবে একটি মিনার এখনও বিদ্যমান রয়েছে। মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর কেল্লা এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় অবস্থিত সোনাকান্দা কেল্লা মীর জুমলা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। নদীপথে মগ জলদস্যুসহ অন্যান্য শত্রুর আক্রমণ থেকে বাংলাকে নিরাপদ রাখতে এসব দুর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১৬৬৩ সালে মীর জুমলা নির্মাণ করেন ঢাকা গেট। ঢাকার প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত এই ফটক ঢাকাবাসীকে মগ দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করতো। অনেকের মতে, হাতির আক্রমণ থেকে শহরকে রক্ষা করতে এই ফটক নির্মিত হয়েছিল। বিভিন্ন যুদ্ধে মীর জুমলা কামান ব্যবহার করতেন। তার ব্যবহৃত কামানের মধ্যে বিবি মরিয়ম এবং কালে খাঁ জমজম ছিল সুবিখ্যাত। কালে খাঁ জমজম অযত্নে বুড়িগঙ্গা নদীর তলায় হারিয়ে গেলেও বিবি মরিয়ম কামানটি এখনও অক্ষত রয়েছে। মীর জুমলা কামান নামে সমধিক পরিচিত এই কামানটি এখন গুলিস্তানের ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত রয়েছে। মীর জুমলার হাত ধরে বাংলার রাজধানী ঢাকা তার হৃত গৌরব ফিরে পেতে শুরু করে।

শায়েস্তা খান:

মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে লিলি খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবাদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন। ১৬৬৪ সালে আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তিনি মগদের উৎপাত থেকে বাংলার জনগণের জান-মাল রক্ষা করেন। তিনি সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করে আরাকানি জলদস্যুদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন। সুবাদার শায়েস্তা খান কুচবিহার, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে মুঘল শাসন সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সীমায় এলাকার নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর ভয়ে আসামের রাজা মুঘলদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে সাহস পাননি। সুবাদারির শেষ দিকে শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ বাধে। ইংরেজদের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, তারা ক্রমে এদেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর শায়েস্তা খান বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। শায়েস্তা খানের পর একে একে খান-ই-জাহান বাহাদুর, ইব্রাহিম খান ও আজিমুদ্দিন বাংলার সুবাদার হন। তাঁদের সময় বাংলার ইতিহাস তেমন ঘটনাবল্হুল ছিল না।

শায়েস্তা খান তাঁর শাসন আমলে বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর সমরে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রে তিনি অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলায় নয়, সম ভারতবর্ষেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার সমরে দ্রব্যমূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার। এ আমলে কৃষিকাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি বণিকদের উৎসাহিত করতেন।

শায়েস্তা খানের শাসনকাল বাংলার স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র সৌধমালা, মনোরম সাজে সজ্জিত তৎকালীন ঢাকা নগরী স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করা যায়। তাঁর আমলে নির্মিত স্থাপত্য কর্মের মধ্যে ছোট কাটারা, লালবাগ কেল্লা, বিবি পরির সমাধি সৌধ, হোসেনী দালান, সফি খানের মসজিদ, বুড়িগঙ্গার মসজিদ, চক মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, অন্য কোনো সুবাদার বা শাসনকর্তা ঢাকায় শায়েস্তা খানের মতো নিজের স্মৃতিকে এত বেশি জ্বলন্ত রেখে যেতে পারেননি। বস্তুত ঢাকা ছিল শায়েস্তা খানের নগরী।

নবাব মুর্শিদকুলি খান:

১৭০০ সালে বাংলার ক্ষমতায় আসেন মুর্শিদ কুলি খান। তিনি ১৭২৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। প্রথমে তাঁকে বাংলার দেওয়ান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। দেওয়ানের কাজ ছিল সুবার রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে মুর্শিদ কুলি খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। মুর্শিদ কুলি খান যখন বাংলায় আগমন করেন, তখন বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এ পরিস্থিতির মুখে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বাংলায় মুঘল শাসন পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। স্বীয় ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তিনি বাংলার ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তন করেছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ দূরবর্তী সুবাগুলোর দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারেননি। ফলে, এসব অঞ্চলের সুবাদারগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। মুর্শিদ কুলি খানও অনেকটা স্বাধীন হয়ে পড়েন। তিনি সম্রাটের নামমাত্র আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। মুর্শিদ কুলি খানের পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলার সিংহাসনে বসেন। এভাবে বাংলার সুবাদারি বংশগত হয়ে পড়ে। আর এরই পথ ধরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার স্বাধীন শাসন। নবাব মুর্শিদ কুলি খানের সময় থেকেই বাংলা সুবা প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়ে। এ সময় সুবাকে বলা হতো “নিজামত” আর সুবাদারের বদলে পদবি হয় ‘নাজিম’। নাজিম পদটি হয়ে পড়ে বংশগত। সুবাদার বা নাজিমগণ বাংলার সিংহাসনে বসে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে শুধু একটি অনুমোদন নিয়ে নিতেন। তাই, আঠারো শতকের বাংলায় মুঘল শাসনের ইতিহাস নিজামত বা নবাবি আমলরূপে পরিচিত। আর প্রায় স্বাধীন শাসকগণ পরিচিত হন ‘নবাব’ হিসেবে।

রাজস্ব সংস্কার মুর্শিদ কুলি খানের সর্বাধিক স্মরণীয় কীর্তি। তিনি ভূমি জরিপ করে রায়তদের সামর্থ্য অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। রাজস্ব আদায়কে নিশ্চিত ও নিয়মিত করার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কর্মচারীদের সাহায্যে ভূমির প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তি ও বাণিজ্য করার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতেন। এ পদ্ধতিতে মধ্যস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রজাদের হয়রানির কোনো সুযোগ ছিল না। মুর্শিদ কুলি খান দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রসারের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ইংরেজ, ফরাসি ও পারসিক ব্যবসারীদের তিনি উৎসাহ প্রদান করতেন। ব্যবসায়ীরা যাতে নির্দিষ্ট হারে প্রচলিত কর প্রদান করে এবং তাদের প্রতি যাতে কোনো অবিচার করা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল। কলকাতা, চুঁচুড়া ও চন্দননগর বিভিন্ন বিদেশি বণিকদের ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

সুজাউদ্দিন খান:

মুর্শিদ কুলি খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তাঁর কন্যা জিনাত-উন-নিসার স্বামী সুজাউদ্দিন খানকে ১৭২৭ সালে সম্রাট ফররুখ শিয়ার বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। তিনি ১৭৩৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। সুজাউদ্দিন একজন স্বাধীন নবাবের মর্যাদা নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা-তিন প্রদেশেরই নবাব হয়েছিলেন তিনি। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বিশ্বাসভাজনদের উচ্চপদ দান করেন। জমিদারদের সাথেও একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু সুজাউদ্দিনের শেষ জীবন সুখে কাটেনি। প্রাসাদের অনেক কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। কিন্তু দক্ষ হাতে তিনি সংকট মোকাবিলা করেন। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হন। তাঁর অযোগ্যতার কারণে দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সুযোগে বিহারের নায়েব-ই-নাজিম আলিবর্দি খান সরফরাজকে আক্রমণ করেন। সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

আলিবর্দি খান:

মুঘল সম্রাটের অনুমোদনে নয়, বরং বাহুবলে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন আলিবর্দি খান। আলিবর্দি খানের শাসনকালে (১৭৪০-১৭৫৬ সাল) বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকদিন ধরেই বর্গি নামে পরিচিত মারাঠি দস্যুরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করে জনজীবন

অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। আলিবর্দি খান ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১০ বছর প্রতিরোধ করে বর্গিদের দেশছাড়া করতে সক্ষম হন। তাঁর শাসনকালে আফগান সৈন্যরা বিদ্রোহ করলে তিনি শক্ত হাতে তা দমন করেন। আলিবর্দির সময়ে ইংরেজসহ অনেক ইউরোপীয় বণিকের বাণিজ্যিক তৎপরতা বাংলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। একই সাথে তাঁরা সামরিক শক্তিও সঞ্চয় করতে থাকে। আলিবর্দি খান শক্ত হাতে বণিকদের তৎপরতা রোধ করেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা:

আলিবর্দি খান তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আলীবর্দির প্রথম কন্যা ঘষেটি বেগমের ইচ্ছে ছিল তাঁর দ্বিতীয় ভগ্নির পুত্র শওকত জঙ্গ নবাব হবেন। ফলে তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। কয়েকজন অভিজাতের সমর্থন লাভ করেন ঘষেটি বেগম। তাদের মধ্যে রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মীর জাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রাসাদের ভেতরের এ ষড়যন্ত্রকে কাজে লাগায় বাংলায় বাণিজ্য করতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুচতুর ইংরেজ বণিকরা। ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে তারা হাত মেলায়। অবশেষে, ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ বাধে নবাবের। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন। অসহায়ভাবে পরাজয় ঘটে সিরাজউদ্দৌলার। এভাবেই পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর একই সাথে বাংলার মধ্যযুগেরও অবসান ঘটে।

পলাশী

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ও ফরাসি মিত্রদের সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পলাশী নামক স্থানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাই পলাশীর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

১৭৫৭ সালের জুন ২৩ তারিখে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সূচিত হয়। এই যুদ্ধ ভারতে ইংরেজ শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শন ও প্রবেশ কে সূচিত করেছিল।

যুদ্ধটি কলকাতা থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার (৯৩ মাইল) উত্তরে এবং মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে, তৎকালীন বাংলার রাজধানী (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলায়) হুগলী নদীর তীরে পলাশিতে) সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধকারীরা ছিল নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তিনি আলীবর্দি খানের (তার মাতামহ) স্থলাভিষিক্ত হন। সিরাজ-উদ-দৌলা হ'ল আগের বছর বাংলার নবাব হয়েছিলেন, এবং তিনি ইংরেজদের তাদের দুর্গের সম্প্রসারণ বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। রবার্ট ক্লাইভ নবাবের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মীর জাফরকে ঘুষ দেন ও তাকে পরবর্তী নবাব করার প্রতিশ্রুতি দেন। ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে প্লাসিতে সিরাজ-উদ-দৌলাহকে পরাজিত করেন এবং কলকাতা দখল করেন। ১৭৫৭ সালের ১২ জুন কলকাতার ইংরেজ সৈন্যরা চন্দননগরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। সেখানে দুর্গ রক্ষার জন্য অল্প কিছু সৈন্য রেখে তারা ১৩ জন অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা শুরু করে। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদের পথে হুগলী, কাটোয়ার দুর্গ, অগ্রদ্বীপ ও পলাশিতে নবাবের সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তারা কেউ ইংরেজদের পথ রোধ করে নি। ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বুঝতে পারেন, তার সেনাপতিরাও এই ষড়যন্ত্রে शामिल।

বিদ্রোহের আভাস পেয়ে সিরাজ মীর জাফরকে বন্দি করার চিন্তা পরিত্যাগ করেন। তিনি মীর জাফরকে ক্ষমা করে তাকে শপথ নিতে বলেন। মীর জাফর পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে অঙ্গীকার করেন যে, তিনি শরীরের একবিন্দু রক্ত থাকতেও বাংলার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না। গৃহবিবাদের মীমাংসা করে নবাব রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, মীর জাফর, মীর মদন, মোহন লাল ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রোঁকে সৈন্য চালানোর দায়িত্ব দিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করেন।

২৩ জুন সকাল থেকেই পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজরা মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। ১৭৫৭ সালের ২২ জুন মধ্যরাতে রবার্ট ক্লাইভ কলকাতা থেকে তার বাহিনী নিয়ে পলাশী মৌজার লক্ষবাগ নামে আশ্রয়স্থানে এসে তাঁবু গাড়েন। বাগানটির উত্তর-পশ্চিম দিকে গঙ্গা নদী। এর উত্তর-পূর্ব দিকে দুই বর্গমাইলব্যাপী আশ্রয়স্থান[৪]। বেলা আটটার সময় হঠাৎ করেই মীর মদন ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করেন। তার প্রবল আক্রমণে টিকতে না পেরে ক্লাইভ তার সেনাবাহিনী নিয়ে আমবাগানে আশ্রয় নেন। ক্লাইভ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। মীর মদন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু মীর জাফর, ইয়ার লুৎফ খান ও রায় দুর্লভ যেখানে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন সেখানেই নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাদের সামান্য সহায়তা পেলেও হয়ত মীর মদন ইংরেজদের পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করতে পারতেন। দুপুরের দিকে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে সিরাজউদ্দৌলার গোলাবারুদ ভিজে যায়। তবুও সাহসী মীর মদন এবং অপর সেনাপতি মোহন

লাল ইংরেজদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই গোলার আঘাতে মীর মদন মারাফকভাবে আহত হন ও মারা যান। নবে সিং হাজারী ও বাহাদুর খান প্রমুখ গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধানও একইসাথে মৃত্যুবরণ করেন।

মীরমদন, নবে সিং হাজারী ও বাহাদুর খানের স্মারকসত্ত্ব, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান নিহত হওয়ার পর সিরাজউদ্দৌলা মীর জাফর ও রায় দুর্লভকে তাদের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তীব্র বেগে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন। কিন্তু উভয় সেনাপতি তার নির্দেশ অমান্য করেন। তাদের যুক্তি ছিল গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া অগ্রসর হওয়া আত্মঘাতী ব্যাপার। কিন্তু কোম্পানি ও নবাবের বাহিনীর মধ্যে তখন দূরত্ব মাত্র কয়েকশত গজ। বিশুদ্ধ সেনাপতি মোহন লাল নবাবকে পরামর্শ দেন যুদ্ধবিরতি ঘটলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সিরাজ মীর জাফর প্রমুখের পরামর্শে পশ্চাৎপসরণের সিদ্ধান্ত নেন। বিকেল পাঁচটায় সিরাজউদ্দৌলার বাহিনী নির্দেশনার অভাবে এবং ইংরেজ বাহিনীর গোলন্দাজি অগ্রসরতার মুখে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করে। নবাবের ছাউনি ইংরেজদের অধিকারে আসে। ইংরেজদের পক্ষে ৭ জন ইউরোপীয় এবং ১৬ জন দেশীয় সৈন্য নিহত হয়। তখন কোনো উপায় না দেখে সিরাজউদ্দৌলা রাজধানী রক্ষা করার জন্য ২,০০০ সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু রাজধানী রক্ষা করার জন্যেও কেউ তাকে সাহায্য করেনি। সিরাজউদ্দৌলা তার সহধর্মিণী লুৎফুনুসা ও ভৃত্য গোলাম হোসেনকে নিয়ে রাজধানী থেকে বের হয়ে স্থলপথে ভগবানগোলায় পৌঁছে যান এবং সেখান থেকে নৌকাযোগে পদ্মা ও মহানন্দার মধ্য দিয়ে উত্তর দিক অভিমুখে যাত্রা করেন। তার আশা ছিল পশ্চিমাঞ্চলে পৌঁছাতে পারলে ফরাসি সেনাপতি মসিয়ে নাস-এর সহায়তায় পাটনা পর্যন্ত গিয়ে রাজা রামনারায়ণের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে ফরাসি বাহিনীর সহায়তায় বাংলাকে রক্ষা করবেন। কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হয়নি। সিরাজ পশ্চিমমুখে বন্দি হন ও মিরনের হাতে বন্দি অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে।

বঙ্গারের যুদ্ধ

বঙ্গারের যুদ্ধ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে সম্মিলিত ভাবে মীর কাশিম-এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জয়ের ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সূচিত হয়।

পটভূমি

১৭৬০ সালে ক্লাইভ ব্রিটেনে চলে যান। ক্লাইভের মতো পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক হারিয়ে মীরজাফর অসহায় হয়ে পড়েন। তা ছাড়া খড়কুটো ধরে বাঁচার লক্ষ্যে ওলন্দাজদের সাথে ষড়যন্ত্র করার পর তিনি ইংরেজদের বিশ্বাস ও সমর্থন হারিয়েছিলেন। অধিকন্তু ইংরেজদের পুনঃপুন টাকার দাবি মেটাতে পারছিলেন না। সে জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ হলওয়েল ও ভেনসিটার্ট মীরজাফরকে সরিয়ে তার জামাতা মীর কাসিমকে মসনদে বসানোর পরিকল্পনা করে। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৭৬০ সালের অক্টোবরে মীর কাসিমকে মসনদে বসায়। নবাবীর বিনিময়ে মীর কাসিম ইংরেজ প্রধানদের বহু অর্থ উপঢৌকন দেন। তা ছাড়া বর্ধমান, মেদেনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা কোম্পানিকে দান করে দিতে বাধ্য হন।

মীর কাসিম অনেকটা স্বাধীনচেতা ছিলেন। ইংরেজ আশ্রিত অবস্থান থেকে নবাবের শাসনক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন। নবাব এ সময় কয়েকজন হিন্দু কর্মচারী, জমিদার ও ব্যবসায়ীর অবাধ্যতায় বিরক্ত হয়ে ওঠেন। এ জন্য আজিমাবাদের নায়েম নাযিম রামনারায়ণ, গুপ্ত পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা রাজা মুরলী ধর এবং রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও অন্যদের গ্রেফতার করেন। ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে রামনারায়ণ, রাজবল্লভ, উমেদরায়, জগৎশেঠ এবং আরো কয়েকজনের প্রাণদণ্ড হয়। ইংরেজদের প্রভাব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মীর কাসিম তার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গের এ স্থানান্তর করেন। বিলম্বিত বোধোদয়ের কারণে তিনি ইংরেজদের বিনাশুঙ্কে বে-আইনি ব্যবসায় নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করেন। কোম্পানির কর্মকর্তারা এর বিরোধিতা করায় তিনি সব বণিকের পণ্যদ্রব্যের ওপর হতে শুল্ক রহিত করে দেন। এই ব্যবস্থার ফলে বাণিজ্যে ইংরেজদের একচেটিয়া ও বিশেষ সুবিধা নষ্ট হয়। কারণ এর ফলে তাদের অন্য বণিকদের সাথে সমপর্যায়ে ব্যবসাতে প্রতিযোগিতা করতে হতো। এ সব কারণে মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। ১৭৬৩ সালে ইংরেজদের সাথে তার সংঘর্ষ বেধে যায়। কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সুতি, উদয়নালা ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাসিম ক্ষমতাহারা অবস্থায় অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৭৬৩ সালে কোম্পানির কর্মকর্তারা দ্বিতীয়বার ক্লাইভের গর্দভ খ্যাত মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসায়।

ভৌগোলিক আবিষ্কার

- ইউরোপের নেতৃত্বে ৫০ বছরের কম কম সময়ের মধ্যে কলম্বাস, ম্যাকগিলান, ভাস্কো দা গামার ভৌগোলিক আবিষ্কার পৃথিবীকে বদলে দিয়েছিলো। এর ফলে ইউরোপের কর্তৃত্ব সারা পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ইউরোপের ব্যবসার কেন্দ্র ছিলো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল যা ভৌগোলিক আবিষ্কারের পরে উত্তর আটলান্টিকের দিকে সরে যায়।
- ক্রমেই ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং ইউরোপীয় দেশসমূহ এশিয়া, আফ্রিকায় এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহকে পরাজিত করে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। দাস ব্যবসা শুরু হয়।
- বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের কারণে যখন ইউরোপ উত্তর উত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছিলো
- তখন বাণিজ্যিক সংগঠনের কাঠামোর মধ্যেও পরিবর্তন আসে। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা, ইনস্যুরেন্স, জয়েন্ট কোম্পানির আবির্ভাব সূচনা করে, আর এরই পথ ধরে শুরু হয় আধুনিক পুঁজিবাদের। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে ওঠে।
- ভৌগোলিক আবিষ্কারের মাধ্যমেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে।
- আধুনিক সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিষ্ঠা ভৌগোলিক আবিষ্কারের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল।

পর্তুগালের ভৌগোলিক অভিযান-

প্রিন্স হেনরি দ্য নেভিগেটর : পর্তুগালের রাজা প্রথম জন-এর পুত্র রাজকুমার হেনরি দ্য নেভিগেটর ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য অভিযানসমূহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

- তার উৎসাহে পর্তুগিজ নাবিকরা জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে আফ্রিকার পশ্চিমে উপকূলে পৌঁছে।

বার্থলমিউ ডিয়াজ :

- হেনরির উৎসাহে জেনোয়ার নাবিকরা পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরালিওন এবং পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের মানচিত্র তৈরি করতে সক্ষম হন।
- পর্তুগিজ নাবিকদের মধ্যে বার্থোলোমিউ ডিয়াজ ১৪৮৮ সালে উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেন।
- তিনি উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করে পর্তুগিজদের জন্য ভারতে পৌঁছার পথ সুগম করে গিয়েছিলেন।

ভাস্কো-দা-গামা :

পর্তুগিজ নাবিকদের মধ্যে ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ সালে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতে পৌঁছেন। অবশ্য একজন আরব মুসলিম তাকে এ জলপথ দেখিয়ে ভারতে আসতে সাহায্য করেছিলেন।

পর্তুগালের নতুন রাজা ম্যানুয়েল ভাস্কো-দা-গামাকে এ সমুদ্র অভিযানের দায়িত্ব দেন। ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৭ সালে ৮ জুলাই চারটি জাহাজ নিয়ে পর্তুগাল থেকে যাত্রা শুরু করেন। ভাস্কো-দা-গামার জাহাজ বহর নভেম্বর মাসে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে মে মাসে ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে। কালিকটের জামুরিন (শাসক) ভাস্কো-দা-গামাকে অনিহার সাথে গ্রহণ করেন। সেখানকার আরব বণিকরা পর্তুগিজদের উপস্থিতিতে সন্তুষ্ট চিন্তে মেনে নেয় নি। স্থানীয় লোকজন পর্তুগিজদের অপছন্দ করত। তবে ভাস্কো-দা-গামার আবিষ্কার ইউরোপীয় নাবিকদের বহু যুগের আশা পূর্ণ করে। এরপর থেকে পর্তুগিজরা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মালয়, মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলে মশলার বাণিজ্য থেকে আরবদের বিতাড়িত করে নিজেরা লাভবান হয়। এ সমুদ্রপথ আবিষ্কার হওয়ার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মধ্যে স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভাস্কো-দা-গামা পর্তুগালে ফিরে গেলে তাকে পর্তুগাল রাজা অ্যাডমিরাল অব দি সি অব দি ইন্ডিস পদবিতে ভূষিত করেন। পরে রাজা তাকে কাউন্ট অফ ভিভিগোয়েরা (Count of Vindiguera) পদে নিয়োগ দেন এবং তাকে ধনী হওয়ার সুযোগ করে দেন। ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ভাস্কো-দা-গামা ১৫০২ থেকে ১৫০৩ সালে আরো একবার সমুদ্রযাত্রার অভিযান করেছিলেন। এরপর তিনি অবসরে যান। ১৫২৪ সালে পর্তুগালরাজ তাকে তার ভারতীয় উপনিবেশের ভাইসরয় নিযুক্ত করেন। ১৫২৪ সালে ২৪ ডিসেম্বর কোচিনে ভাস্কো-দা-গামা মৃত্যুবরণ করেন।

স্পেনীয় ভৌগোলিক আবিষ্কারকগণ

স্পেনীয় ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন (১) ক্রিস্টোফার কলম্বাস, (২) ব্যালবোয়া, (৩) ম্যাগেলান, (৪) কটেজ, (৫) ফ্রান্সিসকো পিজারো ও (৬) গনজালো পিজারো। পর্তুগিজরা আফ্রিকার উপকূল ধরে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা করে। তবে স্পেনীয় নাবিকরা আটলান্টিক মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ ও দূরপ্রাচ্যে আসার জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা করে।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস : স্পেনীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬) ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। কলম্বাস ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করে ঐতিহাসিক ঘটনার সৃষ্টি করেন।

স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্দ কলম্বাসকে সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় জাহাজ, নাবিক ও অর্থ দান করেন।

কলম্বাস প্রথমে সান্তামারিয়া (The Santa Maria), পিন্টা (The Pinta), নিনা (The Nina) এ তিনটি জাহাজ নিয়ে প্রথম সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন।

১২ অক্টোবর বাহামা দ্বীপপুঞ্জ পৌঁছেন এবং এর নাম দেন স্যান সালাভেদর। তিনি তার লোকজন নিয়ে তীরে অবতরণ করেন এবং আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, এশিয়ার উপকূলের কোনো স্থানে তিনি পৌঁছেছেন। এটা ক্যাথে (চীন) বা জাপানের নিকটবর্তী দ্বীপ। তিনি পার্শ্ববর্তী দু'একটি দ্বীপ ঘুরে সেখানকার আদিবাসিন্দাদের সাক্ষাত পান। তারা ছিল দেখতে ভারতীয়দের মতো তাই এই দ্বীপগুলোকে তিনি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত করেছিলেন। ১৪৯২ সালে ২৮ অক্টোবর আরো পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে কিউবা আবিষ্কার করেন। তিনি এটিকে ক্যাথের অংশ মনে করেছিলেন।

তিনি পুনরায় ১৪৯৩ সালের ১৫ই মার্চ নিনা স্পেনীয় বন্দর প্যালাসে উপনীত হন। রাজা ফার্ডিনান্দ ও রানী ইসাবেলা কলম্বাসকে বিপুল অভ্যর্থনা দেন এবং তাকে Admiral of the Ocean sea উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ইন্ডিজের গভর্নর নিয়োগ করেন। তাকে হিসপানিওলাতে কলোনি স্থাপন, খ্রিস্টধর্ম প্রচার, আরো দেশ আবিষ্কারের নির্দেশ দেন।

ব্যালবোয়া: ১৫০১-১৫০২ সালে ব্যালবোয়া তার একটি জাহাজ চালিয়ে ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, পানামা যোজকের পূর্ব উপকূল আবিষ্কার করেন।

ম্যাগেলান (১৪৮০-১৫২১): স্পেনের সেভিল বন্দর থেকে রওনা হয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে ম্যাগেলান প্রশান্ত মহাসাগরে উপনীত হন। এ মহাসাগরের শান্তরূপ দেখে তিনি এর নামদেন প্রশান্ত মহাসাগর। ম্যাগেলানের অভিযান ভৌগোলিক আবিষ্কারের মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। তাকে তার সময়কালের শ্রেষ্ঠ নাবিক মনে করা হত।

স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস তাকে জাহাজ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। ম্যাগেলান The Conception (দ্য কনসেপশন), The San Antonio (দ্য সান এন্টিনিও), The Santiago (দ্য সান্তিয়াগো), The Trinidad (দ্য ত্রিনিদাদ) ও The victoria (দ্য ভিক্টোরিয়া) এই পাঁচটি জাহাজ ও ২৪০ জন জনবল নিয়ে ১৫১৯ সালে ২০ সেপ্টেম্বর স্পেনের সানলুকার বন্দর থেকে সমুদ্র অভিযানে বের হন। ১৫১৯ সালে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি রিও ডে জানিরো উপসাগরে পৌঁছে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল আবিষ্কার করেন। তিনি নতুন মহাদেশের একটি প্রণালী দিয়ে ১৫২০ সালে মার্চ-অক্টোবরে দক্ষিণ আর্জেন্টিনাতে পৌঁছেন। তিনি আবার সমুদ্র অভিযান করে একটি প্রণালী আবিষ্কার করেন। যা ইতিহাসে ম্যাগেলান প্রণালী নামে পরিচিত হয়। এর অবস্থান দক্ষিণ আমেরিকার শেষ দক্ষিণে। এর মধ্য দিয়ে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে যাওয়া যায়।

তিনি ভারত মহাসাগর হয়ে স্পেনে প্রত্যাবর্তনের জলপথ আবিষ্কার করেন।

ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনি প্রথম পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করার কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন

ফ্রান্সিসকো পিজারো (১৪৭৮-১৫৪১)-ফ্রান্সিসকো পিজারো পেরু দখল করায় স্পেনের রাজা তাকে 'মার্ক হুইস' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইংরেজ, ফরাসি ও ইতালীয় নাবিকদের ভৌগোলিক আবিষ্কার:

ফ্রান্সিস ড্রেক : ফ্রান্সিস ড্রেক ছিলেন দুঃসাহসিক ইংরেজ অভিযাত্রী। তিনি এক জলদস্যু দল গঠন করেন। পানামা যোজক ও তৎসংলগ্ন এলাকায় স্পেনীয় মালবাহি জাহাজে আক্রমণ করতেন। ১৫৭৭ সালে ফ্রান্সিস ড্রেক ম্যাগেনাল প্রণালী অতিক্রম করে উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছেন। সেখান থেকে সোজা পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ পার হয়ে ভারত মহাসাগরে পৌঁছেন। তারপর আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ১৫৮০ সালে ইংল্যান্ডে পৌঁছেন। তার এ দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথ তাকে নাইট উপাধি দিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস ড্রেকের এ অভিযানের ফলে ইংরেজরা পোপের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পূর্ব পশ্চিমে সমুদ্র অভিযান করেন। পশ্চিম দিকে ষোড়শ শতাব্দীর পরে উত্তর আমেরিকায় ১৩টি উপনিবেশ স্থাপন করে পূর্ব দিকে অভিযান করে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে ভারত মহাসাগরে আধিপত্য স্থাপন করেন। ইংরেজ বণিকরা ১৫৯১ সালে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করার জন্য জাহাজ প্রেরণ করেন। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ১৫৯৯ সালে তারা দ্বিতীয়বার বাণিজ্য জাহাজ প্রেরণ করেন। এর প্রেক্ষিতে ১৬০০ সালে ৩০ ডিসেম্বর পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে রাণী এলিজাবেথের সনদ নিয়ে ভারত ফিরে আসেন।

ফরাসি ভৌগোলিক আবিষ্কারকগণ : ফরাসি ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের মধ্যে জিওভান্নি বেরাজানো (Giovanni Verazano), জ্যাকভ্যাস কার্টিয়ার (Jacques Cartier) উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

ক্যাপ্টেন কুক ও অস্ট্রেলিয়া:

১৭শ শতাব্দীতে ক্যাপ্টেন কুক এর মতো আবিষ্কারকরা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সহ অনেক নতুন অঞ্চল আবিষ্কার করেন।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারন-

(১) কৃষি ও শিল্প উৎপাদনবৃদ্ধি

(২) শহরের চাহিদা

(৩) নবজাগরণের প্রভাব

(৪) ক্রুসেডের প্রভাব

(৫) মার্কোপোলোর বিবরণ-(ক) ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইউরোপের বহু বণিক ও পর্যটক প্রাচ্যদেশে আসতে শুরু করে।

(খ) ত্রয়োদশ শতকে মার্কোপোলো নামে ইতালির ভেনিস শহরের জনৈক বণিক প্রাচ্যের চীন, পারস্য, সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), জাপান, ব্রহ্মদেশ, ভারত প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে ইউরোপে ফিরে যান।

(গ) তাঁর রচিত ভ্রমণ কাহিনি ‘মার্কোপোলোর ভ্রমণ’ পাঠ করে ইউরোপবাসী প্রাচ্যের অগাধ ঐশ্বর্যের কথা জানতে পারে। এর ফলে ইউরোপে প্রাচ্যদেশ সম্পর্কে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

(ঘ) পর্তুগালের যুবরাজ নাবিক হেনরি মার্কোপোলোর বিবরণ পাঠ করেই প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে জলপথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা-র সঙ্গে এই গ্রন্থই ছিল।

(ঙ) সুতরাং এইসব থেকেই বোঝা যায় যে, সমুদ্রপথে নতুন দেশ আবিষ্কারে এই গ্রন্থ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল

৬.কনস্টান্টিনোপলের পতন

৭.ধর্মপ্রচার

৮.সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব

৯.বাণিজ্যিক স্পৃহা

১০.বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

(ক) নবজাগরণের সূচনাকালেই নাবিকের কম্পাস বা দিকনির্ণয় যন্ত্র, নক্ষত্র পরিমাপক যন্ত্র ও অ্যাস্ট্রোলেব বা অক্ষরেখা পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়।

(খ) ইতালির বাজারে তখন বিজ্ঞানসম্মত মানচিত্র ও মহাসমুদ্রের পথ-নির্দেশক মানচিত্রের অভাব ছিল না। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপীয়রা জানতে পারল যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা নয়— গোলাকার। সুতরাং পৃথিবীর যে কোনও স্থান থেকে রওনা হলে আবার সেই স্থানেই ফিরে আসা সম্ভব।

(গ) এই সময় দাঁড়-টানা নৌকোর মতো ছোটো ছোটো জাহাজের পরিবর্তে বড়ো বড়ো পালতোলা জাহাজ তৈরি শুরু হয়। এইসব নতুন আবিষ্কার মানুষকে সামুদ্রিক অভিযানে উদ্বুদ্ধ করে এবং এতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে পর্তুগাল ও স্পেন।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের গুরুত্ব :

- ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার -ভূমধ্যসাগর থেকে বিশ্বব্যাপী

পুঁজিবাদের সূচনা :

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কেন্দ্রীক ব্যবসা বাণিজ্য বৃহৎ আয়তন শিল্প ও কারখানায় পরিণত হয়। এর ফলে যৌথ মূলধনী ব্যবসা, মুদ্রানীতি, ব্যাংকিং ব্যবসা, শ্রমের অবাধ বিচরণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যের স্থলে বড় বড় যৌথ মূলধন কারবার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মূলধনের চাহিদার বৃদ্ধির ফলে ব্যাংক নামক লব্ধী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আমেরিকা ও এশিয়া থেকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূল্যবান ধাতু ইউরোপে জমা হয়। এই সমৃদ্ধ সম্পদ প্রাথমিক পুঁজিবাদের সূচনা করে। এর ভিত্তিতেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিকাশ হয়। এই বাণিজ্যপুঁজি ক্রমে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হয় যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সম্ভব করে। শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা গড়ে ওঠে।

অবাধ বাণিজ্য : ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের ব্যবসা ক্ষেত্রে গিল্ড প্রথা ভেঙে অবাধ বাণিজ্যের সূচনা হয়। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় যে সকল বিখ্যাত কর্পোরেট বাণিজ্য কোম্পানি গড়ে ওঠেছিল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মাক্সভি কোম্পানি (১৫৫৪), টার্কি-লেভান্ট কোম্পানি (১৫৮), মরক্কো কোম্পানি (১৫৮৫), গায়ানা কোম্পানি (১৫৮৮), ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৬০০) ইত্যাদি। শ্রম শোষণ-পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের ফলে শোষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পুঁজিবাদী স্বার্থে গড়ে ওঠে ক্রীতদাস প্রথা। আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস ধরে নিয়ে আমেরিকায় কৃষি খামার, পশু খামার, খনি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদিতে নিয়োগ করা হয়।

পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি : ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় বণিকরা আমেরিকা থেকে সোনা, রূপা, তামাক, কোকো, কুইনাইন, ভুট্টা, আলু, শিম ইত্যাদি নিয়ে আসে। এশিয়া থেকে মশলা, তুলা, রবি বৃক্ষ, রেশম, হাতির দাঁত, নী, চ, লবন, চা, কফি, কার্পেট, চীনা মাটির পাত্রা, কম্বল, সুগন্ধি দ্রব্য, মূল্যবান পাথর ইউরোপে নিয়ে আসে। আমেরিকাতে ইউরোপীয়রা নিয়ে গিয়েছিল ঘোড়া, গাধা, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, লেবু, কমলা, কলা, জলপাই, আঙুর ও খাদ্যশস্য। পরবর্তীকালে ইউরোপ আমেরিকায় রপ্তানি শুরু করে গম, সুতি ও পশমি বস্ত্র, বারুদ, লোহার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পণ্য। ইউরোপীয়রা এশিয়া ও আমেরিকা থেকে কাঁচামাল এনে তা পণ্যে রূপান্তর করে উনিবেশগুলোতে রপ্তানি করত।

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উপনিবেশিক শাসন

ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড উপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

পর্তুগাল:

- ভারতে ১৫০৫ সালে পর্তুগিজ নাবিক আলবুকার্ক ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়াতে পর্তুগিজ ঘাঁটি স্থাপন করে।
- পরে কোচিনে পর্তুগিজরা আরেকটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে।
- পর্তুগিজরা পারস্য উপসাগরে অরমুজ বন্দরটি দখল করে একটি ঘাঁটি স্থাপন করে।
- ১৫১১ সালে পর্তুগিজরা মালাক্কা দখল করে।
- পূর্ব দিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি অঞ্চল পর্তুগিজরা দখল করে।
- ১৫১৭ সালে পর্তুগিজরা চীনের ক্যান্টন দ্বীপে বাণিজ্যবন্দর স্থাপন করে।
- পরে চীনের ম্যাকাও দ্বীপটি দখল করে।
- ১৫৪২ সালে পর্তুগিজরা জাপানে বাণিজ্যঘাঁটি স্থাপন করে। -পর্তুগিজ ধর্মযাজক ফ্রান্সিস জেভিয়া জাপানে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন।
- এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ -পর্তুগিজরা উপনিবেশ স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা করেছিল। অবশ্য পরে হল্যান্ড, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড -পর্তুগিজদের পূর্ব ভারতীয় এবং ভারতীয় উপনিবেশগুলো কেড়ে নেয়।
- পর্তুগিজরা ১৫২০ সালে মোজাম্বিক দখল করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে।
- আবিসিনিয়াতেও তাদের ঘাঁটি ছিল।
- পর্তুগিজরা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ব্রাজিলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাজিলের দক্ষিণে সাওপাওলো এবং উত্তরে পার্নায়ুকে ও বাহিয়াতে পর্তুগিজদের উপনিবেশ ঘাঁটি ছিল।
- ১৫৬৭ সালে পর্তুগিজরা ফরাসিদের কাছ থেকে বায়ো-ডি জেনিরো কেড়ে নিয়ে তা ব্রাজিলের অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

স্পেন:

ভৌগোলিক আবিষ্কারের সুবাদে স্পেন বিশাল উপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চল স্পেনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ভৌগোলিক আবিষ্কার শুরু হয় তখন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানরা বাস করত। মেক্সিকো ও পেরু অঞ্চলে উন্নত নগর সভ্যতা ছিল। স্পেনীয়রা আমেরিকাতে গিয়ে স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যা করে ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

স্পেনীয়রা আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে সান ডমিঙ্গো দ্বীপে। পরে এর নামকরণ করা হয় হিস্পানিওলা।

এরপর ক্যারেবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করে।

-কালক্রমে ফ্লোরিডা থেকে ভেনিজুয়েলা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে স্পেনীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করে।

-স্পেনীয়রা ১৫১৯ সালে আমেরিকা মহাদেশের উন্নত আজটেক সভ্যতার দেশ মেক্সিকো দখল করে। স্পেনীয়রা মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ শহরটি দখল করে সেখানকার শাসক সম্রাট মন্টেজুমাকে পরাজিত করে প্রচুর সোনা ও মূল্যবান পাথর অধিকার করে। ক্রমে সমগ্র দেশটি স্পেনের কর্তৃত্বে আসে।

-১৫৩১ সালে পর্তুগিজরা আমেরিকার ইনকা সভ্যতার কেন্দ্র পেরু আক্রমণ করে। এরপর স্পেনীয়রা আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, চিনি ও ইকুয়েডর দখল করে।

-আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য পেড্রো ডি মেম্বোজা স্পেন রাজের সমর্থন নিয়ে আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে দখল করেন। তিনি ১৫৩৫ সালে বুয়েন্স এয়ারিস শহরটি স্থাপন করেন।

পিজারোর আরেকজন সহযোগী দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের চিনির রাজ্যটি দখল করে ১৫৪১ সালে সান্টিয়াগো শহরটি স্থাপন করেন।

*পিজারোর আরেকজন সহযোগী ইকুয়েডর দখল করে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে গোয়াই আকুইল শহরটি স্থাপন করেন।

১৫৩৮ সালে স্পেনীয়রা কলম্বিয়া দখল করে।

এসবস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে স্পেনীয়রা সোনা আহরণ, পশুপালন, ইক্ষু চাষ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। আফ্রিকা থেকে নিগ্রো দাস নিয়ে সেখানে কৃষির বিকাশ ঘটায়।

-ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয়রা আমেরিকাতে উপনিবেশিক শাসন কেন্দ্র স্থাপন করে নতুন স্পেন ও পেরুতে। নতুন স্পেন থেকে মেক্সিকো পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মধ্য আমেরিকা -দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চল ও প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ শাসন করত। পেরু থেকে শাসন করত চিলি ইকুয়েডর ও আর্জেন্টিনা।

-সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা খ্রিস্টধর্মের প্রচারের জন্য খ্রিস্টান যাজক ও সন্ন্যাসীকে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠানো হয়। পাদ্রিরা দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

স্পেন ১৫৫১ সালে লিমা এবং মেক্সিকো শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে।

-স্পেনীয়গণ দূরপ্রাচ্যে ফিলিপাইনকে ইউরোপীয়করণ করে। স্পেনীয় নাবিক ম্যাগেলান এ দ্বীপটি দখল করেছিলেন। ১৫২১ সালে স্পেনের যুবরাজ ফিলিপের নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয় ফিলিপাইন। ১৫৭১ সালে ম্যানিলা শহরটি স্থাপন করা হয়। স্পেনীয়রা ফিলিপাইনে অতি সহজে স্পেনীয় ভাষা, ইউরোপীয় সংস্কৃতি এবং খ্রিস্টধর্ম চাপিয়ে দেয়।

আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় বিস্তারনীতি : পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয়রা আফ্রিকাতে উপনিবেশ স্থাপন করে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান আমলে ইউরোপীয়রা আফ্রিকাতে সাম্রাজ্য স্থাপন করলেও মধ্যযুগে আফ্রিকা সম্পর্কে ইউরোপীয় রাজবংশগুলোর খুব একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল না। মিশরীয় ও কার্থেজীয় সভ্যতা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব ইউরোপীয়দের জানা থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ নামে পরিচিত ছিল। কারণ আফ্রিকার উপকূল রেখা ভিন্ন অভ্যন্তরভাগের কোনো সঠিক তথ্য ইউরোপীয়দের জানা ছিল না।

প্রথম দিকে পর্তুগিজরা আফ্রিকাতে ভৌগোলিক আবিষ্কার শুরু করে। পর্তুগিজরা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোজাম্বিক বা পর্তুগিজ পূর্ব আফ্রিকা নামে উপনিবেশ স্থাপন করে। পর্তুগালের ইচ্ছা ছিল পর্তুগিজ পূর্ব আফ্রিকা ও পর্তুগিজ পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জলপথ আবিষ্কার করে।

আফ্রিকাতে ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল আলজেরিয়া, নাইজার, লাইবেরিয়া, আইভরিকোস্ট, মৌরিতানিয়া, মালি, গিনি বিসাও, চাদ, সেনেগাল, তিউনিশিয়া, গ্যাবন, মাদাগাস্কার, কঙ্গো, ক্যামেরুন, টোগোল্যান্ড ও সোমালিয়া।

আফ্রিকায় ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল সিয়েরালিওন, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাম্বিয়া, বতসোয়ানা, সোয়াজিল্যান্ড, রোডেশিয়া, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, মিশর, সুদান, টাঙ্গানাইকা, টোগো, ক্যামেরুন প্রভৃতি অঞ্চলে। আফ্রিকাতে ইতালির উপনিবেশ ছিল ইথিওপিয়ায়। স্পেন মরক্কোতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন

ষোড়শ শতকে জার্মানি তথা সমগ্র ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি হলেন মার্টিন লুথার (Martin Luther, ১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দ)। মার্টিন লুথার ছিলেন জার্মানির উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি অগস্টাইন ভ্রাতৃসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেন। পবিত্র গ্রন্থ বাইবেল বর্ণিত 'সদ্ধর্ম' থেকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিচ্ছিন্নতা, পোপ ও যাজকদের বিলাসবৈভব ও অনৈতিক জীবনধারার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ওয়াইক্লিফ, জন হাস প্রমুখ করেছিলেন,

তাকেই লুথার এক বৃহত্তর সফল আন্দোলনে পরিণত করেন। তিনি ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি ও ভোগের মতো রীতিনীতির বিরোধিতা করে বাইবেলকে চূড়ান্ত ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং বিশ্বাসকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর ৯৫টি থিসিস (১৫১৭) আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়, যার ফলে খ্রিস্টধর্মে বিভাজন দেখা দেয় এবং প্রোটেস্ট্যান্ট নামক নতুন ধর্মীয় শাখার জন্ম হয়।

যান্ত্রিক ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে পঁচানব্বইটি থিসিস ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। মার্টিন লুথার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন ক্ষমাপত্র বিক্রি করে চার্চ অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে অর্থ আদায় করছে। তিনি আরও বলেন অনুতাপই হচ্ছে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। অনুতাপ চিত্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেই পাপ মুক্ত হয়, এজন্য চার্চের দ্বারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মের নামে এই অনাচারের প্রতিবাদে লুথার ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর ক্ষমাপত্রের বিরুদ্ধে ৯৫ দফা অভিযোগপত্র ইউটেনবার্গ গির্জার দরজায় টাঙিয়ে দেন। এটি পঁচানব্বই গবেষণাপত্র নামে পরিচিত। লুথার ক্যাথলিকধর্মের অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানকেই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। খ্রিস্টের শেষ নৈশভোজ-এর স্মরণে খাদ্যরূপে রুটি ও মদ গ্রহণ রীতি (The Eucharist), খ্রিস্টধর্মের আনুষ্ঠানিক দীক্ষাগ্রহণ (Baptism), দোষী ব্যক্তিকে পাদরি কর্তৃক শাস্তি প্রদান (Penance) এবং অর্থের বিনিময়ে পাপমুক্তি (Indulgence) ক্রয় প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন লুথার।

লুথারের মতবাদের মূল কথা দুটি ১) সবাই নিজেই নিজের পুরোহিত, এবং ২) ঈশ্বর বিশ্বাসই হল মুক্তির একমাত্র পথ।

লুথার ও পোপকে সমর্থনের প্রশ্নে জার্মানিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধ চলাকালেই ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি লুথারের মৃত্যু হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্যাথলিক চার্চ প্রতিবিপ্লব (Counter-Reformation) শুরু করে, যা প্রোটেস্ট্যান্টবাদের উত্থানকে প্রতিহত করার জন্য নিজস্ব সংস্কার ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ত্রেণ্টের পরিষদ (Council of Trent)-১৫৪৫ থেকে ১৫৬৩ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই পরিষদ ক্যাথলিক চার্চের নীতি ও ধর্মতত্ত্বকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে এবং চার্চের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর করার জন্য বিভিন্ন সংস্কার সাধন করে।

ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট (প্রুশিয়ার রাজা), পিট্রে the Great (রাশিয়ার জার), ক্যাথরিন দ্য গ্রেট (রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী), এবং জোসেফ ২ (পবিত্র রোমান সম্রাট) এরা সবাই ইতিহাসে enlightened despots বা আলোকিত স্বৈরাচারী নামে পরিচিত, যারা ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট (ফ্রেডরিক ২) প্রুশিয়ার রাজা এবং একজন বিখ্যাত সামরিক নেতা ও সংস্কারক।

গুরুত্ব:

তিনি & আলোকিত স্বৈরাচারী ধারণার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নিজের শাসনামলে শিক্ষা, শিল্পকলা ও সামরিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।

পিট্রে the Great (পিটার ২) কে ছিলেন: রাশিয়ার জার।

গুরুত্ব: তিনি ১৭৩০ সালে তাঁর বিয়ের দিনে বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এবং তাঁর মৃত্যুর ফলে রোমানভ রাজবংশের শেষ পুরুষ সদস্যের অবসান ঘটে, যার ফলে রাশিয়ার ইতিহাসে এক পরিবর্তন আসে।

ক্যাথরিন দ্য গ্রেট (ক্যাথরিন ২) রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী।

গুরুত্ব: তিনি একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং রাশিয়ার সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করে রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। জোসেফ ২ পবিত্র রোমান সম্রাট এবং হ্যাবসবার্গ অঞ্চলের শাসক।

গুরুত্ব:

তিনি উদারীকরণ ও আধুনিকীকরণের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন, যা তার ধর্মীয় নীতি ও অন্যান্য সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধিতার সৃষ্টি করে। তিনি এবং রাশিয়ার ক্যাথরিন দ্য গ্রেট ও ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট মিলে তিনজন মহান আলোকিত রাজা হিসেবে পরিচিত।

চতুর্দশ লুই

- চতুর্দশ লুই ছিলেন ফ্রান্সের একজন রাজা, যিনি "সূর্য রাজা" বা "লুই দ্য গ্রেট" নামে পরিচিত ছিলেন এবং তার দীর্ঘ ৭২ বছরের শাসনকাল (১৬৪৩-১৭১৫) ইউরোপীয় ইতিহাসে যেকোনো রাজার মধ্যে দীর্ঘতম।
- তিনি ফরাসি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের প্রতীক ছিলেন এবং "L'État, c'est moi" (আমিই রাষ্ট্র) এই উক্তির
- মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন।
- তিনি ভার্সাই প্রাসাদে ফরাসি সরকারের কেন্দ্র স্থানান্তর এবং ফরাসি ঔপনিবেশিকতার প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

- চতুর্দশ লুই যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তার নাবালক অবস্থায় কার্ডিনাল ম্যাজারিন (১৬৪২-১৬৬১) রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।
- ইউরোপের ইতিহাসে লুই রাজত্বকালকে লুইয়ের যুগ বলা হয় (Age of Louis)

রাজস্ব ব্যবস্থা:

- রাষ্ট্রের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস ছিল বিভিন্ন রকম কর। এর মধ্যে (১) টেইলি, (২) গ্যাবেলা, (৩) পলেট, (৪) কর্ভি ইত্যাদি ছিল প্রধান।
- কর্ভি জনসাধারণের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ কর হিসেবে আদায় করা হত।
- গ্যাবেলা ছিল লবণ কর, যা পরোক্ষভাবে লবণের উপর ধার্য করা হত।
- পলেট ছিল অভিজাতদের নিকট থেকে আদায়কৃত বংশানুক্রমিক কর। অভিজাতরা যে সকল সরকারি রাজপদ লাভ করেছিল তাদের মৃত্যুর পর তার সন্তানদের কেউ উক্তপদে মনোনীত হলে এই কর দিতে হত।
- টেইলি এক ধরনের ভ্রাতৃমূলক শ্রমকর যা কৃষকদের নিকট থেকে সরকারি রাস্তা, পুল ইত্যাদি নির্মাণ বা সংস্কারের জন্য আদায় করা হত। এ কাজের জন্য কৃষকদের কোনো মজুরি দিতে হত না এটি আমাদের দেশের বেগার খাটার অনুরূপ।

এ ছাড়াও রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তির খাজনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত আয়, সরকারি পদ বিক্রি করেও প্রচুর রাজস্ব সংগৃহীত হত।

মন্ত্রী পরিষদ : চতুর্দশ লুই শাসন ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। তার কোনো প্রধানমন্ত্রী ছিল না।

চতুর্দশ লুইয়ের পররাষ্ট্রনীতি

চতুর্দশ লুই পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে চতুর্থ হেনরি (১৫৮৯-১৬১০) ও রিশল্যুর (১৬২৪-১৬৪২) অনুসৃত বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছিলেন। বিশল্যু ফ্রান্সকে ইউরোপে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধে প্রোটেষ্ট্যান্টদের সমর্থন দিয়েছিলেন। চতুর্দশ লুই এই নীতি অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। কোলবার্ট চতুর্দশ লুইয়ের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ফ্রান্সে অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নতি সাধনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। চতুর্দশ লুই ফ্রান্সের গোড়া ক্যাথলিক জেনসেনিস্টদের উপর দমননীতি গ্রহণ করেছিলেন।

-চতুর্দশ লুই

১. চতুর্দশ লুইয়ের শাসনের মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

চতুর্দশ লুইয়ের শাসন ছিল আবসোলুট মোনার্কি, অর্থাৎ তিনি এককভাবে রাজ্যের সব ক্ষমতা ধারণ করতেন। তার শাসনকাল ছিল রাজ্য পরিচালনায় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উদাহরণ, যেখানে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে নিজেকে দেখতেন। রাজ্য, আইন, এবং ধর্ম সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

২. চতুর্দশ লুই কেন ভেরসাই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন?

ভেরসাই প্রাসাদ নির্মাণের মাধ্যমে চতুর্দশ লুই ফ্রান্সের রাজকীয় ক্ষমতাকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে অভিজ্ঞানিরা রাজ্য পরিচালনার বাইরে থাকুক এবং ভেরসাইয়ে থাকাকালে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চান। এছাড়াও, এটি তার রাজকীয় অভিজ্ঞান ও ক্ষমতার প্রতীক ছিল।

৩. চতুর্দশ লুই কেন যুদ্ধ করেছিলেন, এবং তা ফ্রান্সের জন্য কী ক্ষতি বয়ে এনেছিল?

চতুর্দশ লুই যুদ্ধ করতেন তার রাজ্যকে প্রসারিত করতে এবং ফ্রান্সের শক্তি বৃদ্ধির জন্য। যদিও তার যুদ্ধগুলো প্রথম দিকে সফল ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত করে ফেলে। দীর্ঘ যুদ্ধ এবং অসীম ব্যয় দেশকে নিঃস্ব করে দেয়, এবং জনগণের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

৪. চতুর্দশ লুই কীভাবে তার প্রতিপক্ষদের দমন করতেন?

চতুর্দশ লুই তার শাসনের সময় প্রতিপক্ষদের দমন করতে প্রচুর কৌশল ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ফরাসি অভিজ্ঞানিদের Versailles-এ সরিয়ে এনে তাদের স্বাধীনতা সীমিত করে দেন, এবং তাদের ওপর তীব্র নজরদারি রাখতেন। এছাড়া, তিনি ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে প্রোটেষ্ট্যান্টদের ওপর কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেন।

ফরাসি বিপ্লব (French Revolution)

স্থায়ীত্বকাল ১৭৮৯ - ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত।

বিপ্লবের মূল স্লোগান : Liberty, Equality & Fraternity.

স্লোগানের প্রবক্তা- জ্যাঁ জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau) ফরাসি বিপ্লব, ইউরোপ এবং পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর একটি। এই বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয় এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সূচনা-১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তব দুর্গ আক্রমণের মাধ্যমে।

পরিচিতি- ধনীদেব বিপ্লব/বুর্জোয়াদের বিপ্লব (Elite Revolution) নামে।

ফরাসি বিপ্লবে বুর্জোয়া ছিল মূলত মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও শিল্পপতিদের একটি শ্রেণী, যারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং পুরাতন সরকারের নীতি ও আইনের প্রতি বিরোধিতা করে।

❖❖ বিপ্লবকালীন রাজা- ষোড়শ লুই।

১৭৭৪ সালে ফরাসি সিংহাসনে আরোহণ করেন লুই। তবে দাদা পঞ্চদশ লুইয়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গুরুতর আর্থিক সমস্যা গুলি মোকাবিলা করতে শুরু থেকেই ব্যর্থ হন তিনি।

-ষোড়শ লুই তার আত্মজীবনীতে বলেন, “Kings are absolute masters and as such have a natural right to dispose of everything belonging to their subjects.”

ফরাসি বিপ্লব (French Revolution)

- চতুর্দশ লুই বলেন- আমিই রাষ্ট্র (I am State)।
- ষোড়শ লুই বলেন- আমি যা করি, তাই আইন
- পঞ্চদশ লুই বলেন-A king is accountable for his conduct only to God.

স্বাভাবিকভাবে জনগণের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। অর্থাৎ রাজার কোন কাজের সমালোচনা করার বা রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার তাদের ছিল না। কেউ রাজশাসনের সমালোচনা করলে “লেত্রী দ্য কেশে”নামক পরোয়ানা জারি করে তাকে গ্রেফতার করা হতো এবং বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল তাকে সাধারণত বাস্তিলের জেলখানায় (যা এককালে একটি দুর্গ ছিল) আটক রাখা হতো। এ জন্যে বাস্তিলের জেলখানাকে দেশবাসী স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীক বলে বিবেচনা করত। স্টেটস জেনারেল নামে দেশে একটি প্রতিনিধি সভা ছিল। কিন্তু ১৬১৪ সালের পর এ সভার কোন অধিবেশন ডাকা হয় নি।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই সমকালীন “প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রী” শাসনের মতবাদ গ্রহণ করেন নি।

চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালে স্বৈরতন্ত্র চরমে পৌঁছেলেও তাঁর আমলে শাসন ব্যবস্থা ছিল উন্নত।

ফরাসি বিপ্লব (French Revolution)

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করার ফলে তিনি ফরাসি জাতির আনুগত্য লাভ করেন। কিন্তু আঠারো শতকের ফ্রান্স ছিল অকর্মণ্য রাজা পঞ্চদশ লুই, ডিউক অব অরলিয়েন্স, ম্যাডাম প্যাম্পাডোর, দুর্বল-চিন্তের ষোড়শ লুই এবং তাঁর বিলাসপ্রিয় স্ত্রী মারিয়া আঁতোয়া কর্তৃক শাসিত। ঐতিহাসিক শেভিলের ভাষায় পঞ্চদশ লুই ছিলেন ‘প্রজাপতি রাজা’ তিনি আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতেন। তাঁর স্থায়ী উপপত্নী ম্যাডাম প্যাম্পাডোর রাজার দুর্বলতার সুযোগে প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতেন। ফলে প্রশাসন ক্রমে ক্রমে অনেকটা রাজার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ষোড়শ লুই ছিলেন সংস্কারবাদের লোক, কিন্তু তাঁর চরিত্রে কোন দৃঢ়তা ছিল না। তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রী (অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার কন্যা) মারিয়া আঁতোয়ার প্রভাবাধীন।

তিনটি সম্প্রদায় ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় বিপ্লব-পূর্ববর্তী ফ্রান্সের সমাজ বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত এবং অধিকারহীন এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অধিকারপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তর্ভুক্ত ছিল যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়। যাজকরা প্রথম এবং অভিজাতরা দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিকারহীন গোষ্ঠী ছিল ফরাসি বিপ্লব (French Revolution) যাজক ও অভিজাত ব্যতীত সমাজের অন্যান্য স্তরের অর্থাৎ তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শহরের সাধারণ মানুষ বা ভাসমান জনতা (সাঁকুলাত), ধনী কৃষক, ক্ষেত মজুর ও বর্গাদার।

যাজক:

১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে যাজকদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার সামান্য অংশ। যাজক গোষ্ঠী দুটো অংশে বিভক্ত ছিল, যথা, উচ্চ যাজক ও নিম্ন যাজক। কার্ডিন্যাল, আর্চবিশপ, বিশপ ও এবাট ছিল উচ্চ যাজকদের দলে। গ্রামের পাদরিরা ছিল নিম্নস্তরের যাজক। যাজক সম্প্রদায় অনেক ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। দেশের মোট ভূ-সম্পত্তির শতকরা ২০ ভাগের মালিকানা ছিল গির্জা বা যাজকদের হাতে, কিন্তু এ ভূ-সম্পত্তির জন্য সরকারকে কোনো কর বা ভাড়া দিতে হতো না। অন্যান্য কর পরিশোধ থেকে

তারা আংশিক ও সম্পূর্ণ অব্যাহতি ভোগ করত। অপরপক্ষে গির্জা বা যাজক শ্রেণী কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ বা টাইদ বা ধর্মকর হিসেবে আদায় করতো। এছাড়া তারা ফরাসি বিপ্লব (French Revolution) কৃষকদের কাছ থেকে মৃত্যু কর ও নামকরণ কর আদায় করার অধিকার পেয়েছিল। এ ভাবে যাজক সম্প্রদায় একটি বিত্তশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। ফরাসি মন্ত্রী নেকারের মতে বিপ্লবের প্রাক্কালে গির্জার বার্ষিক আয় ছিল ১৩ কোটি লিভর। অবশ্য গির্জার আয়ের সিংহভাগ উচ্চ যাজকরাই ভোগ করতো। ফলে নিম্নতরের যাজকদের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। ১৭৮৯ সালে এরা অনেকেই বিপ্লবে যোগদান করেন।

অভিজাত শ্রেণী:

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল অভিজাতবর্গ। এরা ছিল সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ। আঠারো শতকের শেষ দিকে অভিজাতরা কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অভিজাতদের উচ্চতর গোষ্ঠী ছিল রাজার সভাসদ, সেনাপতি, বিচার বিভাগের উচ্চ পদের এবং ইনটেনডেন্ট হিসেবে নিয়োগ লাভ করতো। অভিজাতদের আর একটি গোষ্ঠীকে গ্রাম্য অভিজাত বলা হতো। এরা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করতো। এদের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি শোষণের সম্পর্ক ছিল। এ দুই গোষ্ঠীর অভিজাতরা অসিধারী অভিজাত নামে পরিচিত ছিল। এরা ছিল বনেদী বা নীল রক্তবান অভিজাত। এছাড়া আর একটি অভিজাত গোষ্ঠী ছিল যাদের নীল রক্ত ফরাসি বিপ্লব (French Revolution) ছিল না। এরা ছিল চাকুরীজীবী অভিজাত বা পোষাকী অভিজাত। এরা প্রশাসক, আইনবিদ ও বিচারকের কাজ করতো। যাজকদের ন্যায় অভিজাত সম্প্রদায়ও কতগুলো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। এরা বংশ কৌলিণ্যের জোরে সরকারি উচ্চ পদগুলোতে একচেটিয়াভাবে নিয়োগের অধিকার পেয়েছিল। সামন্ত প্রভুরা ফ্রান্সের কৃষি জমির শতকরা ২০ ভাগের মালিক ছিল, কিন্তু তারা ভূ-কর আদায় করতো না। এ ছাড়া কাঁপিতার্মি এবং ভ্যাঁতিয়ার্মি নামক অন্য দুটি কর আদায়ও তারা নানা অজুহাতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতো। এরা রাজার সভাসদ হিসেবে ভাতা, পুরস্কার ও পেনশন পেতো। সমাজে এরা ছিল সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন। তাছাড়া অভিজাত গোষ্ঠী তাদের জমিদারীতে কতগুলো সামন্ত অধিকার ভোগ করত। যাজক ও অভিজাতরা ব্যতীত ফ্রান্সের আর সবাই ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। আঠারো শতকের শেষার্ধ্বে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল আড়াই কোটি। এর শতকরা ৯৬ ভাগ ছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ের অর্থাৎ অধিকারবিহীন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী, কৃষক ও শহরের শ্রমিক। বুর্জোয়া শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যাংকের মালিক, দালাল, শিল্পোৎপাদক, বণিক, ম্যানেজার, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, শিল্পী, গ্রন্থকার এবং বার্তাজীবী।

কর:

এসময়ে ফ্রান্সে তিন ধরনের প্রত্যক্ষ কর আদায় করা হতো। এগুলো ছিল তেই (ভূ-সম্পত্তির ওপর ধার্য কর), কাপিতার্মি (উৎপাদন ভিত্তিক আয়কর) এবং ভ্যাঁতিয়ার্মি (স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির ওপর কর)। প্রত্যক্ষ করের পাশাপাশি সরকার অনেক প্রকার পরোক্ষ করও আদায় করতো। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল গাবেল বা লবণকর এবং এদ বা ভোগ্যবস্তুর ওপর ধার্য কর।

■ বিপ্লবের অন্যতম নেতা- রোবসপিয়ের, দান্তে। অনুপ্রেরণা দেন রুশো, ভলতেয়ার।

মহামতি ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রি.)

ভলতেয়ার ছিলেন পূর্ববর্তী যুগের তথা ইউরোপের জ্ঞানদীপ্তি বা যুক্তির যুগের (age of enlightenment) শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ফ্রাঁসোয়া ম্যারি এয়ারাউয়ে। তিনি ১৬৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৭৮ সালে মারা যান। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি নাটক, কাব্য, ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা প্রকার রচনায় পারদর্শী ছিলেন। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর লেখাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে Philosophical Dictionary (Dictionnaire philosophique), Letters on England (Lettres philosophiques): Candide ইত্যাদি। এসব লেখায় তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি অতি সহজ এবং অনেকক্ষেত্রে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় তুলে ধরেন। তিনি তাঁর লেখনীর জন্যে দু'বার কারাবরণ করেন এবং একবার ইংল্যান্ডে ও আর একবার প্রুশিয়ায় পালিয়ে যান। তিনি ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত স্বেরাচারী শাসনের প্রবক্তা।

মন্তেকু:

The Persian Letters.. এ পুস্তকে তিনি উজবেক ও রিকা নামক দুইজন পারস্যদেশীয় ভ্রমণকারীর ছদ্মনামে ফরাসি সমাজের দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। তাঁর দ্বিতীয় অবদান ছিল ছোট একটি পুস্তক The Greatness and Decadence of the Romans. মঁতেসকিয়োর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান The Spirit of Law, 1748) বিশ বছরের পরিশ্রমের ফসল এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৭৪৮ সালে। মাত্র আঠারো মাসে পুস্তকটির ২২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে পুস্তকটি কত যে জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পুস্তকে তিনি দুটো প্রধান মতবাদ ব্যক্ত করেন। প্রথমত, কোনো দেশে কি ধরনের আইন বা সংগঠন প্রচলিত থাকবে তা নির্ভর করে সে

দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঐতিহ্যের ওপর। দ্বিতীয়ত, জনগণ যাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে সেজন্যে সরকারের তিনটি বিভাগ (কার্য-নির্বাহী, আইন প্রণয়ন এবং বিচার) পরাধীন থেকে স্বাধীন হওয়া অপরিহার্য। অর্থাৎ একটি বিভাগ অপর বিভাগের ওপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এর অন্যথা হলে জনগণ গনতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এ ধারণা ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্ব নামে পরিচিত। এভাবে মঁতেসকিয়ো ফ্রান্সে প্রচলিত স্বৈচ্ছাচারী রাজতন্ত্র এবং-এর ভিত্তিমূলে আঘাত করেন জ্যাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রি.) New Heloise, Emile, Confession (তাঁর আত্মজীবনী) Social Contract. রুশোকে ফরাসি বিপ্লবের মূল কারিগর মনে করা হয়। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জাগ্রত করতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন, “মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে। (Man is born free but everywhere he is in chains)” তিনি উল্লেখ করেন পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন ছিল। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানার ধারণা সৃষ্টি হলে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রতারণা ও অতৃপ্ত বাসনা মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। তাই মানুষ ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সামষ্টিক ইচ্ছার কাছে সর্মপন করে। এভাবেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। তাই জনতার অধিকার রয়েছে বিপ্লবের দ্বারা রাজতন্ত্রের পতন ঘটাবার। “লা কস্তা সোসিয়াল” গ্রন্থে উল্লেখিত এই বাণী ফরাসি জনগণকে বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করে। তাই রুশোকে ফরাসি বিপ্লবের মূল প্রবক্তা বলা হয়।

ফিজিওক্র্যাটস আঠারো শতকের মাঝামাঝি ‘ফিজিওক্র্যাট’ নামে একদল অর্থনীতিবিদের অভ্যুদয় ঘটে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ফ্রাঁসোয়া কেসনে, মিরাবো, তুর্গো এবং নেমুর। এসব অর্থনীতিবিদ দৃঢ়মত পোষণ করেন যে, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি অনুসারে তাকে উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতে দেয়া উচিত। অর্থাৎ বণিকবাদের প্রভাবে তৎকালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর সরকারের যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অবসান করতে হবে। গুরুনে এ ধারণাকে বলেছেন ‘লেসেফের বা অবাধ নীতি অর্থাৎ মানুষ নিজে যেটাকে উত্তম মনে করে সেটাই তাকে করতে দেয়া। এর পাশাপাশি ফিজিওক্র্যাটগণ নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব, যাজক-পুরোহিতদের তান্ত্রিক শাসন-শোষণের অবসান, পদমর্যাদার ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলোপ প্রভৃতি দাবিও পেশ করেন।

- ফরাসি বিপ্লবের শিশু- নেপোলিয়ন।
- বাস্তিল দুর্গ মূলত একটি- কারাগার (বর্তমান এটি জাদুঘর)।
- আইফেল টাওয়ার- ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তিতে নির্মাণ করা হয়।

ফরাসি বিপ্লব (French Revolution)

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল:

বুরবো রাজতন্ত্রের পতন, বাস্তিল দুর্গের পতন, ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের পতন ও ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রে রূপ নেয়, নেপোলিয়ন ক্ষমতা গ্রহণ করে (১৭৯৯)।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৫ই আগস্ট, ১৭৬৯-- ৫ই মে, ১৮২১-) তিনি ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের সময়কার একজন জেনারেল। তিনি ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রথম কনসল (First Consul) ছিলেন। তিনি নেপোলিয়ন ১ নামে ১১ নভেম্বর, ১৭৯৯ থেকে ৬ এপ্রিল ১৮১৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন এবং পুনরায় ১৮১৫ সালের ২০ মার্চ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন। তিনি ইতালির রাজাও ছিলেন। এছাড়া তিনি সুইস কনফেডারেশনের মধ্যস্থাকারী এবং কনফেডারেশন অফ রাইনের রক্ষকও ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ফরাসি সেনাবাহিনী এক দশকের বেশী সময় ধরে সকল ইউরোপীয় শক্তির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তিনি ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল তাঁর আয়ত্বে নিয়ে আসেন। ১৮১২ সালে সংগঠিত বিপর্যয়কারী রাশিয়া আগ্রাসন একটি যুগঃসন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাশিয়া আগ্রাসন এবং ১৮১৩ সালে লিপজিগে পরাজয়ের পর ষষ্ঠ কোয়ালিশন ফ্রান্সে আগ্রাসন চালায় এবং এর ফলস্বরূপ নেপোলিয়ন ১৮১৪ এর এপ্রিলে পশ্চাৎপসারণ করতে বাধ্য হন। কিছুদিন পরেই নেপোলিয়ন একটি অভিযান চালান যা হান্ড্রেড ডেস নামে পরিচিত। কিন্তু নেপোলিয়ন ১৮১৫ সালের ১৮ জুন ওয়াটারলুতে পরাজিত হন। নেপোলিয়ন তাঁর জীবনের বাকী ছয় বছর ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানে আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপ সেন্ট হেলেনাতে কাটান। নেপোলিয়নে সেনাবাহিনীতে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি মিশরে মুখোমুখি সংঘর্ষের উপযোগী সেনাবাহিনী নিয়োগ ছাড়াও যুদ্ধজাহাজের কামান নিয়ন্ত্রণের জন্য গোলন্দাজ বাহিনী স্থাপন করেন এবং সকল বিভাগে আদর্শ সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে সেরা ধারণাগুলো বেছে নিয়ে অসাধারণ একোটি বাহিনী প্রস্তুত করেন যেটি তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যুদ্ধে জয় এনে দেয়। সেনাবাহিনীতে তাঁর উদ্ভাবন সমূহ বর্তমানে প্রায় সকল সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তিনি সারা বিশ্বে সর্বকালের অন্যতম সেরা সেনাপতি হিসেবে সুপরিচিত। নেপোলিয়ন কোড প্রতিষ্ঠাও তাঁর অন্যতম সেরা কীর্তি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্ম- ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের কর্সিকা দ্বীপে।

- ১৭৯৯ সালে ফ্রান্সের প্রথম কনসাল (First Consul) হয়।
- ১৮০৪ সালে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট ঘোষণা করেন।
- ১৮১৫ সালে ওয়াটার লু যুদ্ধে বৃটেনের নিকট পরাজিত হন।
- সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় ১৮২১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

নেপোলিয়নের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ :

- ট্রাফালগারের যুদ্ধ (১৮০৫)
- লিপজিগের যুদ্ধ (১৮১৩)
- ওয়াটার লু যুদ্ধ (১৮১৫)

বিখ্যাত উক্তি

Impossible is a word which is found in a fools dictionary নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফরাসি সমাজে আধুনিকীকরণ আনতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো আইনি সংস্কার (নেপোলিয়নিক কোড), যেখানে আইনের চোখে সাম্য, ধর্মীয় স্বাধীনতা, এবং সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়। তিনি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার, যেমন একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রীভূত প্রশাসন এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা (উচ্চশিক্ষা) প্রবর্তন করেন। এছাড়াও, তিনি অবকাঠামোগত উন্নয়ন (রাস্তা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা) এবং সামরিক সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিকীকরণের পথে ফ্রান্সকে এগিয়ে নিয়ে যান। আইনি সংস্কার (নেপোলিয়নিক কোড) নেপোলিয়ন কোড (Napoleonic Code) বা ফরাসি সিভিল কোড (French Civil Code) একটি ঐতিহাসিক আইনবিধি যা ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দ্বারা প্রবর্তিত হয়। এটি ফ্রান্সের আইনব্যবস্থাকে এককীকৃত এবং সুনির্দিষ্ট করে তোলে এবং আধুনিক আইনব্যবস্থার জন্য একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ন কোডের মাধ্যমে ইউরোপ এবং বিশ্বের অনেক দেশের আইনব্যবস্থা প্রভাবিত হয়েছিল। নেপোলিয়ন কোড (Napoleonic Code) বা ফরাসি সিভিল কোড (French Civil Code) একটি ঐতিহাসিক আইনবিধি যা ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দ্বারা প্রবর্তিত হয়। এটি ফ্রান্সের আইনব্যবস্থাকে এককীকৃত এবং সুনির্দিষ্ট করে তোলে এবং আধুনিক আইনব্যবস্থার জন্য একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ন কোডের মাধ্যমে ইউরোপ এবং বিশ্বের অনেক দেশের আইনব্যবস্থা প্রভাবিত হয়েছিল।

নেপোলিয়ন কোডের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

আইনের সাম্য:

নেপোলিয়ন কোডে আইনের সামনে সকল নাগরিককে সমান হিসেবে দেখা হয়েছে, অর্থাৎ কোন বিশেষ শ্রেণী বা ব্যক্তির জন্য আইন ভিন্ন হবে না।

স্বত্বাধিকারের সম্মান:

কোডটি ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করে, এবং সেটি কোনো সময় যেন অন্য কেউ অধিকার করে না নিতে পারে, তা নিশ্চিত করা হয়।

স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত অধিকারের নিশ্চয়তা:

কোডটি নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং অধিকার সংরক্ষণ করে, যেমন সম্পত্তি কেনা-বেচা, বিবাহ, ও তালাকের অধিকার।

পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কিত আইন:

এই কোডে বিবাহ এবং পরিবার সম্পর্কিত আইন স্পষ্ট করা হয়েছিল। বিশেষত, নারী ও পুরুষের অধিকার, সন্তানদের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব এবং তালাকের প্রক্রিয়া।

চুক্তি এবং দায়িত্বের ভিত্তি:

চুক্তি তৈরির ক্ষেত্রে নতুন নিয়মাবলী নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেখানে কোনো ব্যক্তির নিজের ইচ্ছায় চুক্তি করার অধিকার ছিল এবং কোনো চুক্তি ভঙ্গ করলে প্রতিকার পেতে পারতেন।

প্রশাসনিক আইন:

প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে একটি কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে বিচারিক ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল।

বিপ্লবের আদর্শের বাস্তবায়ন:

এটি ফরাসি বিপ্লবের মূল আদর্শের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে মানুষের অধিকার, সমানতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।
নেপোলিয়ন কোডের প্রভাব:

ফ্রান্সে এবং ইউরোপে প্রভাব: নেপোলিয়ন কোড ফ্রান্সের আইন ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এর প্রভাব পড়ে। এটি ইউরোপীয় দেশগুলো, যেমন ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম, এবং পরবর্তীতে ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশের আইন ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছিল।

বিশ্বব্যাপী প্রভাব: নেপোলিয়ন কোডের প্রভাব শুধু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি বিশ্বের অন্যান্য জায়গায়ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকা, মিশর, এবং এমনকি কিছু এশীয় দেশে।

নেপোলিয়ন কোডের প্রবর্তনের উদ্দেশ্য:

আইনের একীকরণ: ফ্রান্সে তখন একাধিক পুরানো আইন এবং প্রথা ছিল, যা বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়ন কোড একক, সুনির্দিষ্ট এবং ইউনিফর্ম আইন প্রবর্তন করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। আইনের উপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি: কোডটি ফরাসি জনগণের মধ্যে আইন এবং ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, কারণ এটি সকলের জন্য সমান ছিল। বিপ্লবী আদর্শের বাস্তবায়ন: ফরাসি বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল সমতা, স্বাধীনতা এবং ভাইচারের আদর্শ বাস্তবায়ন। নেপোলিয়ন কোড এই আদর্শকে আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

নেপোলিয়ন কোডের সমালোচনা:

নারী অধিকারের সীমাবদ্ধতা:

নেপোলিয়ন কোডে নারীদের স্বতন্ত্র অধিকারের ব্যাপারে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন, নারীরা সম্পত্তি ধারণ করতে পারতেন, কিন্তু তাদের স্বামীদের অনুমতি ছাড়া তা ব্যবহার করতে পারতেন না।

অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর বিধান:

কোডটি অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দানে সমর্থ ছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

গণতন্ত্রের প্রতি অপ্রসন্নতা:

কোডটি কিছু জায়গায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে চাপিয়ে দিয়েছে, যা অনেকের মতে “একক আধিপত্য” কয়েম করার চেষ্টা ছিল।

পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কিত আইন:

এই কোডে বিবাহ এবং পরিবার সম্পর্কিত আইন স্পষ্ট করা হয়েছিল। বিশেষত, নারী ও পুরুষের অধিকার, সন্তানদের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব এবং তালাকের প্রক্রিয়া।

চুক্তি এবং দায়িত্বের ভিত্তি:

চুক্তি তৈরির ক্ষেত্রে নতুন নিয়মাবলী নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেখানে কোনো ব্যক্তির নিজের ইচ্ছায় চুক্তি করার অধিকার ছিল এবং কোনো চুক্তি ভঙ্গ করলে প্রতিকার পেতে পারতেন।

প্রশাসনিক আইন:

প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে একটি কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে বিচারিক ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল।

বিপ্লবের আদর্শের বাস্তবায়ন:

এটি ফরাসি বিপ্লবের মূল আদর্শের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে মানুষের অধিকার, সমানতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।
নেপোলিয়ন কোডের প্রভাব:

ফ্রান্সে এবং ইউরোপে প্রভাব: নেপোলিয়ন কোড ফ্রান্সের আইন ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এর প্রভাব পড়ে। এটি ইউরোপীয় দেশগুলো, যেমন ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম, এবং পরবর্তীতে ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশের আইন ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছিল।

বিশ্বব্যাপী প্রভাব: নেপোলিয়ন কোডের প্রভাব শুধু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি বিশ্বের অন্যান্য জায়গায়ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকা, মিশর, এবং এমনকি কিছু এশীয় দেশে।

নেপোলিয়ন কোডের প্রবর্তনের উদ্দেশ্য:

আইনের একীকরণ: ফ্রান্সে তখন একাধিক পুরানো আইন এবং প্রথা ছিল, যা বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়ন কোড একক, সুনির্দিষ্ট এবং ইউনিফর্ম আইন প্রবর্তন করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। আইনের উপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি: কোডটি ফরাসি জনগণের মধ্যে আইন এবং ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, কারণ এটি সকলের জন্য সমান ছিল। বিপ্লবী আদর্শের বাস্তবায়ন: ফরাসি বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল সমতা, স্বাধীনতা এবং ভাইচারের আদর্শ বাস্তবায়ন। নেপোলিয়ন কোড এই আদর্শকে আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

নেপোলিয়ন কোডের সমালোচনা:

নারী অধিকারের সীমাবদ্ধতা:

নেপোলিয়ন কোডে নারীদের স্বতন্ত্র অধিকারের ব্যাপারে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন, নারীরা সম্পত্তি ধারণ করতে পারতেন, কিন্তু তাদের স্বামীদের অনুমতি ছাড়া তা ব্যবহার করতে পারতেন না।

অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর বিধান:

কোডটি অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দানে সমর্থ ছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

গণতন্ত্রের প্রতি অপ্রসন্নতা:

কোডটি কিছু জায়গায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে চাপিয়ে দিয়েছে, যা অনেকের মতে একক আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা ছিল।

সামরিক আধুনিকীকরণ:

সামরিক কৌশল ও সংগঠনে আধুনিকীকরণ আনা হয়, যা আজও সামরিক বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এই সংস্কারগুলো ফ্রান্স এবং পশ্চিম ইউরোপের আধুনিকীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারকে স্থায়ী করে তোলে।

• শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার :- শিক্ষা ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের বিভিন্ন সংস্কারগুলি হল -

- (i) বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- (ii) প্রতিটি কমিউনে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
- (iii) বহু কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- (iv) সামরিক শিক্ষাদানের জন্য ২৯ টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
- (v) শিক্ষক শিক্ষকের জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।
- (vi) ৬ টি চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
- (vii) ফরাসি ভাষার সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- (viii) উচ্চশিক্ষার বিস্তারের জন্য ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ' University of France ' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

• অর্থনৈতিক সংস্কার :- নেপোলিয়ন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি হল -

- (i) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে Bank of France প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- (ii) নোট ছাপাবার সমস্ত অধিকার Bank of France কে দেওয়া হয়।
- (iii) কর আদায়ের সমস্ত বিধি ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা হয়।
- (iv) ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।
- (v) মুদ্রানীতির সংস্কার করা হয়।
- (vi) বিজিত দেশগুলি থেকে ক্ষতিপূরণবাবদ প্রচুর অর্থ সংগৃহীত করে ফরাসি রাজকোষ সমৃদ্ধ করা হয়।
- (vii) বেকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।
- (viii) ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে চেম্বার অব কমার্স কে পুনর্গঠিত করা হয়।
- (ix) উত্তর আমেরিকায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করা হয়।
- (x) অ্যাসাইনেট নামক নোট বাতিল করা হয়।
- (xi) সোনা ও রূপার মুদ্রার পুনঃপ্রচলন ঘটে।
- (xii) স্টক এক্সচেঞ্জ গঠিত হয় ও বন্দরগুলি সংস্কার করা হয়।

নেপোলিয়ন ফরাসি সংবিধান সংস্কার করেন কখন?

-১৮০০ সালে।

ভিয়েনা সম্মেলন ভিয়েনা সম্মেলন ইউরোপের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৮১৫ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম হয় ভিয়েনা সম্মেলন। ভিয়েনা সম্মেলনকে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রকৃত আন্তর্জাতিক সম্মেলন বলে বিবেচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের জন্য ভিয়েনা কংগ্রেস যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, ইউরোপের ইতিহাসে তা ছিল আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। ভিয়েনা সম্মেলনের পটভূমি ওয়াটার লু যুদ্ধে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতনের পর ইউরোপের রাজনীতিতে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোট (পোপ ও তুরস্ক ছাড়া) ১৮১৫ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে মিলিত হন। ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবর্গ ভিয়েনা কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক, রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার, ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসলরিগ, ফ্রান্সের ট্যালিরাভ, প্রুশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডরিক, অস্ট্রিয়ার রাজা প্রথম ফ্রান্সিস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ভিয়েনা সম্মেলনের মূলনীতি ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ ইউরোপ পুনর্গঠনের জন্য এবং ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নীতি গ্রহণ করেন। এ নীতিগুলো ভিয়েনা সম্মেলনের মূলনীতি নামে পরিচিত। এগুলো হলো- ১. ন্যায় অধিকার নীতি, ২. ক্ষতিপূর্ণ নীতি, ৩. শক্তি সাম্য নীতি।

১। ন্যায় অধিকার নীতি

ফরাসি বিপ্লবপূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ভিয়েনা সম্মেলনে ন্যায় অধিকার নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। ঐতিহাসিক গর্ডনে ক্রেইগ ন্যায় অধিকার নীতির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এ নীতির মর্ম ছিল যে, “প্রাক- নেপোলিয়ন যুগে যে সকল বংশানুক্রমিক রাজা ছিলেন তারা যদি নেপোলিয়নের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হয়ে থাকেন তবে তাদের ন্যায় অধিকার মেনে নিয়ে তাদের রাজ্য সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ধারণা করা হয়, ফরাসি মন্ত্রী ট্যালিরাভ হচ্ছেন ন্যায় অধিকার নীতির উদ্ভাবক। ন্যায় অধিকার নীতি অনুসারে ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ রাজবংশকে আবার ফিরিয়ে আনা হয় এবং ষোড়শ লুই-এর ভাই অষ্টাদশ লুইকে ফ্রান্সের রাজা বলে স্বীকার করা হয়। সার্ডিনিয়া-পিয়েডমন্ট ও হল্যান্ডেও যথাক্রমে স্যভয় পরিবার এবং অরেঞ্জ পরিবারকে পুনঃস্থাপন করা হয়। ন্যায় অধিকার নীতি অনুসৃত হওয়ায় পোপ পুনরায় তার মধ্য ইতালি রাজ্য ফিরে পান। এ নীতি অনুসরণ করে জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করা হয়।

২। ক্ষতিপূর্ণ নীতি

নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধে ইউরোপের বহু রাষ্ট্র বিশেষ করে ইংল্যান্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও সুইডেন অনেক ক্ষতির স্বীকার হয়েছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে ক্ষতিপূর্ণ নীতির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়। নেপোলিয়নের পরাজয়ে ইংল্যান্ডের অবদান ছিল সর্বাধিক। তাই ইংল্যান্ডের ক্ষতিপূর্ণও মিলল সর্বাধিক। ক্ষতিপূর্ণ হিসেবে ইংল্যান্ড লাভ করে সিংহল বা শ্রীলঙ্কা, কেপ কলোনি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মাল্টা ও আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ। ক্ষতিপূর্ণ হিসেবে প্রুশিয়া স্যাক্সনির অর্ধেক এবং সুইডেনের নিকট থেকে পোমেরানিয়া প্রদেশ পায়। এছাড়া ক্ষতিপূর্ণ হিসেবে হল্যান্ড বেলজিয়াম এবং রাশিয়ার গ্র্যান্ড ডাচি বা ওয়ারস-এর অধিকাংশ, ফিনল্যান্ড, বেসারাবিয়া ইত্যাদি লাভ করে। অস্ট্রিয়া ক্ষতিপূর্ণ হিসেবে লাভ করে উত্তর ইতালির লোমবার্ডি ও ভেনিসিয়া প্রদেশ। এছাড়া অস্ট্রিয়া টাইরল, সালজবার্গ ও ইল্লিরিয়া অঞ্চল লাভ করে।

৩। শক্তিসাম্য নীতি

পরস্পরবিরোধী স্বার্থবোধ এবং ভবিষ্যতে ফ্রান্সের আক্রমণ হতে ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য ভিয়েনা সম্মেলনে শক্তিসাম্য নীতি গ্রহণ করা হয়। এ নীতির মাধ্যমে ফ্রান্সের শক্তি খর্ব করা হয়। ফ্রান্সের সীমারেখা প্রাক-বিপ্লব যুগে যা ছিল সে সীমারেখায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। ফ্রান্স যাতে ভবিষ্যতে ইউরোপ আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য ফ্রান্সকে চতুর্দিক থেকে অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রাখা হয় এবং তাদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব সীমারেখা সম্প্রসারণ করার অধিকার দেওয়া হয়।

মেটারনিক

ইউরোপের একজন অবিসংবাদিত কূটনীতিবিদরূপে মেটারনিক (Metternich) সমধিক প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিকদের মতে সমকালীন ইউরোপে যুদ্ধ ও কূটনীতিতে মেটারনিকের সমকক্ষ কেউ ছিল না। ফ্রান্সের ইতিহাসে তাকে প্রতিক্রিয়াশীল যুগের প্রতিভূ বলা হয়ে থাকে। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পরাজয়ে মেটারনিক যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছিলেন তাতে তিনি নিজেকে ‘বিজেতা’ বলে গৌরববোধ করতেন। তিনি ভিয়েনা সম্মেলনে ‘কূটনৈতিক জাদুকর’ হিসেবে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেন। পরবর্তী দু’শতাব্দী ইউরোপীয় রাজনীতিতে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার অধিকাংশই তার কূটনীতির ফসল। ১৮০৯ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং ব্যক্তিগত প্রভাব ইউরোপের ইতিহাসে মেটারনিকের যুগের সূচনা করে। ১৮২৫ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত স্মেরাচারী ও

স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ইউরোপবাসী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ফলে একচ্ছত্র অধিনায়কদের একে একে পতন ঘটে। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব হলে মেটারনিক যুগের অবসান ঘটে। পতন ঘটে মেটারনিকের।

১৮৩০ সালের ফরাসি বিপ্লব

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসে ন্যায্য অধিকার নীতি গৃহীত হয় এবং এই নীতি অনুসারে ফ্রান্স বুরবোঁ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের নতুন ভাবধারা ও জাতীয় সংবিধানের আদর্শ অনুসারে শাসন পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। রাজতন্ত্রের সমর্থকেরা রাজার স্বার্থের তুলনায় রাজতন্ত্র, চার্চ ও অভিজাতদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে অধিক তৎপর ছিল এবং অন্যদিকে উদারপন্থীরা বিপ্লবের ভাবধারা ও আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তৎপর ছিলেন। এই দুই আদর্শগত দ্বন্দের মধ্যে অষ্টাদশ লুই সমন্বয়ের নীতি গ্রহণ করলেও পরবর্তী রাজা দশম চার্লস প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করলে তা নতুন একটি বিপ্লবের সূচনা করে। ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের বিভিন্ন কারণগুলি ছিল –

১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের কারণ:

চার্লস দশমের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন: চার্লস দশম (১৮২৪-১৮৩০) ছিলেন বুর্বন রাজবংশের রাজা এবং তার শাসনকালে তিনি বেশ কিছু স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তিনি ১৮২৫ সালে চার্লস অর্ডিন্যান্স (The July Ordinances) জারি করেন, যা জনগণের স্বাধীনতা কেটে দেয়, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সীমিত করে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরও কঠিন করে তোলে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা: ফ্রান্সে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা ছিল, যা জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও বিরোধিতা সৃষ্টি করেছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠলেও, রাজতন্ত্রের অধীনে তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। এর ফলে তারা সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। গণমত এবং প্রেসের স্বাধীনতা সংকুচিত করা: চার্লস দশমের শাসনামলে স্বাধীনতা, মত প্রকাশ এবং সাংবাদিকতার প্রতি নিয়ন্ত্রণ কঠোর ছিল। তাঁর সিদ্ধান্ত এবং আইনগুলোর কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং পত্রিকার সম্পাদকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ১৮২০-৩০ দশকের সামাজিক অস্থিরতা: এই সময়কালে ফ্রান্সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং বিপ্লবী মনোভাব আরও তীব্র হয়ে ওঠে। শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষকরা তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে থাকে।

জুলাই বিপ্লবের গুরুত্ব:

রাজতন্ত্রের পতন এবং সংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা: জুলাই বিপ্লবের ফলস্বরূপ, চার্লস দশম ক্ষমতা থেকে উৎখাত হন এবং লুই ফিলিপ রাজা হিসেবে ফ্রান্সের “রাজতন্ত্রের সংবিধানিক রূপ” প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ফ্রান্সে আধুনিক সংসদীয় ব্যবস্থা এবং সংবিধানিক রাজতন্ত্রের সূচনা করেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি: এই বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী (bourgeoisie) রাজনৈতিক ক্ষমতায় আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা একাধিক রাজনৈতিক অধিকার ও প্রতিনিধিত্ব পায়, যা তাদের আরও প্রভাবশালী করে তোলে। ফ্রান্সের রাজনৈতিক সংস্কারের সূচনা: বিপ্লবের পর, ফ্রান্সে রাজনৈতিক সংস্কার চালু হয়, যার মধ্যে ছিল বহুদলীয় ব্যবস্থার সূচনা, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অধিকারের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। আন্তর্জাতিক প্রভাব: এই বিপ্লবের ফলস্বরূপ, পুরো ইউরোপে এক ধরনের গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী প্রবণতা সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তী সময়ে ১৮৪৮ সালের ইউরোপীয় বিপ্লব এবং আরও অনেক স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। ফ্রান্সের বাইরে বিপ্লবের অনুপ্রেরণা: জুলাই বিপ্লব বিশ্বব্যাপী অন্যান্য দেশের বিপ্লবীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটি নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম এবং পোল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিকে প্রভাবিত করে। জুলাই রাজতন্ত্র ১৮৩০ সালে জুলাই মাসে ফ্রান্সে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়, তার ফলে অলিয়েক্স বংশের লুই ফিলিপ সিংহাসনে বসেন। জুলাই মাসে বিপ্লবের ফলে এই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে এই রাজতন্ত্র ‘জুলাই রাজতন্ত্র’ বা ‘জুলাই মনার্কি’ নামে পরিচিত। বুর্জোয়াদের প্রাধান্যের জন্য এই রাজতন্ত্রকে ‘বুর্জোয়া রাজতন্ত্র’-ও বলা হয়। ১৮৪৮ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে ‘জুলাই রাজতন্ত্রের’ অবসান ঘটে। এর ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল ফ্রান্সে সংঘটিত একটি শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণবিপ্লব, যা জুলাই রাজতন্ত্র বা জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে এবং লুই ফিলিপ-এর পদত্যাগে বাধ্য করে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এটি ছিল ১৮৪৮ সালের ইউরোপীয় বিপ্লবগুলোর একটি অংশ, যা জনগণের বসন্ত নামে পরিচিত এবং এর মূল কারণ ছিল আর্থ-সামাজিক অসন্তোষ, বেকারত্ব এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের গুরুত্ব ফ্রান্সে এই যুগান্তকারী ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব ছিল নিম্নরূপ—

- (১) রাজতন্ত্রের অবসান—প্রজাতন্ত্রের জয় ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং প্রজাতন্ত্রের জয় সূচিত হয়। প্রজাতন্ত্রী নেতা লা-মার্টিনের নেতৃত্বে ফ্রান্সে এক অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রি.), যা দ্বিতীয় ফরাসি প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত।
- (২) সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বীকৃতি ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্বে সংস্কারপন্থী নেতৃবর্গ থিয়ার্স, লা-মার্টিন প্রমুখ সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। কেননা বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের সমগ্র অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র ৩ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছিল। তাই বিপ্লবের পর দ্বিতীয় ফরাসি প্রজাতান্ত্রিক সরকার ফ্রান্সের সকল নাগরিককে ভোটাধিকার দিয়েছিল।
- (৩) এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠন সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বীকৃতিলাভ ও তার প্রয়োগ ঘটিয়ে ৭৫০ জন সদস্যের এককক্ষবিশিষ্ট একটি আইনসভা গঠন এই বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল। এই আইনসভায় চার বছরের মেয়াদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নীতি গৃহীত হয়।
- (৪) নিম্নবিত্তদের ক্ষমতা লাভ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সবথেকে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব ছিল এই যে, এই বিপ্লবের পরেই ফ্রান্সে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনশ্রেণির অবস্থার উন্নতি ঘটে। ভোটাধিকার লাভ করার পাশাপাশি এদের আর্থসামাজিক জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি ঘটেছিল। প্রকৃত অর্থে এই বিপ্লবের মাধ্যমে নিম্নবুর্জোয়ারা উচ্চবুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ই. লিপসন বলেছেন—১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্বারা উচ্চ-বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা নিম্নবুর্জোয়াদের হাতে চলে যায়।
- (৫) দাস প্রথা উচ্ছেদ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় ফরাসি প্রজাতান্ত্রিক সরকার দাসপ্রথার উচ্ছেদ ঘটায়। এর ফলে প্রায় ৫ লক্ষ স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার অধিকার ফিরে পায়।
- (৬) জনকল্যাণকামী শাসন প্রবর্তন প্রজাতান্ত্রিক সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারসাধনের মাধ্যমে জনকল্যাণকামী শাসন প্রবর্তন করে। (১) শ্রমিক সমস্যার সুরাহার লক্ষ্যে লুই ব্লাঙ্কের নেতৃত্বে লাক্সেমবার্গ রাজপ্রাসাদে এক স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন করা হয়। (২) ফ্রান্সের প্রত্যেক অধিবাসীর ‘কাজ পাওয়ার অধিকার’ স্বীকৃতি পায়। (৩) বেকারসমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্যারিসে ‘জাতীয় কর্মশালা’ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইউরোপের অন্যত্র ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলাফল

মেটারনিখ একবার মন্তব্য করেছিলেন— ‘When France catches cold, Europe sneezes’ অর্থাৎ ফ্রান্সের যখন ঠান্ডা লাগে, সমগ্র ইউরোপই তখন সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হয়। মন্তব্যটি যে কতদূর সার্থক ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলশ্রুতিই তা প্রমাণ করে। এর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সারা ইউরোপে দাবান্নের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের ১৫টি দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গতিশীল হয়ে ওঠে। তাই ডেভিড টমসন বলেছেন— ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ জনতার যুগের সূচনা করে।

(১) জার্মানিতে

জার্মানিতে বিপ্লবের ভাবধারা এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সঞ্চারণ করে। প্রাশিয়া, হ্যানোভার, স্যাক্সনি, ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, ব্রান্সউইক প্রভৃতি রাজ্যে উদারনৈতিক গণ আন্দোলন তীব্রতর হয়। ফ্রাঙ্কফোর্টে জার্মানির জাতীয়তাবাদীদের সমাবেশে প্রাশিয়ারাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়মকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সম্রাটপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

(২) ইতালিতে

ইতালির পার্মা, মোডেনা, মিলান, ভেনিস, টাস্কনি, সিসিলি, নেপলস, এমনকি পোপের রাজ্যেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। সার্ডিনিয়ারাজ চার্লস অ্যালবার্ট তাঁর রাজ্যে একটি উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেন। লম্বার্ডি ভেনেসিয়া ও মিলানের অধিবাসীরা অস্ট্রিয়-বাহিনীকে বিতাড়িত করে। ম্যাৎসিনির নেতৃত্বে রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) অস্ট্রিয়াতে

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে অস্ট্রিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ভিয়েনা, হাঙ্গেরি—সর্বত্র বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। ভিয়েনামে মেটারনিখের বাসভবন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। ভীত মেটারনিখ আত্মরক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলে মেটারনিখতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। অস্ট্রিয়ার সম্রাট একটি উদারনৈতিক সংবিধান প্রবর্তন বাধ্য হয়। মেটারনিখতন্ত্রের পতনের পর ‘লন্ডন টাইমস’ পত্রিকায় লেখা হয়—পুরাতনতন্ত্রের শেষ রশ্মি আজ নিভে গেল।

(৪) হাঙ্গেরিতে

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত হাঙ্গেরিতেও জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ শুরু হয়। উত্তর হাঙ্গেরির মডিয়ার গোষ্ঠীর অধিবাসীরা লুই কসুথের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হ্যাপসবার্গ সম্রাট সাংবিধানিক শাসক মনোনীত হন। এদিকে দক্ষিণ হাঙ্গেরি (পরে যুগোস্লাভিয়া)-তেও ক্রোট ও সার্ব জাতি জোসেফ জেলাকিকের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

(৫) অন্যান্য রাষ্ট্রে

বোহেমিয়ায় চেক ও স্লাভ জাতীয়বাদীরা তাদের দাবি আদায় করে নেয়। বেলজিয়াম, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, এমনকি ইংল্যান্ডেও গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে।

প্রথম জার্মান একীকরণ (১৮৭১)

জার্মান একীকরণ বলতে দুটি প্রধান ঘটনাকে বোঝানো হয়: ১৮৭১ সালে অটো ফন বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রুশিয়ার মাধ্যমে জার্মানির প্রথম একীকরণ, যার ফলে জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল, এবং ১৯৯০ সালে স্নায়ুযুদ্ধের পর পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির পুনরায় একীকরণ।

প্রথম জার্মান একীকরণ (১৮৭১)

প্রেক্ষাপট:

১৮১৫ সালের পর ইউরোপের জার্মান-ভাষী রাজ্যগুলি একটি শিথিল কনফেডারেশন (জার্মান কনফেডারেশন) গঠন করে।

প্রক্রিয়া:

প্রুশিয়ার চ্যান্সেলর অটো ফন বিসমার্ক একাধিক যুদ্ধের মাধ্যমে এই রাজ্যগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম হন।

ফলাফল:

১৮৭০ সালের ফ্রান্সো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পর, ১৮৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি ভার্সাইয়ের হল অফ মিররসে জার্মানিকে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ইতালির ঐক্য কী?

১৮৫৯ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্য ও অঞ্চলগুলো একত্রিত হয়ে এক আধুনিক দেশ “ইতালি” তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ইতালির ঐক্য।

পটভূমি:

১৮১৫ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পরাজয়ের পরে, ভিয়েনা কংগ্রেসে ইতালির অনেক অঞ্চল আয়নাভুক্ত রাজ্য হিসেবে বিভক্ত হয়। এতে ইতালির জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবনা এবং একীকরণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

মূল ধারক-সহায়ক:

১. জিউজেন্সে ম্যাজিনি (Giuseppe Mazzini): তিনি ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নেতা, যিনি ‘ইয়ুভেন্টু’ (Young Italy) নামক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইতালির ঐক্যের ধারণা প্রচার করেন।
২. কাউন্ট কামিলো দে কাভুর (Count Camillo di Cavour): পিয়েমন্ট সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, তিনি কূটনীতি ও সামরিক শক্তি ব্যবহার করে ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেন।
৩. জিউজেন্সে গারিবাল্ডি (Giuseppe Garibaldi): তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী যোদ্ধা, যিনি দক্ষিণ ইতালির ‘দ্যা রেড শার্টস’ (Red Shirts) বাহিনী নিয়ে লড়াই করে ঐক্যে বড় ভূমিকা রাখেন।

ক্রিমিয়ান যুদ্ধ (Crimean War)

সময়কাল: ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ সাল

প্রেক্ষাপট:

এই যুদ্ধ ছিল প্রধানত রাশিয়া ও অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে, যেখানে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সার্ডিয়া অটোমানদের পাশে দাঁড়ায়। রাশিয়া চেয়েছিল অটোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ব্ল্যাক সি এবং মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে।

মূল কারণ:

- রাশিয়া ইচ্ছা করেছিল যিরুজালেমের খ্রিস্টান ধর্মের সুরক্ষার জন্য আধিপত্য বিস্তার করতে।
- ব্ল্যাক সি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
- অটোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতাকে কাজে লাগানো।

প্রধান ঘটনাবলী:

- যুদ্ধ প্রধানত ক্রিমিয়ান উপদ্বীপে লড়াই হয়।

- সেবাস্তোপল দুর্গে রাশিয়ার প্রতিরোধ ছিল উল্লেখযোগ্য।
- সমুদ্রযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ উভয়ই সংঘটিত হয়।

ফলাফল:

- প্যারিস চুক্তি (১৮৫৬) দ্বারা যুদ্ধ শেষ হয়।
- রাশিয়াকে ব্ল্যাক সি-এ সামরিক উপস্থিতি সীমিত করতে হয়।
- অটোমান সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়।
- রাশিয়ার ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পায়।

বার্লিন কংগ্রেস (Berlin Congress)

সময়কাল: ১৮৭৮ সালে

প্রেক্ষাপট:

১৮৭৭-৭৮ সালের রুশ-তুর্কি যুদ্ধে রাশিয়া অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিগুলো যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছিল।

উদ্দেশ্য:

ইউরোপীয় বড় শক্তিগুলো মিলিত হয়ে বাল্কান অঞ্চলের ভাগ-বাটোয়ারা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করা।

অংশগ্রহণকারী:

প্রধানত জার্মানি (অটো ভন বিসমার্কের নেতৃত্বে), রাশিয়া, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ও অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরা।

ফলাফল:

- সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো, ও রোমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃতি পাওয়া।
- বুলগেরিয়ার আকার এবং ক্ষমতা হ্রাস।
- অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা দখল করে।
- ব্রিটেন সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করে।
- রাশিয়ার কিছু লাভ হ্রাস করা হয়।

গুরুত্ব:

ইউরোপে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় বার্লিন কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাল্কান অঞ্চলে সংঘর্ষের বীজ বপন করে, যা পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলোর মধ্যে একটি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)

সূচনা

- শুরু: ২৮ জুলাই, ১৯১৪
- শেষ: ১১ নভেম্বর, ১৯১৮
- স্থায়িত্ব: প্রায় ৪ বছর ৩ মাস
- ৩৭ টি দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।
- সূচনাকারী ঘটনা: সারায়েভোতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড হত্যাকাণ্ড
- হত্যাকারী: গ্যাভ্রিলো প্রিন্সিপ (সার্বিয়ান জাতীয়তাবাদী) পক্ষভুক্ত শক্তি
- অক্ষশক্তি (Central Powers): জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, অটোমান সাম্রাজ্য, বুলগেরিয়া
- মিত্রশক্তি (Allied Powers): ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ
- জার্মানি: কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম
- অস্ট্রিয়া: ফ্রাঞ্জ জোসেফ
- রাশিয়া: দ্বিতীয় নিকোলাস
- ব্রিটেন: পঞ্চম জর্জ

- ☐ ফ্রান্স: জর্জ ক্লেমেসো
- ☐ যুক্তরাষ্ট্র: উড্রো উইলসন
- ☐ যুদ্ধক্ষেত্র ও প্রধান যুদ্ধ
- ☐ পশ্চিম ফ্রন্ট: ফ্রান্স ও বেলজিয়াম
- ☐ পূর্ব ফ্রন্ট: জার্মানি ও রাশিয়া সীমান্ত
- উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ:
- ☐ মেরিন নদীর যুদ্ধ (১৯১৪)
- ☐ ভার্দ যুদ্ধ (১৯১৬)
- ☐ সোম নদীর যুদ্ধ (১৯১৬)
- ☐ গ্যালিপলি অভিযান (১৯১৫, তুরস্কে) অস্ত্র ও প্রযুক্তি
- ☐ নতুন অস্ত্র: ট্যাংক, সাবমেরিন, বিমান, বিষাক্ত গ্যাস, মেশিনগান
- ☐ ট্যাংক প্রথম ব্যবহার: সোম যুদ্ধ (১৯১৬)
- ☐ Poison Gas ব্যবহারকারী: জার্মানি
- ☐ সাবমেরিন যুদ্ধ: জার্মানির “U-Boat”
- ☐ যোগাযোগ ব্যবস্থা: টেলিগ্রাফ, টেলিফোন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা
- ☐ প্রাথমিক নীতি: নিরপেক্ষতা
- ☐ যুদ্ধে যোগ: ১৯১৭ সালে
- ☐ কারণ: জার্মানির সাবমেরিন আক্রমণ ও Lusitania জাহাজ ডুবানো
- ☐ প্রেসিডেন্ট উইলসন: “Fourteen Points” নামে শান্তি প্রস্তাব দেন
- ☐ আমেরিকার প্রবেশে মিত্রশক্তির শক্তি বৃদ্ধি পায় যুদ্ধের ফলাফল
- ☐ নিহত: প্রায় ১ কোটি মানুষ
- ☐ আহত: প্রায় ২ কোটি মানুষ
- ☐ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, অটোমান ও রাশিয়ান সাম্রাজ্যের পতন
- ☐ রাশিয়ায় বিপ্লব ও বলশেভিক ক্ষমতা গ্রহণ
- ☐ ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি
- ☐ ভার্সাইলস চুক্তি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটানো শান্তি চুক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চুক্তি জার্মানি এবং মিত্রশক্তির মধ্যে যুদ্ধের অবস্থার সাথে শেষ হয়। “ভার্সাই চুক্তি (১৯১৯)
- ☐ জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয় (৬৬০ কোটি পাউন্ড)
- ☐ সেনাবাহিনী সীমিত করা হয় (১ লাখ সৈন্য)
- ☐ রাইনল্যান্ডকে নিরস্ত্রীকৃত ঘোষণা
- ☐ জার্মানির উপনিবেশ মিত্রশক্তির হাতে চলে যায়
- ☐ পোল্যান্ডকে স্বাধীন করতে বাধ্য করা হয়
- ☐ জার্মান জনগণের কাছে অপমানজনক চুক্তি
- ☐ প্রভাব ও তাৎপর্য
- ☐ লীগ অব নেশন্স (১৯২০) গঠন
- ☐ নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি: যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড
- ☐ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে ওঠে
- ☐ ইউরোপ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়
- ☐ যুদ্ধ ভবিষ্যতের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি তৈরি করে

ভারত ও বাংলার প্রেক্ষাপট

- ভারত থেকে প্রায় ১৩ লাখ সৈন্য যুদ্ধে অংশ নেয়
- নিহত: প্রায় ৭৪ হাজার
- যুদ্ধের প্রভাব: মূল্যফীতি, কর বৃদ্ধি
- ভারতের স্বাধীনতার দাবি আরও জোরদার হয়
- খেলাফত আন্দোলন শুরু হয় অটোমান পতনের প্রেক্ষিতে
- বাংলায় খাদ্যসংকট দেখা দেয়
- জিয়ারম্যান পরিকল্পনা:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, যুগান্তর দল বিদেশে সহানুভূতিশীল ও বিপ্লবীদের মাধ্যমে জার্মান অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমদানির ব্যবস্থা করেছিল যতীন রাসবিহারী বোসকে সমগ্র ভারত জুড়ে বিদ্রোহ ঘটাতে উচ্চ ভারতের দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। এটি 'জার্মান প্লট বা 'জিয়ারম্যান পরিকল্পনা' নামে পরিচিত হয়। বার্লিন কমিটি ১৯১৫ সালে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর গঠনের পিছনে মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, লাল হরদয়াল। কমিটি 'জিয়ারম্যান পরিকল্পনা'-এর অধীনে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের সহায়তায় গঠিত হয়েছিল। কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতে গোলাবারুদ পাঠানো।

ভার্সাই চুক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ শেষে বিজয়ী মিত্রশক্তি ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদে জার্মানির সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইতিহাসে এটি ভার্সাই চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী ঘোষণা করা হয় এবং কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়। জার্মানির সেনাবাহিনী সীমিত করে দেওয়া হয়, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠন নিষিদ্ধ করা হয় এবং বিশাল অঞ্চলের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। পাশাপাশি আলসাস-লরেন প্রদেশ ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং রাইন নদীর পূর্বাঞ্চল নিরস্ত্রীকৃত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ভার্সাই চুক্তি

- তারিখ ও স্থান: ১৯১৯ সালের ২৮ জুন, ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদে স্বাক্ষরিত।
- কার সাথে: মিত্রশক্তি ও জার্মানির মধ্যে।
- ভার্সাই চুক্তির প্রধান ধারা (বিস্তারিত)

১. যুদ্ধের দায়ভার

- চুক্তির ২৩১ ধারায় জার্মানিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ঘোষণা করা হয়।
- এটি 'War Guilt Clause' নামে পরিচিত।
- এর ফলে জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হয়।

২. ক্ষতিপূরণ আদায়

- জার্মানিকে প্রায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়।
- এই টাকা দিতে গিয়ে জার্মানির অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, মুদ্রাস্ফীতি ও দারিদ্র্য দেখা দেয়।

৩. সামরিক সীমাবদ্ধতা

- জার্মান সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ সৈন্যে সীমাবদ্ধ করা হয়।
- ট্যাংক, ভারী কামান, সাবমেরিন ও যুদ্ধবিমান রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি।
- নৌবাহিনীতে সর্বোচ্চ ছয়টি যুদ্ধজাহাজ রাখার অনুমতি ছিল।
- রাইন নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চল সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকৃত করা হয়।

৪. ভূখণ্ড হারানো

- আলসাস-লরেন প্রদেশ ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
- পোল্যান্ড-কে 'পোলিশ করিডোর' দেওয়ার জন্য জার্মানির কিছু ভূমি কেটে নেওয়া হয়।
- সুদেটেনল্যান্ড, ডানজিগ ও সার প্রদেশ জার্মানির হাতছাড়া হয়।
- রাইনল্যান্ড নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়।

৫. উপনিবেশ হারানো

- আফ্রিকা ও এশিয়ায় জার্মানির সব উপনিবেশ ছিনিয়ে নিয়ে মিত্রশক্তির মধ্যে ভাগ করা হয়।
- যেমন – জার্মান পূর্ব আফ্রিকা ব্রিটেন ও বেলজিয়াম ভাগ করে নেয়, সামোয়া নিউজিল্যান্ডের হাতে যায়, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ জাপান দখল করে।

৬. রাষ্ট্রসঙ্ঘ (League of Nations)

- ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রসঙ্ঘ (League of Nations) গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।
- জার্মানিকে প্রাথমিকভাবে এতে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।
- ভার্সাই চুক্তির পরিণতি
- রাজনৈতিক পরিণতি – জার্মানি অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়।
- -রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়; ডেমোক্র্যাটিক Weimar সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে।
- জাতীয়তাবাদী শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- হিটলারের উত্থান সহজ হয়।

অর্থনৈতিক পরিণতি –

- বিশাল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ফলে অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়।
- অতিমুদ্রাস্ফীতি ও দারিদ্র্য দেখা দেয়।
- বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।
- সামরিক পরিণতি – জার্মানির সামরিক শক্তি ভেঙে পড়ে।
- সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে সীমাবদ্ধতা জার্মানিকে দুর্বল করে তোলে।

সামাজিক পরিণতি –

- জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।
- জাতীয় গৌরবহানী ক্ষুব্ধ হয়।
- আন্তর্জাতিক পরিণতি – রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যকরভাবে শান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়।
- মিত্রশক্তির মধ্যে প্রতিশোধপরায়ণতা বাড়ে।
- দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি – জার্মানির প্রতিশোধস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দেয়।

রাজনৈতিক পরিণতি

চুক্তিতে জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী ঘোষণার কারণে জনগণের মধ্যে জাতীয় অপমান ও অসন্তোষ জন্মায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়; ডেমোক্র্যাটিক Weimar সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদী ও চরমপন্থী দলগুলোর উত্থান ঘটে। এই পরিস্থিতি হিটলারের ক্ষমতায় আসার পথ সুগম করে এবং পরবর্তীতে ফ্যাসিবাদী শাসনের উদ্ভব হয়। অর্থনৈতিক পরিণতি বিশাল ক্ষতিপূরণ (৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) দেওয়ার কারণে জার্মানি অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়। অতিমুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে দারুণ কষ্টকর করে তোলে। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি দেখা দেয়। ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষি খাত ধ্বংসের মুখে পড়ে। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের উত্থান রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র বা সোসালিজমের উত্থান মূলত ১৯শ শতকের শেষভাগে এবং ২০শ শতকের প্রারম্ভে ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে প্রধান কারণ, প্রক্রিয়া এবং ঘটনাগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায় নিচের মতো:

১. প্রেক্ষাপট

অর্থনৈতিক অবস্থা: ১৯শ শতকের শেষের দিকে রাশিয়ার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিপ্রধান। জমির মালিক ও বড় জমিদার শ্রেণী (নোবেল বা বয়ার) সমৃদ্ধ থাকলেও কৃষকরা দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করতেন। শিল্প বিপ্লব: শিল্পায়ন ধীরে ধীরে চলছে, কিন্তু শহরে শ্রমিক শ্রেণী (প্রোলেতারিয়াত) খারাপ শ্রম এবং নিম্ন মজুরিতে কাজ করত।

রাজনৈতিক অবস্থা: সম্রাট ও প্রাচীন রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা (Tsarist autocracy) ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে কোনো রাজনৈতিক অধিকার কম ছিল।

- সমাজতন্ত্রের ধারণার আগমন

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস: তারা ১৯শ শতকের মধ্যভাগে মার্কসবাদ প্রচার করেন, যা শ্রমিকদের অধিকার, অর্থনৈতিক সমতার গুরুত্ব এবং পুঁজিবাদের বিপর্যয় সম্পর্কে জোর দেয়। পুঁজিবাদী শোষণ নির্ভর উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার বিপরীতে কার্ল মার্কস দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মতবাদ উদ্ভাবন করেন। তাঁর এ মতাদর্শ মার্কসবাদ নাম খ্যাত। ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণ, নির্যাতন উপলব্ধি করে কার্ল মার্কসের আগে রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফুরিয়ে প্রমুখ দার্শনিকগণ ধনতান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন শ্রমিক সমাজের কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কোন্ পথে বাস্তবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার কোন প্রকার সঠিক রূপরেখা প্রদানে উক্ত দার্শনিকগণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা ‘কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী (Utopian Socialist)’ হিসেবে খ্যাত। ১৮৪৮ সালে এঙ্গেলস- মার্কস এর যৌথ কাজ বিখ্যাত ‘কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। মার্কস তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শোষণের উপর গবেষণা শুরু করেন এবং এঙ্গেলস-এর সহায়তায় ১৮৬৭ সালে ‘ক্যাপিটাল’ নামক গ্রন্থরচনা করেন। পরবর্তীতে এই পুস্তকের আরও দুইখণ্ড প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও ‘দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি’, ‘দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স’ প্রভৃতি পুস্তক রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ১৮৮৩ সালে লন্ডনে তিনি মারা যান। সংক্ষেপে মার্কসবাদকে মোটামুটি পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা যায়, যথা:

● দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ ● ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ● শ্রেণী সংগ্রাম

তত্ত্ব ● উদ্ভূত মূল্যতত্ত্ব ● সাম্যবাদ।

দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ-বস্তুগত সংঘাতের ফলেই সমাজ ইতিহাস এগিয়ে যায়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-প্রত্যেক সমাজেই ‘উৎপাদনের শক্তি’ এবং ‘উৎপাদন সম্পর্কের’ মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব-মানব জাতির জ্ঞাত ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

উদ্ভূত মূল্যতত্ত্ব: মানুষ তখন প্রত্যেকে নিজের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অন্যের সাথে বিনা সংঘাতেই পেয়ে যাবে।

রাশিয়ান বিপ্লববাদী দল:

বোলশেভিকস (লেনিন নেতৃত্বে) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য জোরালোভাবে আন্দোলন শুরু করে। মেনশেভিকস প্রগতিশীল পরিবর্তনের জন্য ধাপে ধাপে রিফর্মের পক্ষে ছিল। দলীয় কংগ্রেসে লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক (যার বাংলা অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ) অল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবধান বিরোধী অংশ মেনশেভিকরা কৃষকদের (সংখ্যালঘু) পরাজিত করে। [1903]

লেনিন

াদিমির লেনিন জীবনের প্রথম পর্বে (১৮৮৭ - ৮৮) ইউরোপীয় বিপ্লবী চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। বিশেষত: কার্ল মার্কস রচিত পুঁজি গ্রন্থটি পাঠের পর নিজেকে তিনি একজন মার্কসবাদী হিসেবে আবিষ্কার করেন। ১৮৯১ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর ভলগা অঞ্চলের সামারা শহরে দুবছর আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৮৯৩ সালে লেনিন সেন্ট পিটার্সবুর্গে উদীয়মান মার্কসবাদী রাজনৈতিক চক্রে যোগদান করেন এবং ১৮৯৫ সালে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। এসব আলোচনা চক্রে এবং অংশ গ্রহণের সময় লেনিন সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতেন কিভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করা উচিত বিপ্লবীদের জীবনে, পুঁজিবাদ ও জার সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার কী পদ্ধতিতে। এই বিপ্লবী তৎপরতার অভিযোগে লেনিন তাঁর অপর এক বিপ্লবী সহকর্মী ও পরবর্তীতেম স্ত্রী নাদেজা ক্ষেপস্কায়ার সাথে ১৫ মাস কারাবরণ এবং ১৯০০ সাল অব্দি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জীবন কাটান। অতঃপর লেনিন ইউরোপ প্রবাসে চলে যান এবং সেখানকার বিপ্লবী চক্রে যোগদানপ র্বক ‘ইস্ট্রো’ নামে পত্রিকা প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। লেনিনের উদ্যোগ ও পরিচালনায় রাশিয়ায় গড়ে উঠে ইস্ত্রার সহযোগী গ্রুপ ও পাঠক চক্র। পত্রিকাটি সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়তা করে। নির্বাসনের দ্বিতীয় পর্বে ১৯০২ সালে লেনিন রচনা করেন তাঁর সাংগঠনিক মতবাদ সম্বলিত গ্রন্থ ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান’? এই গ্রন্থে লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন, পেশাদার বিপ্লবী ধারণা, বিপ্লবীদের কৌশল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সব ধারণার অনেকগুলোই লেনিন উদ্ভাবন করেন মার্কস-এঙ্গেলস-এর চিন্তাধারাকে রাশিয়ার সমাজ জীবনে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রয়োজনে। দলের বিপ্লবী চিন্তাধারার কর্তৃধার লেনিন ১৯০৯ সারে রচনা করেন ‘মেটোরিয়ালিজম এন্ড ইম্পিরিও ক্রিটিসিজম’ গ্রন্থ। এতে তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞানের সর্বশেষ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদী দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ তুলে ধরেন। লেনিনের তত্ত্বেও অর্থনীতির একটি কার্যকর ভূমিকা ছিল। তিনি এ তত্ত্ব উপস্থাপন করার জন্য আশ্রয় করেছেন Imperialism is the Highest Stage of Capitalism নামক গ্রন্থের। তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারকে পুঁজি বিস্তারের সর্বোচ্চ স্তর বলে দাবি করেছেন তারও তিন বছর পর প্রাগে দলীয় এক

কনভেনশনে মেনশেভিক-বলশেভিক ভাঙ্গন চূড়ান্ত হয়ে পড়ে। ১৯১৪ সালে লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে যুদ্ধকে বুর্জোয়াদের অভ্যন্তরীণ লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাঁর কর্মীদেরকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই-এ অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানান।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে সংগঠিত বিপ্লবে জার সরকারের পতন ঘটলে লেনিন গোপনে জার্মানী হয়ে পেট্রোগার্ড (সেন্ট পিটার্সবুর্গের নতুন নামকরণ) পৌঁছান। জোসেফ স্ট্যালিনসহ স্থানীয় বলশেভিক নেতৃবৃন্দ তখন লেনিনকে জানান যে অভ্যুত্থানের সোভিয়েত শ্রমিক ও সেনা সদস্যরা বুর্জোয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন যুগিয়েছে। এটি অবহিত হয়ে লেনিন তার তাত্ক্ষণিক বক্তৃতায় (ইতিহাসে যা ‘এপ্রিল থিসিস’ নামে খ্যাত) দলের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহবান জানান। লেনিন যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বলশেভিক বিপ্লবের পর একমাত্র শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত সোভিয়েতগুলো (পরিষদসমূহ) রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের আশা – আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম। পরবর্তীতে জুলাই মাসে শ্রমিকদের একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর লেনিন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে লুকিয়ে আগস্ট – সেপ্টেম্বর মাসে ফিনল্যান্ড অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে ‘রাষ্ট্র ও বিপ্লব’ নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই বইতে তিনি শ্রেণী সংগ্রাম, রাষ্ট্র ও বিপ্লবের সমস্যাবলী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জনগণের ভূমিকা, সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ, জনগণের সাথে পার্টি ও নেতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। উপরন্তু, মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বকে কিছুটা পরিশীলিত করে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে সমাজবিকাশের দু’টো পৃথক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেন লেনিন। মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে লেনিনের ‘রাষ্ট্র ও বিপ্লব’ বইটি এক মৌলিক অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

নিহিলিজম ও নারোদনিক আন্দোলন: ১৯ শতকের রাশিয়ায় গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি গুপ্ত সংগঠনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিহিলিজম এবং নারোদনিক। এরা জার শাসনের অত্যাচার, শোষণ ও স্বৈরতান্ত্রিকতা থেকে দেশকে মুক্ত করার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাঠে নামে। তারা নানা দিক থেকে জার বিরোধী অবস্থান নিয়ে সাধারণ মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। অনেক নির্যাতিত মানুষ তাদের দলে গিয়ে যোগদান করে। তারা আর্থসামাজিক মুক্তির আশায় একের পর এক জার বিরোধী কর্মকাণ্ডে-আত্মনিয়োগ করে। জার শাসনের চরম দমননীতির মুখে এ দুটি আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী চরিত্র নিলে পরিস্থিতি হয়ে যায় আরো ভয়াবহ। তবে জারদের নিষ্ঠুর দমননীতির মুখে এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও মুক্তির সংগ্রামে তাদের প্রয়াস ও আত্মদান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে। নির্যাতিত রুশ জনগণ মুক্তির দিশারী হিসেবে গ্রহণ করে বলশেভিকদের।

প্রধান ঘটনা

১৯০৫ সালের বিপ্লব:

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকরা সন্ত্রাস ও অসন্তোষের মাধ্যমে তৎকালীন সম্রাট নিকোলাস II-এর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এর ফলস্বরূপ কিছু সীমিত সাংবিধানিক সংস্কার আসে, কিন্তু ক্ষমতার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব:

সম্রাটের পতন ঘটে। প্রভূত অসন্তোষ ও খাদ্য সংকটের কারণে শ্রমিক ও সেনারা বিদ্রোহ শুরু করে। ১৯১৭ সালের ৮ মার্চে শ্রমিক, আমজনতা আর কৃষকেরা রাস্তায় নেমে এসে দখল নেয় পেত্রোগ্রাদ। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সেনাপতি ইভানভ অনেক কষ্টে পেত্রোগ্রাদ দখল করতে সক্ষম হন। তবে জনগণের দাবির মুখে জার এবং তাঁর অত্যাচারী মন্ত্রী প্লিভি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এভাবেই প্রাচীন রোমানভ রাজবংশের অবসানে রুশ বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। পার্লামেন্টারি সরকারের (Provisional Government) সৃষ্টি হয়। একটি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির সরকার গঠিত হয়

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব:

বোলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে সরকার দখল করে। তারা ‘শ্রমিক ও কৃষক শাসিত রাষ্ট্র’ বা প্রলেতারিয়াতের সরকার প্রতিষ্ঠা করে। প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিক নীতি শুরু হয়: জমি জাতীয়করণ, ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ন।

• ফলাফল এবং প্রভাব

এ প্রসঙ্গে প্রধান কারণ, প্রক্রিয়া এবং ঘটনাগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায় নিচের মতো:

বোলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে সরকার দখল করে। তারা ‘শ্রমিক ও কৃষক শাসিত রাষ্ট্র’ বা প্রলেতারিয়াতের সরকার প্রতিষ্ঠা করে। প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিক নীতি শুরু হয়: জমি জাতীয়করণ, ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ন।

৪. ফলাফল এবং প্রভাব

রাশিয়ায় সোশালিজমের উত্থান নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা আনে। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘমেয়াদে এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের (USSR) সৃষ্টি এবং বিশ্ব রাজনীতিতে বামপন্থার শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে।

রাশিয়ায় সোসালিজমের উত্থান: টাইমলাইন

১. ১৮৬১ – সারের নিপীড়ন শেষ, কৃষক স্বাধীনতা সারমুক্তি আইন (Emancipation of Serfs) দ্বারা কৃষকরা কিছুটা স্বাধীন হয়। কৃষকরা অর্থনৈতিক দিক থেকে এখনও দুর্বল ছিল।
 ২. ১৮৮০-১৯০০ – শিল্পায়ন ও শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান রাশিয়ায় শিল্পায়ন শুরু। শহরে শ্রমিকদের জীবন সংকটাপন্ন। শ্রমিক আন্দোলন ও প্রাথমিক শ্রম ইউনিয়ন সৃষ্টি।
 ৩. ১৯০৫ – প্রথম রাশিয়ান বিপ্লব শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক বিদ্রোহ। সম্রাট নিকোলাস II কিছু সীমিত সাংবিধানিক সংস্কার করতে বাধ্য হন। বোলশেভিকস এবং মেনশেভিকস আন্দোলন তীব্র।
 ৪. ১৯১৭ (ফেব্রুয়ারি) – ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সম্রাট পতিত। Provisional Government (অস্থায়ী সরকার) গঠন। সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক আশা বৃদ্ধি।
 ৫. ১৯১৭ (অক্টোবর) – অক্টোবর বিপ্লব বোলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল। প্রথম প্রলেতারিয়াত সরকার প্রতিষ্ঠিত। সমাজতান্ত্রিক নীতি: জমি, ব্যাংক এবং শিল্পজাত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ন।
 ৬. ১৯২২ – সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি রাশিয়ার ভেতরে এবং আশেপাশের অঞ্চলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি। বিশ্ব রাজনীতিতে বামপন্থার প্রভাব।
- অক্টোবর বিপ্লব: রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব (October Revolution) হলো ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লব, যা বোলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সংঘটিত হয় এবং রাশিয়ার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মোড়। এটি ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর ঘটে, যেখানে রাশিয়ার সম্রাট নিখিলন বাদ পড়ে এবং প্রাথমিকভাবে প্রভিনশিয়াল সরকার (Provisional Government) ক্ষমতায় আসে। কিন্তু এই সরকার দুর্বল ও অস্থিতিশীল ছিল।

ঘটনাপ্রবাহ ও কারণসমূহ:

পেছনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট:

- রাশিয়ার সেমিটিক তন্ত্র (Tsarist Regime) দীর্ঘ সময় ধরে জনসাধারণের কাছে অচল ছিল।
- শ্রমিক ও সৈন্যদের অসন্তুষ্টি, দারিদ্র্য ও খাদ্য সংকট বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব:
- ফেব্রুয়ারিতে সম্রাট নিকোলাস II রাজ্যের ত্রাসের কারণে পদত্যাগ করেন।
- প্রভিনশিয়াল সরকার ক্ষমতা নেয়, কিন্তু ওরা দেশের সমস্যাগুলো সমাধান করতে ব্যর্থ হয়।
- বোলশেভিকদের পরিকল্পনা:
- বোলশেভিক পার্টি, ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে, শ্রমিক ও সৈন্যদের মধ্যে সমর্থন জোগায়।
- তাদের মূল স্লোগান: “শান্তি, মাটি, এবং রুটি”।
- অক্টোবর ১৯১৭-এর বিপ্লব:
- অক্টোবরের (জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে ২৫ অক্টোবর, গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারে ৭ নভেম্বর) রাতে বোলশেভিকরা প্রভিনশিয়াল সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে।
- প্রধান লক্ষ্য ছিল পেট্রোগ্রাদে (বর্তমান সেন্ট পিটার্সবার্গ) সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো দখল করা।
- সেনারা বোলশেভিকদের সাথে যুক্ত হয় এবং প্রভিনশিয়াল সরকার পতন হয়।

ফলাফল:

- বোলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করে এবং সোভিয়েত সরকার গঠন করে।
- লেনিন নতুন সরকারের প্রধান হন।
- পরবর্তীতে, রাশিয়ায় সিভিল ওয়ার (Russian Civil War) শুরু হয়, যা ১৯২২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শেষ হয়।
- রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব টাইমলাইন (১৯১৭)
- ফেব্রুয়ারি – অক্টোবর ১৯১৭
- ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ (ফেব্রুয়ারি বিপ্লব)
- সম্রাট নিকোলাস II রাজ্য ত্যাগ করেন।

- প্রভিনশিয়াল সরকার (Provisional Government) ক্ষমতায় আসে।
- দেশীয় সমস্যা (যুদ্ধ, দারিদ্র্য, খাদ্য সংকট) সমাধান করতে ব্যর্থ।
- এপ্রিল ১৯১৭
- ভ্লাদিমির লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় ফিরে আসেন।
- বোলশেভিক পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা: ‘শান্তি, মাটি, রুটি’।
- জুলাই ১৯১৭
- শ্রমিক ও সৈন্যদের বিক্ষোভ শুরু।
- বোলশেভিকরা পেট্রোগ্রাডে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়।
- সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
- সেপ্টেম্বর ১৯১৭
- বোলশেভিকদের সমর্থন বৃদ্ধি পায়।
- লেনিন দাবি করেন: ‘শান্তিপূর্ণভাবে নয়, এখনই সশস্ত্র বিপ্লব’।
- অক্টোবর ২৪-২৫, ১৯১৭
- বোলশেভিকরা পেট্রোগ্রাডে সরকারী স্থাপনাগুলো দখল করে।

প্রভিনশিয়াল সরকার পতিত হয়। অক্টোবর ২৬, ১৯১৭ সোভিয়েত কংগ্রেসে নতুন সরকার ঘোষণা হয়। ভ্লাদিমির লেনিন নতুন সরকারের প্রধান হন। পরবর্তী সময় ১৯১৮-১৯২২: রাশিয়ায় সিভিল ওয়ার। ১৯২২: সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে এবং একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জোসেফ ভিসারিওনোভিচ স্ট্যালিন (১৮৭৯-১৯৫৩) দীর্ঘতম সাফল্যের ইতিহাস রচনা করে গেলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপ তথা বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে তিনিই সম্ভবত সবচে’ শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকৃত নাম ইউসিফ ভিসারিওনোভিচ সোসো, স্ট্যালিন নামটি তিনি ১৯১০ সালে ‘লৌহমানব’ অর্থে ধারণ করেন। জার শাসনামলের শেষভাগে (১৯০৫-১৭) স্ট্যালিন ছিলেন লেনিনের রাজনৈতিক অনুসারী মাত্র। তিনি সব সময়েই কমিউনিষ্ট পার্টির বলশেভিক অংশের সমর্থক ছিলেন। লেনিনের অনুরোধক্রমে ১৯১৩ সালে তিনি ভিয়েনায় অবস্থানকালে ‘মার্কসিজম এন্ড দ্য ন্যাশনালিটি কোন্সেন’ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার আগেই স্ট্যালিনকে সাইবেরিয়া নির্বাসনে যেতে হয়। ১৯১৭ সালে মার্চ বিপ্লবের পর স্ট্যালিন পেট্রোগ্রাডে ফিরে আসেন এবং প্রাভদা পত্রিকার সম্পাদনা কাজ হাতে নেন। অক্টোবর বিপ্লবের সময় স্ট্যালিন পেট্রোগ্রাডে ফিরে আসেন এবং প্রাভদা পত্রিকার সম্পাদনার কাজ হাতে নেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর স্ট্যালিন পেট্রোগ্রাডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং লেনিন সরকারের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসংক্রান্ত কমিশন নিযুক্ত হন। জাতীয়তাবাদ বিষয়ের একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসেবে লেনিন তাঁকে উক্ত বিষয়ে প্রধান কমিশনারের দায়িত্ব দেন। লেনিনের মৃত্যুর আগে স্ট্যালিনের ব্যক্তিত্বে কিছু সমস্যা প্রত্যক্ষ করে লেনিন তাঁকে ‘রাজনৈতিক আপদ’ হিসেবে বর্ণনা করেন। লেনিন তাঁর রাজনৈতিক মূল্যায়নে স্ট্যালিনের প্রতি কিছুটা সন্দেহান্বিত হয়েছিলেন যে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি যথার্থভাবে তাঁর দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন কি-না। তিনি স্ট্যালিনকে একবার ‘বদমেজাজী’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁর অপসারণ চেয়েছিলেন। স্ট্যালিনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল যে তিনি জিনোভিয়েভ ও কামেনভের সহায়তায় লেনিনের তৎপরতাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এতে লেনিনের পছন্দসই উত্তরসূরী ট্রটস্কির সাথে স্ট্যালিনের দ্বন্দ্ব চরমে উঠে।

১৯২৮ সাল থেকে স্ট্যালিন ‘এক দেশ ভিত্তিক সমাজতন্ত্র’ নীতিমালা গ্রহণ করেন। এ সময় মার্কসীয় ধারার বিশ্ব সাম্যবাদী বিপ্লবের পরিবর্তে শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন তিনি। স্ট্যালিন উদ্ভাবিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই কর্মসূচী ছিল লেনিন ও ট্রটস্কি প্রচলিত ‘স্থায়ী বিপ্লব’ নীতির পরিপন্থী। তাঁর এই একটি দেশে এককভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকালে কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিলে স্ট্যালিন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন এবং সার্বিয়া অঞ্চলে কৃষি কার্যক্রম স্বয়ং তদারকি করেন। ১৯২৯ সালের শেষভাগে কৃষিতে তিনি ‘যৌথ খামার ব্যবস্থা চালু করলে লক্ষ লক্ষ কৃষক স্থানান্তরিত হয় এবং হাজার হাজার কৃষক মৃত্যুবরণ করে। ১৯৩০ এর দশকে স্ট্যালিন শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচারণায় নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে সফল হন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চাৎপদ রিপাবলিকসমূহ শিল্পের শক্তি হিসেবে বিকশিত হয়।

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের স্ট্যালিন তাঁর শাসনের পক্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচারণা ও শক্তি প্রয়োগ শুরু করেন। রাজনৈতিক নিপীড়ন, ধর-পাকড়, উচ্ছেদ ইত্যাদির ফলে বহু পরিবার ভীতিকর পরিস্থিতির শিকার হয়। স্ট্যালিন তাঁর ইতিপূর্বকার রাজনৈতিক

প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেককেই রাষ্ট্র বিরোধী আখ্যায়িত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে স্ট্যালিন স্বয়ং নাৎসী জার্মানীর অগ্রাভিযানের মুখে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। দেশের পক্ষে দাঁড়িয়ে মহান মানবিক তাগ স্বীকারের মাধ্যমে স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে তিনি জার্মান বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হন।

স্ট্যালিন ১৯৪৩ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত মিত্র শক্তির সভায় যোগদান করেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অ-সমাজতন্ত্রী মিত্রদের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ কমিনটার্ণ (কমিনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল) ভেঙ্গে দেন। ১৯৪৫ সালে ইয়াল্টা এবং পোস্টডাম সভায় যোগদানের মাধ্যমে স্ট্যালিন পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারের স্বীকৃতি আদায় করেন।

হিটলারের উত্থান

মুসোলিনির উত্থান

হিটলারের উত্থান

- ১৮৮৯ – জন্ম ও প্রারম্ভিক জীবন
- জন্ম: ব্রাউনউ-অ্যাম-ইন, অস্ট্রিয়া।
- শৈশব: পরিবারে চাপ ও কঠোর অভ্যর্থনা। স্কুলে অসন্তুষ্ট, চিত্রশিল্পের প্রতি আগ্রহ।
- ব্যক্তিত্ব: আত্মবিশ্বাসী, লক্ষ্যনিষ্ঠ, কিন্তু অল্প শিক্ষিত।
- ১৯১৪-১৯১৮ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
- হিটলার জার্মান সেনা হিসেবে অংশগ্রহণ।
- যুদ্ধশেষে জার্মানি হেরে যায়।
- ব্যক্তিগতভাবে হতাশ, জাতীয় অভিমান ও প্রতিশোধের মনোভাব তৈরি হয়।
- ১৯১৯ – রাজনৈতিক জীবন শুরু
- যোগদান: ড্যাচ ন্যাশনাল সোশালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি।
- কার্যক্রম: ছোট সংগঠনের মধ্যে সক্রিয়।
- ভার্সাই চুক্তির বিরোধিতা – জার্মানির অর্থনৈতিক ও সামরিক দুরবস্থা হিটলারের বক্তৃতায় ব্যবহার।
- ১৯২৩ – মিউনিখ পুংচ
- উদ্দেশ্য: বাভারিয়ান সরকার গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে উৎখাত।
- ফলাফল: ব্যর্থতা, হিটলারকে কারাগারে পাঠানো।
- প্রভাব: প্রথমবার রাজনৈতিক পরিচিতি এবং আত্মবিশ্বাসী নেতা হিসেবে প্রকাশ।
- ১৯২৪ – “Mein Kampf”
- লেখা: কারাগারে থাকাকালীন।
- বিষয়বস্তু:
- জার্মান জাতীয়তাবাদ
- ইহুদী বিদ্বেষ
- Lebensraum (আবাসনের সম্প্রসারণের তত্ত্ব)
- রাজনৈতিক কৌশল ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা
- ১৯২৫-১৯২৯ – রাজনৈতিক পুনর্গঠন
- শান্তিপূর্ণ রাজনীতির দিকে মনোনিবেশ।
- পরিষ্কার চিহ্নিত উদ্দেশ্য: পার্লামেন্টের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন।
- প্রচার কৌশল: জনসভা, পোস্টার, পত্রিকা।
- ১৯২৯-১৯৩২ – অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ
- গ্রেট ডিপ্রেসন: ব্যর্থতা, বেকারত্ব, সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি।

- হিটলার জনগণের হতাশাকে কাজে লাগান।
- নির্বাচনে পার্টির অগ্রগতি:
- ১৯৩০: রিচস্ট্যাগ নির্বাচনে ১৮% ভোট
- ১৯৩২: ৩৭% ভোট, রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি
- ১৯৩৩ – ক্ষমতায় ওঠা
- জানুয়ারি ৩০: চ্যান্সেলর হন।
- ফেব্রুয়ারি: রিচস্ট্যাগ অগ্নিসংযোগ – বিরোধীদের দমন।
- মার্চ: Enabling Act – আইনিভাবে একক ক্ষমতা।
- ১৯৩৪ – শক্তি সুনিশ্চিত করা
- নাইট অফ দ্য লং নাইফস: SA (শাহ দল) নেতৃত্বদ হত্যা।
- প্রভাব: সেনা ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ন্ত্রণ।
- ১৯৩৫-১৯৩৯ – প্রস্তুতি ও সম্প্রসারণ
- সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, নাইটজ নীতি বাস্তবায়ন।
- জাতিগত নিপীড়ন শুরু – ইহুদীদের বিরুদ্ধে আইন এবং বঞ্চনা।
- বিশ্বযুদ্ধের পথে প্রস্তুতি।
- গভীর বিশ্লেষণ
- অর্থনৈতিক দিক: দুর্দশা, বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি জনগণকে রাজনীতিতে সক্রিয় করে।
- সামাজিক দিক: জাতীয়তাবাদ, জাতিগত বৈষম্য এবং সংস্কৃতির অভিমান।
- রাজনৈতিক কৌশল:
- জনমত প্রভাবিত করা
- বিরোধীদের দমন
- আইনি শক্তি বৃদ্ধি
- ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য: বলিষ্ঠ বক্তৃতা, কৌশলগত চতুরতা, ভয়ঙ্কর গণপ্রভাব।

মুসোলিনির উত্থান – গভীর বিশ্লেষণ

১. প্রারম্ভিক জীবন

জন্ম: ২৯ জুলাই ১৮৮৩, প্রোভিন্সিয়া প্রিমাভেরা, ইতালি।

পরিবার: মধ্যবিত্ত, বাবা স্কুল শিক্ষক, মা নরমমনা।

শিশু ও কিশোর জীবন: কঠোর শৃঙ্খলা, বিদ্রোহী মনোভাব, প্রাথমিক শিক্ষায় ভাল ফলাফল।

প্রাথমিক পেশা: শিক্ষক ও সাংবাদিক। এই সময় তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শে আগ্রহী হন।

২. রাজনৈতিক প্রারম্ভিক জীবন

প্রাথমিকভাবে: সোশালিস্ট পার্টির সদস্য। শ্রমিক ও শ্রম আইন নিয়ে কাজ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়: যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ; যুদ্ধ শেষে “মৃত্যুভূমি” (Vittorio Veneto–Italy’s perceived betrayal) নিয়ে অসন্তুষ্ট।

যুদ্ধ পরবর্তী হতাশা: অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, সামাজিক অস্থিরতা।

৩. ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা

১৯১৯: ফ্যাসিও দি কম্বাটিমেন্তো (Fasci di Combattimento) প্রতিষ্ঠা।

লক্ষ্য:

রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা

বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিহত করা

জাতীয়তাবাদী প্রেরণা তৈরি করা

সমর্থক: যুদ্ধজঙ্গী যুবক, ক্ষতিগ্রস্ত মধ্যবিত্ত, অসন্তুষ্ট নাগরিক।

রাজনৈতিক হাতিয়ার: ব্ল্যাকশার্টরা (Blackshirts) – সহিংসতা ও ভয়-ভীতি।

৪. সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

যুদ্ধপরবর্তী ইতালি:

বেকারত্ব বৃদ্ধি

মুদ্রাস্ফীতি ও দুর্ভিক্ষ

কৃষক ও শ্রমিক অসন্তোষ

জনগণ অস্থিতিশীল, বিপ্লবের আশঙ্কা

মুসোলিনি এই পরিস্থিতি কাজে লাগান এবং “শান্তি ও অর্ডার” প্রতিশ্রুতি দেন।

৫. রাজনৈতিক কৌশল

গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ: সংবাদপত্র ও প্রচার

ব্ল্যাকশার্টদের সহিংসতা

প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতাবাদী ও কমিউনিস্টদের দমন

রাজা এবং পার্লামেন্টের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক

৬. ক্ষমতায় ওঠা

১৯২২: মার্চ অন রোম (March on Rome)

হাজার হাজার ব্ল্যাকশার্ট রোমে ঢুকে হুমকি

রাজা ভিক্টর এমানুয়েল III বাধ্য হয়ে মুসোলিনিকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত

রাজনৈতিক ম্যানিপুলেশন এবং ভয়-ভীতি কৌশল দ্বারা ক্ষমতা নিশ্চিত।

৭. ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা

বিরোধীদের দমন

একনায়কতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন

গণমাধ্যম ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব আদেশে অভিযোজিত করা

৮. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি

অভ্যন্তরীণ:

শিল্প ও অর্থনীতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে

শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য

শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন নিয়ন্ত্রণ

বৈদেশিক:

সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ (ইথিওপিয়া আক্রমণ, আলবেনিয়ার নিয়ন্ত্রণ)

জার্মানির সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি, যুদ্ধ প্রস্তুতি

৯. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পতন

১৯৪০: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ

১৯৪৩: মিত্রশক্তি আগমন, রাজা কর্তৃক ক্ষমতা হারানো

জার্মানির সাহায্যে সাময়িকভাবে ক্ষমতা ফিরে পেলেও ১৯৪৫ সালে হত্যা

১০. গভীর বিশ্লেষণ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব:

যুদ্ধ পরবর্তী দুর্দশা, বেকারত্ব, খাদ্য সংকট।

রাজনৈতিক কৌশল:

সহিংসতা, প্রচার, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, বিরোধীদের দমন।

জাতীয়তাবাদ ও একনায়কতন্ত্র:

রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হ্রাস।

সাম্রাজ্যবাদ:

বিদেশে আক্রমণ এবং সামরিক সম্প্রসারণ।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য:

কৌশলগত চতুরতা, রাজনৈতিক হীনতা, ভয়-ভীতি ব্যবহার।

হিটলার ও মুসোলিনির তুলনামূলক আলোচনা:

উভয় নেতা যুদ্ধ পরবর্তী অস্থিতিশীলতাকে কাজে লাগিয়েছেন।

উভয়ই জাতীয়তাবাদী ও একনায়কতান্ত্রিক শক্তি গড়ে তুলেছেন।

প্রধান পার্থক্য: হিটলার নির্বাচনী ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করলেও, মুসোলিনি সরাসরি হুমকি ও রাজা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৩০ এর গোড়া থেকেই ইউরোপ ও এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৩১ এর সেপ্টেম্বরে চীনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে জাপান লিগ অব নেশনসের মর্যাদায় আঘাত হানে। জাপানের এই অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কার্যত কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি লিগ অব নেশনস। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে ভুল করলো না ইতালি ও জার্মানি। তারা বুঝতে পেরেছিল, আগ্রাসনের বিপরীতে লিগ অব নেশনস অসহায়। এমনকি ইউরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গ ব্রিটেন ও ফ্রান্সেরও অক্ষমতা প্রকাশ পায় এই ঘটনায়। দূর প্রাচ্যে আগ্রাসন নীতি প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্রও বিশেষ উদ্যোগ নিলো না।

আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রেও লিগ অব নেশনস চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখায়। ১৯৩৩ সালে জাপান ও জার্মানি লিগ অব নেশনস থেকে বেরিয়ে যায়। জার্মানির বেরিয়ে যাওয়া নিরস্ত্রীকরণের শেষ আশাটুকুও শেষ করে দেয়। এদিকে ১৯৩৫ সাল থেকেই ১ম বিশ্বযুদ্ধে চাপানো ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘন করে হিটলার সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেন। ওদিকে ১৯৩৬ সালে ইতালির মুসোলিনি ইথিওপিয়া দখল করে নেন। এই আগ্রাসনে নিহত হয় ৫ লক্ষ ইথিওপিয়ান। ইথিওপিয়ার দখলে হিটলার মুসোলিনিকে পূর্ণ সমর্থন ও মদদ দেন।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিপরীতে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে থাকেন দুই স্বৈরশাসক। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আরও কাছাকাছি আসেন এই দুই নেতা। স্পেনের গৃহযুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ছিল। সামরিক অভ্যুত্থান ও তার বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের প্রতিরোধ স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। মুসোলিনি ও হিটলার উভয়ের কাছেই স্পেনের গৃহযুদ্ধ ছিল কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সংঘাত। আর তাই তারা যেকোনো মূল্যে স্পেনের সামরিক অভ্যুত্থানকারীদের জয় চেয়েছিলেন। ১৯৩৯ এর জানুয়ারিতে বার্সেলোনার পতন হলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন সামরিক ফ্যাসিস্ট সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। অ্যালান বুলক, এলিজাবেথ উইস্কেম্যান প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে হিটলার তার রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়েই একটি বিশ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাদের বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে তারা ১৯২০ এর দশকের শেষের দিকে গৃহীত নাৎসি কর্মসূচিসমূহ ও ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হিটলারের আত্মজীবনী 'Mein Kampf' এর উপর গুরুত্বারোপ করেন। তার আত্মজীবনীতে ও ১৮২৮-২৯ সালের নাৎসি কর্মসূচি সংক্রান্ত দলিলগুলোতে স্পষ্টত বলা ছিলো, বর্ধিত জার্মান জনসংখ্যার স্থান সংকুলান ও বাসস্থানের জন্য জার্মানিকে একটি আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে এবং এই আগ্রাসন হবে অবশ্যই প্রাচ্যমুখী। কাজেই ২য় বিশ্বযুদ্ধ ছিল হিটলারের অভিপ্রেত ও পূর্বপরিকল্পিত।

অপরদিকে ঐতিহাসিক জে. পি. টেইলর মনে করেন, ব্যাপারটি হিটলারের পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না। টেইলর মনে করেন, হিটলার ঘটনার জন্য অপেক্ষা করার এক অভিনব কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন, আর পশ্চিমের শক্তিগুলো একের পর এক হিটলারের সামনে সুযোগ উন্মুক্ত করেছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে ১ম বিশ্বযুদ্ধের ভয়ানক অভিজ্ঞতা তখনও আতঙ্কিত করে রেখেছিল। তাই তারা হিটলারের বিরুদ্ধে কোনো কড়া পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী ছিল না। ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলোর প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে নীতি গ্রহণ করেছিল, তা ইতিহাসে তোষণ নীতি নামে পরিচিত। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নেতারা মনে করতেন ভার্সাই চুক্তি দ্বারা জার্মানির উপর চরম অন্যায় করা হয়েছিল, হিটলারের ভার্সাই চুক্তির ধারাবাহিক লঙ্ঘন ছিল সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ মাত্র। এই তোষণ নীতিই পরবর্তীতে ২য় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করতে সহায়ক হয়।

হিটলারের আগ্রাসন নীতি চলতে থাকে। ১৯৩৮ এর গোড়ার দিকে অস্ট্রিয়ার নাৎসিবাদীদের আইনী স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর শ্বসনিগের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। শ্বসনিগ জানান, একটি গণভোটের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে। হিটলার তৎক্ষণাৎ জার্মান বাহিনীকে অস্ট্রিয়া আক্রমণের নির্দেশ দেন। অস্ট্রিয়া জার্মান নাগরিকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে ও চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে জার্মান বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে- এই দুটি অজুহাত দাঁড় করানো হয়। ১৯৩৮ সালের ১২ মার্চ জার্মান সেনাদল অস্ট্রিয়া দখল করে নেয়। হিটলার কর্তৃক জার্মানির সাথে অস্ট্রিয়ার এই সংযুক্তিকরণকে ‘আনশ্লুস’ (Anschluss) বলা হয়। নাৎসিরা অস্ট্রিয়ান ইহুদীদের উপর চরম অত্যাচার চালায়। এরপর ১৯৩৮ সালেই হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড বেনেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক প্রচারণা চালাতে থাকে। তার প্রধান অভিযোগ ছিল, চেকোস্লোভাকিয়ার সরকার সুদেতান অঞ্চলে বাসরত জার্মানদের সুরক্ষিত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। হিটলার সরাসরি সুদেতান অঞ্চল দাবি করে বসেন। বেনেস ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু তোষণ নীতির কারণে দুটি দেশই সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু এই তোষণ নীতি শেষমেশ শান্তি নিয়ে আসতে পারেনি।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে তোষণ নীতির অবসান ঘটে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স যৌথ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মানির বিরুদ্ধে। ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানির বিরুদ্ধে। শুরু হয়ে যায় ২য় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মান আক্রমণের মুখে পতন হয় পোল্যান্ডের। এদিকে প্রতিরোধ গড়ে তোলে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৭ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজ দখল করে নেয় পূর্ব পোল্যান্ড। সেপ্টেম্বর মাসেই হিটলার ফ্রান্স আক্রমণের ঘোষণা দেন। তবে সেটি পরে ১৯৪০ এর বসন্তকাল পর্যন্ত পেছানো হয়। ১৯৪০ এর ১০ মে পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জার্মানি ফ্রান্সের উপর আক্রমণ শুরু করে ও তাদের আক্রমণের মুখে ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ১৫ মে নেদারল্যান্ড ও ২৮ মে বেলজিয়াম জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করে। জার্মানির আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে ফ্রান্স রাজধানী প্যারিস থেকে বর্দোতে স্থানান্তরিত করে। ১৪ জুন প্যারিসের পতন ঘটে।

১৯৪০ সালের ১০ মে উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। একই বছর ৩১ জুলাই জার্মানি ব্রিটেনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে। ওদিকে ইতালিও একের পর এক ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলগুলো আক্রমণ করে দখল করতে শুরু করে। ১৯৪১ সালের ২২ জুন রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে বসে। ডিসেম্বরের মধ্যেই ইউক্রেনের একটি বিরাট অংশসহ প্রায় অর্ধ মিলিয়ন বর্গ মাইল সোভিয়েত ভূখণ্ড জার্মানির অধীনে চলে যায়। এরপর এক দ্রুত পরিবর্তন আসে আন্তর্জাতিক মহলে। গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র একটি অক্ষমুক্তি বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তেল রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ১৯৪১ এর ৭ ডিসেম্বর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারে মার্কিন নৌবহরের উপর জাপান হামলা চালায়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রও ২য় বিশ্বযুদ্ধ জড়িয়ে পড়ে। এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে ২য় বিশ্বযুদ্ধের আগুন।

কারণ:

ভার্সাই চুক্তি: ভার্সাই চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানির উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে, এটিকে সংঘাতের জন্য দায়বদ্ধ করে, এটিকে ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হয় এবং এর সামরিক শক্তি হ্রাস করে। জার্মানিতে, এই অপমান অতি-জাতীয়তাবাদের ইন্ধন হিসেবে কাজ করেছিল। ফ্যাসিবাদের বৃদ্ধি: কার্যকর সরকার এবং কমিউনিজম থেকে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ফ্যাসিবাদী বিশ্বাসগুলি ১৯২০-এর দশকে আকর্ষণ লাভ করেছিল, যা ইতালিকে বেনিটো মুসোলিনির মতো নেতাদের আরোহণ দেখতে সাহায্য করেছিল। নাৎসিবাদের বৃদ্ধি: বর্ণবাদ, ভার্সাই চুক্তি বাতিল এবং জার্মান ভূখণ্ডের বৃদ্ধি সবই অ্যাডলফ হিটলারের নাৎসি পার্টি দ্বারা সমর্থিত ছিল। ১৯৩৩ সালে, হিটলার জার্মান চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

তুষ্টি নীতি: যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের মতো পশ্চিমা দেশগুলি তুষ্টি করার চেষ্টা করেছিল, হিটলারের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপগুলিকে অনিয়ন্ত্রিত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। ১৯৩৪ মিউনিখ চুক্তি এই পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে কাজ করে।

লিগ অফ নেশনস এর ব্যর্থতা: লিগ অফ নেশনস যুদ্ধ এড়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এটি করতে অক্ষম ছিল কারণ সমস্ত জাতি যোগ দেয়নি এবং আগ্রাসনের অবসান ঘটাতে সামরিক শক্তির অভাব ছিল।

১৯২৯ গ্রেট ডিপ্রেশন: ১৯৩০ এর দশকে ইউরোপ এবং এশিয়ায় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ফলে সর্বগ্রাসী এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থানান্তরিত হয়, বিশেষ করে জার্মানি, ইতালি এবং স্পেনে।

ফলাফল:

জাতিসংঘ: ভবিষ্যতের শত্রুতা এড়ানোর লক্ষ্যে, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সহযোগিতা করে এমন একটি ক্লাবের মতো। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য যুদ্ধ প্রতিরোধ এবং শান্তি অগ্রসর করা।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি: যুদ্ধের জরুরীতা প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে। কম্পিউটার, জেট ইঞ্জিন এবং পারমাণবিক শক্তির মতো উদ্ভাবনের উদ্ভবের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

স্নায়ুযুদ্ধ: দুই পরাশক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি সময়কাল শুরু করেছিল যা ঠান্ডা যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে যাওয়ার পরিবর্তে, তারা বহু বছর ধরে বিশ্ব রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এমন একটি মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিল।

ধ্বংস: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। শহরগুলি তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যা হারিয়ে গেছে তা পুনর্গঠন করা সম্প্রদায়গুলিকে গুরুতর মানসিক এবং শারীরিক দাগ দিয়ে ফেলেছে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবন: যুদ্ধে লাখ লাখ প্রাণ হারিয়েছিল। যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের নিরীহ নাগরিক এবং সৈন্যদের প্রাণহানি ঘটেছে। পরিবারগুলি ভেঙ্গে পড়েছিল, এবং বিশ্ব সম্প্রদায় জীবনের বিস্ময়কর ক্ষতির জন্য শোক প্রকাশ করেছিল।

হলোকাস্ট: ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অধ্যায় ছিল হলোকাস্ট। অ্যাডলফ হিটলারের ন্যাসি শাসনের সময় প্রায় 6 মিলিয়ন ইহুদিকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পদ্ধতিগতভাবে হত্যা করা হয়েছিল। মানব বর্বরতার ভয়াবহতা এখনও এই হলোকাস্টের দ্বারা স্পষ্টভাবে আলোকিত করা হয়েছে।

গ্লোবাল শিফটস: যুদ্ধের কারণে পৃথিবীর মানচিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল। পুরানো সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে নতুন জাতি গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ :

পরোক্ষ কারণ :

(ক) অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি :

(খ) উগ্র জাতীয়তাবাদ :

(গ) অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ :

(ঘ) ঔপনিবেশিক তৎপরতা :

(ঙ) ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের তোষণ নীতি :

(চ) নিরস্ত্রীকরণ ব্যর্থতা :

(ছ) জাতিসংঘের ব্যর্থতা :

(জ) পরস্পরবিরোধী শক্তিজোট গঠন :

(ঝ) একনায়ক তন্ত্রের উত্থান :

(২) প্রত্যক্ষ কারণ :

হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণ :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল :

(ক) পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিকাশ :

(খ) অক্ষশক্তির প্রাধান্য হ্রাস :

(গ) ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পতন :

(ঘ) পরমাণু যুগের সূচনা :

(ঙ) তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব :

(চ) ঠান্ডা লড়াইয়ে সূচনা :

(ছ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা :

(জ) জাতীয়তাবাদের বিকাশ

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মায় নিহত সৈনিকদের দু'টি সমাধিক্ষেত্র রয়েছে বাংলাদেশের কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে। ইয়াল্টা সম্মেলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব কোন্ আর্থিক ও রাজনৈতিক নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে তা যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তি (আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স) বিভিন্ন কূটনৈতিক সম্মেলনে তা স্থির করার চেষ্টা করে। এই ধরনের একটি কূটনৈতিক সম্মেলন হল ইয়াল্টা সম্মেলন। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান স্ট্যালিন ক্রিমিয়ার ইয়াল্টায় এই উদ্দেশ্যে মিলিত হন। এদের মধ্যে এই সম্মেলনটি 'ইয়াল্টা সম্মেলন' নামে খ্যাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

জার্মানী পরাজিত হলে ইয়াল্টা সম্মেলনে স্থির হয় মিত্রশক্তি জার্মানীকে চার ভাগে ভাগ করবে। বার্লিন হবে যৌথ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো একটি যৌথ স্থায়ী আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠিত হবে বলে এই সম্মেলনেই স্থির হয়। সোভিয়েতের নিরাপত্তার জন্য পোল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে একটি 'বাফার' অঞ্চল করা হবে বলে স্থির হয়। পোল্যান্ডে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হবে। একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হবে। সোভিয়েত পারে ওয়ারশসহ পোল্যান্ডের পূর্বাংশ। এছাড়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য রাশিয়া পায় পোর্ট আর্থার, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী ক্রমেই জার্মানীর শক্তি ধ্বংস করে পূর্ব ইউরোপের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ভোটের সাহায্যে নির্বাচিত সরকার গঠনের প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করে তারা ক্রমেই কমিউনিস্ট শাসন চাপিয়ে দিতে থাকে। ফলে তারা পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে আস্থা হারায়। সেহেতু সম্মেলনে স্থির হয় যে, বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি নিয়ে গঠিত হবে রাষ্ট্রপুঞ্জ তার জন্য একটি নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হবে বলে স্থির হয়। এই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসাবে সোভিয়েত, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন ও চীনের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে। ব্রিটিশ ও সোভিয়েতের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়া রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপুঞ্জের ভোটাধিকার পাবে। স্টালিন এই ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের বিপক্ষে ছিলেন। তবে বিশ্বের কথা চিন্তা করে তিনি তাঁর পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে স্বাক্ষর দানের জন্য বিশ্ব সম্মেলনে জাতিপুঞ্জের সদর-এ পাঠান। রুজভেল্ট এতে আশাবাদী ছিলেন। এতে তাঁর মনে হয়েছিল এই সংগঠনের দ্বারা শক্তিজোট ও সাম্য রাজনীতির প্রভাব থেকে বিশ্বকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

১৯৪৫খ্রীঃ-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি ইয়াল্টা সম্মেলন শেষ হয়। ইয়াল্টা সম্মেলন কেন ডাকা হয়?

ইয়াল্টা সম্মেলন ডাকার উদ্দেশ্যগুলি ছিল-

- (১) জার্মানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা।
- (২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের মানচিত্রের পুনর্গঠন করা।
- (৩) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরী করা।
- (৪) পোল্যান্ডের সমস্যার সমাধান করা প্রভৃতি।

ইয়াল্টা সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলির নাম কী?

এই সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রগুলি হল- মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, রুশ রাষ্ট্রপতি স্ট্যালিন।

পটসডাম সম্মেলন

পটসডাম সম্মেলন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মিত্রশক্তির শীর্ষ সম্মেলন, যা ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত জার্মানির পটসডামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান, সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন, এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল (পরে ক্লিमेंট অ্যাটলি স্থলাভিষিক্ত হন) যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণ এবং জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধান বিষয় ও ফলাফল

জার্মানির বিভাজন ও পুনর্গঠন:

জার্মানীকে চারটি দখলকৃত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং এর রাজধানী বার্লিনকেও চার ভাগ করা হয়।

যুদ্ধোত্তর শান্তি পরিকল্পনা:

১৯১৯ সালের প্যারিস শান্তি সম্মেলনের ভুলগুলি এড়িয়ে যুদ্ধোত্তর শান্তি পরিকল্পনা করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জার্মানির ক্ষতিপূরণ:

হিটলারের আক্রমণের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে জার্মানির কাছ থেকে বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য স্ট্যালিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

পটসডাম ঘোষণা:

এই সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় ২৬ জুলাই, ১৯৪৫ সালে পটসডাম ঘোষণা জারি করা হয়, যেখানে জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন:

সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন।

যুক্তরাজ্য:

প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, যিনি পরবর্তীতে ক্রিমেন্ট অ্যাটলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হন।

তাৎপর্য

এই সম্মেলন ছিল; বিগ থ্রিজোটের নেতাদের মধ্যে শেষ যুদ্ধকালীন শীর্ষ সম্মেলন। এটি স্নায়ুযুদ্ধের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়, যা পরবর্তীতে ইউরোপের বিভাজনের পথ খুলে দেয়।

জাতিসংঘ গঠন

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কেড়ে নেয় প্রায় দুই কোটি মানুষের প্রাণ। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ। পৃথিবীকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্য ১৯২০ সালে গঠিত হয় জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব নেশনস। প্রথম দিকে সংগঠনটি বেশ কিছু বৈশ্বিক বিবাদে মীমাংসা করলেও ১০ বছর যেতে না যেতেই বিভিন্ন রাষ্ট্র সংগঠনটি থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিতে শুরু করে। এর ফলে সংগঠনটির রাজনৈতিক গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস হয়ে যায়। ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধে সংগঠনটি কোনো ধরনের ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় বিশ্ববাসী তখন একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই শুরু হয় নতুন সংগঠন জাতিসংঘ বা ইউনাইটেড নেশনস গঠনের উদ্যোগ।

জাতিসংঘ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ‘লন্ডন ঘোষণা’। ১৯৪১ সালের ১২ জুন জার্মানির আক্রমণে ভুখণ্ড হারানো ইউরোপের ৯টি দেশের প্রবাসী সরকারসহ আরও কয়েকটি দেশ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ‘লন্ডন ঘোষণা’ দেয়। এরপর ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশ রণতরী ‘এইচএমএস প্রিন্স অব ওয়েলস’-এ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন। দীর্ঘ আলোচনার পর ১৪ আগস্ট তাঁরা ‘আটলান্টিক চার্টার’ নামে এক সনদ ঘোষণা করেন।

এরপর আরও কিছু সম্মেলন শেষে ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনে মিলিত হয়ে ৫০টি রাষ্ট্র জাতিসংঘের মূল সনদে স্বাক্ষর করে। ১৫ অক্টোবর ৫১তম দেশ হিসেবে পোল্যান্ড জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। একই বছর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ কার্যকরের মাধ্যমে নতুন স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করে জাতিসংঘ। ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি লন্ডনের ‘সেন্ট্রাল হল ওয়েস্টমিনস্টার’-এ ৫১টি সদস্যরাষ্ট্রের উপস্থিতিতে জাতিসংঘের প্রথম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সদস্য সংখ্যা:

জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৩। বিশ্বের প্রায় সব স্বীকৃত রাষ্ট্রই এর সদস্য। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলো তাইওয়ান ও ভ্যাটিকান সিটি। এছাড়া অন্যান্য কিছু অস্বীকৃত এলাকার মধ্যে রয়েছে ট্রান্সনিস্ট্রিয়া ও উত্তর সাইপ্রাসের তুর্কী প্রজাতন্ত্র। জাতিসংঘে যোগদানকারী সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র হলো দক্ষিণ সুদান (২০১১ সালের ১৪ জুলাই, ১৯৩তম) যোগদান করে।

সদর দপ্তর :

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটনে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত। এটি ১৬ একর জমিতে ভবনটি ইস্ট নদীর তীরে অবস্থিত। সদর দপ্তর স্থাপনের জমি কেনার জন্য জন ডি রকফেলার জুনিয়র ৮৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন। তিনি জাতিসংঘকে এই জমি দান করেন। সদর দপ্তরের মূল ভবনটির নকশা প্রণয়ন করেন – লে করবুসিয়ে, অস্কার নিয়েমেয়ার সহ আরো অনেক খ্যাতনামা স্থপতি। নেলসন রকফেলারের উপদেষ্টা ওয়ালেস কে হ্যারিসন এই স্থপতি দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সদর দপ্তরের উদ্বোধন হয়। ১৯৪৯ সালের আগে পর্যন্ত লন্ডন ও নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে জাতিসংঘের কার্যালয়ের অবস্থান ছিল। নিরাপত্তার খাতিরে জাতিসংঘের কার্যালয়ে প্রেরিত সকল ধরনের চিঠিপত্র পরীক্ষণ-নিরীক্ষণসহ জীবাণুমুক্ত করা হয়। জাতিসংঘের সদর দপ্তরের ঠিকানা হল 760 United Nations Plaza, New York City, NY 10017, USA

ভাষা:

জাতিসংঘের অফিসিয়াল বা দাপ্তরিক ভাষা ৬ টি: ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনীয়, আরবি, চীনা, রুশ ভাষা। জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রসংঘের সচিবালয়ে ২টি ভাষা ব্যবহৃত হয়: ইংরেজি ও ফরাসি। জাতিসংঘের অফিসিয়াল বা দাপ্তরিক ভাষাগুলোর মধ্যে ইংরেজি ৫২টি সদস্য দেশের সরকারী ভাষা। ফরাসি হলো ২৯টি দেশের, আরবি ২৪টি দেশের, স্পেনীয় ২০টি দেশের, রুশ ৪টি দেশের, এবং চীনা ভাষা ২টি দেশের সরকারী ভাষা।

মুসলিম শাসন

উপমহাদেশে মুসলিম অভিযান আরবদের সিদ্ধি বিজয়

আক্রমণকারী মুসলমানদের মধ্যে আরবরাই প্রথম ভারতে এসেছিল। বস্তুত, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে আরবদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রচারের পরও তা অব্যাহত থাকে। হযরত ওমর (রাঃ)- এর শাসনামলে ৬৩৬-৬৩৭ সালে মুসলমানরা প্রথম ভারতে অভিযান করে সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও এ সময় এবং পরবর্তী সময়ে খলিফাদের সাবধানী নীতির কারণে বিজয় তৎপরতা অব্যাহত থাকেনি।

সম্প্রসারণবাদী ওমাইয়া খলিফাদের আমলে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের অংশ হিসেবে ভারতে অভিযান পরিচালিত হয়। ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উৎসাহে আরবরা সিদ্ধি আক্রমণ করে। এই অভিযান প্রেরণের পিছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথম দুটি অভিযান ব্যর্থ হয়। সিদ্ধি উপকূলে জলদস্যু কর্তৃক আরবদের জাহাজ লুণ্ঠন ছিল আরবদের সিদ্ধি অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ। সিংহলে বাণিজ্যরত কয়েকজন আরব বণিকের মৃত্যু হলে সিংহলের রাজা মৃত বণিকদের আত্মীয়-স্বজনদের এবং হাজ্জাজের জন্য প্রচুর উপহার জাহাজযোগে পাঠান। দেশে ফেরার পথে এ জাহাজগুলো ঝড়ের কারণে সিদ্ধির দেবল বন্দরে আশ্রয় নেয় এবং জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। জলদস্যুরা হাজ্জাজের জন্য প্রেরিত উপহার সামগ্রী লুট করে এবং মৃত বণিকদের বিধবা স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনদের বন্দি করে। এ খবর পেয়ে হাজ্জাজ সিদ্ধির রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেন। হাজ্জাজ এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতঃপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান প্রেরিত হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬০০০ অশ্বারোহী ও ৬০০০ উষ্ট্রারোহী নিয়ে সিদ্ধি অভিযানে যাত্রা করেন। এই বিশাল বাহিনীর রসদ বহনের জন্য ৩০০০ উট ছিল। সুশৃংখল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরব সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে সহজেই সিদ্ধির রাজা দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করে। কাসিম একে একে দেবল, নিরুন, সেহওয়ান, রাওয়ান, ব্রাহ্মণাবাদ, দাহিরের রাজধানী আড়রসহ মুলতান দখল করে খলিফার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক অপসারণ ও মৃত্যু এদেশে মুসলমান শাসনকে দুর্বল করে দেয় কারণ, তাঁর অসম্পূর্ণ বিজয়াভিযান ও পরবর্তী সময়ে খলিফাদের সহযোগিতা ও সমর্থনের অভাবে সিদ্ধি অঞ্চলে আরব শাসন স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরবদের সিদ্ধি বিজয়কে নিষ্ফল বলা যায় না। রাজনৈতিকভাবে ফলাফলবিহীন হলেও এর সামাজিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

সুলতান মাহমুদ

গজনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলপুতগীন নামক জনৈক ভাগ্যান্বেষী তুর্কি মুসলমান। পারস্যের সামানিদ বংশের অধীনে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। সামানিদ সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি গজনীতে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৭৭ সালে আলপুতগীনের মৃত্যুর পর তাঁর ক্রীতদাস ও জামাতা সবুজগীন গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সবুজগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মাহমুদ ৯৯৭ সালে গজনির অধিপতি হন। গজনির তুর্কি সুলতান মাহমুদই ভারতে মুসলমান অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে নায়ক। খলিফা আল-কাদির বিল্লাহ কাছ থেকে তিনি 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' ও 'আমিন-উল-মিল্লাত' উপাধি লাভ করেছিলেন। মাহমুদ গজনি বংশের চিরাচরিত রীতি ত্যাগ করে 'আমীরের' পরিবর্তে 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন। ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভারত আক্রমণের পিছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না। বরং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। ভারতের ধনরত্ন আহরণ করে নিজ সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর অভিযানগুলোর মধ্যে সোমনাথ দুর্গে আক্রমণ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিজিত রাজাদের প্রতি সন্ধ্যবহার করে তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুলতান মাহমুদের অভিযানের ফলে ভারতে মুসলিম শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও পরবর্তীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল। সুলতান মাহমুদ কেবল দক্ষ সমরনায়কই ছিলেন না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে তিনি গজনি রাজ্যকে সমসাময়িক বিশ্বে সুপরিচিত করেছিলেন। দীর্ঘ ৩৩ বছর রাজত্ব করার পর ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন। গজনির ফিরোজা প্রাসাদে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। আল-বিরুনি একজন ইরানি পণ্ডিত এবং বহুবিদ ছিলেন। তিনি খোয়ারেজম থেকে এসেছিলেন, এটি অধুনা পশ্চিম উজবেকিস্তান উত্তর তুর্কমেনিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করা একটি অঞ্চল বিশেষ। গজনির সুলতান মাহমুদ তাঁকে উপমহাদেশের একটি বিবরণ লেখার কার্যভার অর্পণ করেছিলেন।

আল-বিরুনি- কিতাব আল-হিন্দ হল আল-বিরুনি রচিত একটি গ্রন্থ যা উপমহাদেশীয় তথ্যের ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিবেচিত।

মুহাম্মদ ঘোরী

ঘুরি রাজবংশ, যা ঘোরি নামেও পরিচিত সম্ভবত পূর্ব ইরানী তাজিক বংশোদ্ভূত একটি পারস্যীয় রাজবংশ ছিল। ঘুরিদের বাসস্থান ঘুরে বলে উল্লেখ করা হয়, যেটি হেরাতের দক্ষিণ-পূর্বে এবং হেলমান্দ নদী উপত্যকার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি পাহাড়ি অঞ্চল। ঘোরের সুলতান গিয়াসউদ্দিন ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে গজনী জয় করে তাঁর ভাই মুইজউদ্দিন মুহাম্মদে ওপর গজনীর শাসনভার ন্যস্ত করেন। মুইজউদ্দিন মুহাম্মদই ভারতের ইতিহাসে শিহাবউদ্দিন ঘোরী বা মুহাম্মদ ঘোরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুহাম্মদ ঘোরী গজনী থেকেই তাঁর ভাইয়ের প্রতিনিধিরূপে ভারতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ভারতে আক্রমণকারী তৃতীয় মুসলিম শাসক। মুহাম্মদ ঘোরীর আসল নাম ছিল শাহাবুদ্দিন ওরফে মুইজউদ্দিন মহম্মদ ঘোরী। ঘোরীর মুহাম্মদকে পৃথ্বীরাজ ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ভাটিয়া পুনরুদ্ধার করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৭২ খ্রিঃ) পৃথ্বীরাজ চৌহানের নেতৃত্বে সম্মিলিত রাজপুত শাসকেরা ঘোরীর মুহাম্মদের কাছে পরাজিত হন। পৃথ্বীরাজকে বন্দী করা হয় ও পরে হত্যা করা হয়। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার তুর্কি শাসন শুরু হয়। মুহাম্মদ ঘোরী কুতুব-উদ্দীন আইবককে তাঁর সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করেন। তুর্কি শাসন ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা করেছিল যা ৭ শতাব্দীর থেকেও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল তরাইনের যুদ্ধ ছিল চাহামানদের বিরুদ্ধে ঘুরিদের মধ্যে। ঘুরিদের নেতৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ ঘোরি। চাহামানদের নেতৃত্বে ছিলেন পৃথ্বী রাজ চৌহান। তরাইনের যুদ্ধের অংশ হিসেবে দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় তরাইনের প্রথম যুদ্ধ হয় ১১৭১ সালে। চাহামানা রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ঘুরিদ রাজা মহম্মদ ঘোরিকে পরাজিত করেন। রাজপুত শাসক পৃথ্বীরাজ চৌহান ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘোরিকে পরাজিত করেন। তরাইনের কাছে, ১১৭১ সালে, ঘোরের মুহাম্মদের নেতৃত্বে আক্রমণকারী ঘুরিদ সেনাবাহিনী এবং পৃথ্বীরাজ চৌহানের নেতৃত্বে রাজপুত কনফেডারেসি তরাইনের প্রথম যুদ্ধে লড়াই করেছিল, যা তারোয়ারির প্রথম যুদ্ধ (ভারতের হরিয়ানার আধুনিক নাম তারাওরি) নামেও পরিচিত।

রাজপুতরা যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করে, কিন্তু শিহাবুদ্দিন পালিয়ে গিয়ে ঘোরে ফিরে যেতে সক্ষম হন। ১১৭২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘুরিদ রাজা মহম্মদ ঘোরি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে চাহামান রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করেন। ১১৯২ সালের তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বী রাজ চৌহান মহম্মদ ঘোরির হাতে পরাজিত হন। পৃথ্বীরাজ চৌহানকে "শেষ হিন্দু সম্রাট" হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইলতুৎমিস

ইলতুৎমিস (শাসনকাল : ১২১১ সাল থেকে ১২৩৬ সাল) ইলতুৎমিশ" মানে হল "যে রাজ্য/ভূমি ধারণ/দখল/জয় করেছে", "ভূমিবিজেতা", "রাজ্যজয়ী", ইত্যাদি। আধুনিক ইস্তানবুলি তুর্কিতে কথাটা হবে "il tutmuş". কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১২১০ সালে তাঁর পুত্র আরাম শাহ নিজেকে দিল্লির সুলতান ঘোষণা করে ও দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর অপদার্থতা লক্ষ করে দিল্লির আমির-ওমরাহরা ইলতুৎমিসকে দিল্লির সিংহাসন দখল করতে আহ্বান জানান। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ইলতুৎমিস আরাম শাহকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। প্রথম জীবনে ইলতুৎমিস ছিলেন কুতুবউদ্দিনের ক্রীতদাস। পরে তাঁর কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে কুতুবউদ্দিন তাঁর সঙ্গে নিজের কন্যার বিয়ে দিয়ে তাঁকে বাদাউনের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। ১২২৫ সালে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিস বাংলা ও বিহার দখলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুৎমিস রথোস্তর জয় করেন। তিনি বন্দেগান-ই-চেহেলগান বা চল্লিশ চক্র নামে দল গঠন করেন তুর্কি দাস নিয়ে। ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনি প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন।

তিনি কুতুবমিনারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। ১২২৯ সালে বাগদাদের খলিফা তাকে 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি দিলে দিল্লি সালতানাতের গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং এই সালতানাত স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম

অস্তিত্ব মুসলিম জগতে স্বীকৃত হয়। কৃতজ্ঞতাবশত ইলতুৎমিস তাঁর মুদ্রায় নিজেকে 'খলিফার সেনাপতি' বলে উল্লেখ করেন ১২৩২ সালে তিনি গোয়ালিয়র অধিকার করেন। ১২৩৪ সালে তিনি মালব অধিকার করেন। এই সময় উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকালের মন্দির ধ্বংস হয়ে যায় বলে বহুল প্রচারিত। ১৯৩৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর কন্যা রাজিয়া সিংহাসনে বসেন রাজিয়া সুলতানা।

"রাজিয়া সুলতান (১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ -১২৪০ খ্রিস্টাব্দ):

- তিনি ক্রীতদাস রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
- তিনি ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতের প্রথম ও শেষ মুসলিম নারী শাসক।
- তিনি জামালুদ্দিন ইয়াকুটকে অশ্বারোহী বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন।

- তিনি পরদাহ পরিত্যাগ করেন এবং পুরুষ পোশাকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হন।
- তিনি মঙ্গোল আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি 1240 খ্রিস্টাব্দে মারা যান।"

গিয়াসউদ্দিন বলবন

বালবনের পুরো নাম ছিল গিয়াসউদ্দিন বলবন এবং তিনি মামলুক রাজবংশের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি মামলুক/দাস রাজবংশের নবম সুলতান। ইলতুতমিশ তাকে ক্রীতদাস হিসেবে কিনেছিলেন। তিনি প্রথমে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তারপর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। নাসির-উদ-দিন-মাহমুদের মৃত্যুর পর বলবন নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন কারণ পূর্বের কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী ছিল না। বলবন তাঁর কঠোর আইন ও শৃঙ্খলা প্রয়োগ এবং সুলতানতের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার জন্য পরিচিত।

তিনি অভিজাতদের উপর নজর রাখার এবং সুলতানতের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য গুপ্তচরদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন। বলবনের শাসনকাল একটি আরও কেন্দ্রীভূত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যা দিল্লি সুলতানতের স্থায়িত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। "বলবন তার শাসনকালে মেওয়াতি সম্প্রদায়ের সাথে মোকাবেলা করার জন্য 'রক্ত ও লৌহ' নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বলবন দিল্লি সুলতানতের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসকদের একজন ছিলেন এবং 1266 থেকে 1287 সাল পর্যন্ত সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর নীতি কঠোর প্রশাসন এবং বিদ্রোহ দমন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সামরিক পদক্ষেপ দ্বারা চিহ্নিত ছিল। বলবনের শাসনকাল সুলতানতের ক্ষমতা একত্রিত করার এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত হুমকি দমনের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চিহ্নিত করে।" তিনি ভারতে পারস্যের নভোরোজ উৎসবের প্রচলন করেন। বলবন রাজাকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়া হিসেবে ভাবতেন, পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে নিয়াবাত-ই-খুদাই বলে অভিহিত করেন।

আলাউদ্দিন খলজী

জালালউদ্দিন খলজী হলেন প্রথম উল্লেখযোগ্য খলজী পুরুষ। 'খলজী বিপ্লব'-এর তিনিও একজন অংশীদার। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। জালালউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন খলজী হলেন শ্রেষ্ঠ খলজী শাসক। খিলজি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তার কাকা ও শ্বশুর জালালউদ্দিন খিলজিকে হত্যা করার পর তিনি দিল্লির সুলতান হন।

জালালউদ্দিন ফিরুজ খিলজি ছিলেন খিলজি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সুলতান যিনি 1290 থেকে 1296 সাল পর্যন্ত দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। আলাউদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং একজন যুদ্ধবাজ ব্যক্তি। তিনি নিজেকে 'দ্বিতীয় আলেকজান্ডার' বলতে পছন্দ করতেন। তার শাসনামলে তিনি তার রাজ্যকে বিশাল এলাকায় বিস্তৃত করেন। তিনি গুজরাট, রণথাম্বর, মেওয়ার, মালওয়া, জালোর, ওয়ারাঙ্গল এবং মাদুরাই জয় করেন। আলাউদ্দিন খিলজি ছিলেন খিলজি রাজবংশের দ্বিতীয় সুলতান এবং এই রাজবংশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি ১২৯৬ থেকে ১৩১৬ পর্যন্ত প্রায় বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

আলাউদ্দিন ছিলেন যুদ্ধপ্রিয় এবং সাম্রাজ্যবাদী। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশেই তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমরাভিযান পরিচালনা করেন। এগুলোর মধ্যে গুজরাট, রণথাম্বর, চিতোর, মালব, দেবগিরি, পান্ড্যরাজ্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আলাউদ্দিনের চিতোর অভিযানকে কেন্দ্র করে প্রচলিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বিপুলভাবে জনপ্রিয়। দক্ষিণাভ্যে মূলত আলাউদ্দিন করদ রাজ্য সৃষ্টি করেন, কিন্তু উত্তরভারতে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তিত হয়। আলাউদ্দিন যুদ্ধপ্রিয় ও সাম্রাজ্যবাদী সুলতান ছিলেন। সিংহাসনে বসেই তিন দিগ্বিজয়-নীতি গ্রহণ করেন। তার শাসনামলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল মোঙ্গলদের ছয় ছয়টি আক্রমণ প্রতিহত করা।

সিংহাসনে আরোহণের পর আলাউদ্দিন খলজীর প্রথম অভিযান ছিল গুজরাট অভিযান। ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই অভিযান প্রেরণ করেন। আলাউদ্দিন খলজীর অন্যতম বিখ্যাত অভিযান ছিল চিতোর আক্রমণ। তিনি ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে রাজপুতনার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য মেবারের এই দুর্গ আক্রমণ করেন। চিতোর ছিল মেবার রাজ্যের রাজধানী। মেবারের রাজবংশ 'শিশোদিয়া বংশ' ছিল খুবই প্রাচীন ও সম্মানিত। চিতোরের রাণা রতন সিংহ আলাউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে সুলতান চিতোর অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, চিতোর দুর্গ বিরোধী শক্তির হাতে থাকলে সুলতানি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হবার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং চিতোরের ওপর দিল্লির আধিপত্য স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তিনি এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। চিতোর দুর্গটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিল। আলাউদ্দিন খলজী বহু চেষ্টা করে সম্মুখ যুদ্ধে দুর্গ দখল করতে বিফল হন। রাজপুতরা বীরবিক্রমে সুলতানি বাহিনীকে হঠিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিন বিভিন্ন

কৌশল অবলম্বন করে দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেন। প্রায় সাতমাস অতিবাহিত হওয়ার পর আর টিকতে না পেরে চিতোর রাজা রতনসিংহ আত্মসমর্পণ করেন। রতন সিংহ আত্মসমর্পণের পূর্বে রাজপুত রমণীরা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত পালন করে বলে কথিত আছে। প্রায় ত্রিশ হাজার রাজপুত সৈন্য নিহত হয়। কয়েকদিন চিতোর থাকার পর পুত্র খিজির খানকে চিতোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সুলতান আলাউদ্দিন দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন।

মোহাম্মদ বিন তুঘলক

"মহম্মদ বিন তুঘলক 1325 খ্রিষ্টাব্দ থেকে 1351 খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির সুলতান ছিলেন। তিনি ছিলেন গিয়াস-উদ্দীন-তুঘলকের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তুঘলক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তার আসল নাম ছিল উলুগ খান বা ফখরুদ্দিন জাউনা। বিখ্যাত পরিব্রাজক এবং মরক্কোর আইনবিদ, ইবন বতুতা তাঁর দরবারে অতিথি ছিলেন এবং তাঁর বইতে মহম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্য সম্পর্কে লিখেছিলেন।" তিনি মুহাম্মদ বিন-তুঘলকের (1333-1347) রাজত্বকালে ভারতে আসেন। মুহাম্মদ বিন-তুঘলক তার পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হন এবং ইবনে বতুতাকে দিল্লির কাজী বা বিচারক নিযুক্ত করেন। 1342 সালে তাকে মঙ্গোল শাসকের সুলতানের দূত হিসেবে চীনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 1327 খ্রিষ্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর রাজধানী দিল্লি থেকে বর্তমান মহারাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, রাজধানীকে একটি কেন্দ্রীয় স্থানে নিয়ে গেলে তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় উপ-মহাদেশকে দক্ষতার সাথে শাসন করতে পারবেন।" দু'বছর পরে তিনি জল সরবরাহের অভাবে এবং অন্যান্য অনেক সমস্যার কারণে রাজধানীটি দিল্লিতে ফিরিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের নীতি:

মহম্মদ বিন তুঘলক রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে 'জিতাল' নামে একটি তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করে। 1329-30 সালে তিনি প্রতীক মুদ্রা চালু করেছিলেন। দিওয়ান-ই-কোহি: কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা, যদিও প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং জলবায়ুগত কারণের কারণে এর সাফল্য সীমিত ছিল।" দিল্লির সুলতান (1325-1351) মুহাম্মদ বিন তুঘলক আজমির খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহ পরিদর্শনকারী প্রথম সুলতান ছিলেন। তিনি সম্মানিত সুফি সাধক খাজা মইনুদ্দিন চিশতির ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে এবং তার আশীর্বাদ চাইতে দরগাহ পরিদর্শন করেছিলেন।

এই পরিদর্শন সুলতানের সুফি সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং দিল্লি সালতানাতের সময় রাজকীয় কর্তৃত্বকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক নেতাদের গুরুত্ব তুলে ধরে। এটি মধ্যযুগীয় ভারতে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কেন্দ্র হিসেবে দরগাহের রাজনৈতিক গুরুত্বও প্রতিফলিত করে।

মুঘল সাম্রাজ্য

বাবর

জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর, যিনি সাধারণত বাবর নামেই পরিচিত, ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। জানা যায় যে, মুঘল শব্দটি এসেছে 'মোঙ্গ' বা 'মোঙ্গল' শব্দ হতে। তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৩ সালে উজবেকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন তৈমুর লংগের ষষ্ঠ বংশধর এবং মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর। বাবর তার সামরিক দক্ষতা এবং রণকৌশলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ভারত উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে দিল্লি ও আগ্রা দখল করেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (২১ এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রি.) পানিপথ বর্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার উত্তরে হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের বাবর কাবুল থেকে আগমন করে পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খান লোদীকে পরাজিত করে লাহোর তথা সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী ও জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের মধ্যে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। 'তুঘলক-ই-বাবুরী' বা 'বাবরনামা'র বিবরণ অনুযায়ী পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সেনাবাহিনীতে ছিল ১২,০০০ পদাতিক, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যবাহিনীতে ছিল ১,০০,০০০ সৈন্য ও ১০০ হস্তী। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর সর্বপ্রথম এই যুদ্ধে কামানের ব্যবহার করেন। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত করেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করার মাধ্যমে লোদী বংশের পতন ঘটে। ফলে উপমহাদেশে সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে এবং মুঘল বংশের রাজত্ব শুরু হয়। বাবর অল্প বয়সেই সিংহাসনে বসেন এবং সমরকন্দ দখলের জন্য সংগ্রাম করেন। তিনি উজবেকদের কাছ থেকে "তুলঘুমা" নামে নতুন যুদ্ধরীতি শিখেছিলেন, যা পরিখা খনন, সৈন্যদের ব্যূহরচনা, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও অশ্বারোহী আক্রমণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম গোলন্দাজ বাহিনী নামে একটি বিশেষ বাহিনী গড়ে তুলেন। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মার্চ আগ্রার অনতিদূরে ফতেহপুর সিক্রির নিকট খানুয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।। রানা সংগ্রাম সিংহ বিলসার সিলহদা, ধুনগড়ের উদয়সিংহ, মারবাড়ের ভীমসিংহ, চান্দেীর মেহেদী রাও প্রমুখ অসংখ্য রাজপুত সর্দার এবং হাসান খান মেওয়াটির সাহায্যে একটি শক্তিশালী সামরিক জোট গঠন করেন। সম্মিলিত সামরিক জোটে রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে ১২০ জন রাজপুত সর্দার, ৮০ হাজার অশ্বারোহী (মতান্তরে ১,২০,০০০ অশ্বারোহী) ৫ শত হস্তী বাহিনী (মতান্তরে ১,০০০ হস্তীবাহিনী) এবং বিপুল সংখ্যকস্বেচ্ছাসেবক বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। বিপুল সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে বাবর মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে রাজপুতদের সমন্বয়ে গঠিত এই বিশাল বাহিনীর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ক্ষুদ্র বাহিনীকে বাবর ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) ন্যায় এক অনলবর্ষী ও তেজোদীপ্ত ভাষণ দ্বারা অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও যুদ্ধ কৌশলের অপকর্ষতার ফলে রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাবরের প্রাধান্য ও ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। বাবর এই যুদ্ধে জয়লাভের পর তাঁর ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু কাবুল থেকে হিন্দুস্থানে স্থানান্তর করেন। খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুত শক্তির পুনরুজ্জীবনের আশা স্থায়ীভাবে বিলুপ্ত করে বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ‘গাজী’ উপাধি ধারণ করেন।

জৌনপুরের শাসক মাহমুদ লোদী ও বাংলার শাসক নুসরত শাহের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত আফগান সেনাবাহিনী ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে ঐতিহাসিক গোগরার যুদ্ধে বাবরের নেতৃত্বাধীন মুঘল সেনাবাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে গোগরার যুদ্ধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের পানিপথের প্রথম যুদ্ধ এবং ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের খানুয়ার যুদ্ধের পর ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের গোগরার যুদ্ধ পরিপূরক যুদ্ধ হিসেবে সমধিক পরিচিত। এই যুদ্ধই ছিল বাবরের বর্ণাঢ্য জীবনের সর্বশেষ বৃহৎ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে আফগানদের পুনঃসংঘটিত হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হয়। বাবর খলিফার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে স্বয়ং ‘বাদশাহ’ উপাধি গ্রহণ করেন।

তিনি পূর্ববর্তী আমলে প্রচলিত সামন্ত প্রথা ও জায়গীরদারী প্রথা চালু রাখলেও তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব সীমিত করেন। বাবরের শাসনামলে বিভাগীয় প্রধান এবং বাদশাহের সাথে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন প্রধানমন্ত্রী নিজামউদ্দিন খলিফা। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হত ওয়ালী (প্রাদেশিক গভর্নর) দিওয়ান (রাজস্ব কর্মকর্তা), সিকদার (সমর কর্মকর্তা) ও কোতায়াল (নগর কর্মকর্তা) প্রমুখ কর্মকর্তাদের দ্বারা। বাবর সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী ১৫ মাইল অন্তর অন্তর ডাকচৌকির ব্যবস্থা করেন। জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী এবং একজন রুচিশীল শাসক। তিনি দিল্লি ও আগ্রায় ২০টি উদ্যান, বহু পাকা নর্দমা, সেতু ও অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। বীরযোদ্ধাও সমরকুশলী বাবরের সাহিত্যানুরাগ ছিল প্রগাঢ়। তিনি তুর্কী ও ফার্সি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি তুর্কি ও ফার্সি ভাষায় অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। তাঁর রচিত তুর্কি কবিতার সংকলন ‘দিওয়ান’ নামে পরিচিত। ফার্সি ভাষায় বাবর এক প্রকার নতুন ছন্দ আবিষ্কার করেন যা সাধারণত ‘মুবইয়ান’ নামে সুপরিচিত। জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের সাহিত্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তুর্কি ভাষায় রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘তুয়ুক-ই-বাবরী’। ‘তুয়ুক-ই-বাবরী’ মুঘল ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল।

হুমায়ুন- শেরশাহ

মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে শিয়া মাতা মাহিম বেগমের গর্ভে কাবুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর অপর তিন ভ্রাতা ছিলেন কামরান, আসকারী এবং হিন্দাল। বাল্যকালেই হুমায়ুন আরবি, ফার্সী ও তুর্কী ভাষাসহ কাব্য ও সাহিত্যের পাশাপাশি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পন্ডিত্য অর্জন করেন। বাবরের শাসনামলে হুমায়ুন বাদাখশান, হিসার ফিরোজা এবং সম্বলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পিতা বাবরের মৃত্যুর পর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বছর বয়সে পিতৃ মনোনয়ন অনুসারে হুমায়ুন ‘নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন’ নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালকে দু’টি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বে ১৫৩০-১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বে ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল বংশের দ্বিতীয় শাসক হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যখানে ১৫৪০-১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শের খান (শের শাহ) কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পারস্যের শাসক শাহ তাহমাসপের রাজদরবারে আশ্রিত ছিলেন।

হুমায়ুনের সাথে শেরখানের সংঘাত শেরখানের বাল্য নাম ছিল ফরিদ। তিনি ছিলেন আফগান জাতির শুর উপদলভুক্ত। তাঁর পিতা হাসান ছিলেন বিহারের সাসারামের জায়গীরদার। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে চান্দেীর দুর্গবিজয়ের সময় সম্রাট জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরকে শেরখান (শেরশাহ) সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন। প্রীত হয়ে সম্রাট বাবর পুরস্কারস্বরূপ শেরখানকে পিতৃ জায়গীর সাসারামে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে শেরখান বারানসীর নিকটবর্তী চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খানের বিধবা পত্নী লাড মালিকাকে বিবাহ করার মাধ্যমে চুনার দুর্গের কর্তৃত্ব লাভ করেন। শেরখানের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে চুনার দুর্গ অবরোধ করেন।

কিন্তু অত্যন্ত কূটকৌশলী এবং রাজনীতিতে দূরদর্শী শেরখান হুমায়ুনের মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করলে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করেন। ইতবৎসরে শেরখানের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে বিহারের অভিজাত শ্রেণি ও শাসক জালালখান বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের সহায়তায় শেরখানকে দমন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনী এবং শের শাহের নেতৃত্বে আফগান বাহিনীর মধ্যে মুঙ্গেরের নিকটবর্তী কিউল নদীর তীরে অবস্থিত সুরজগড় নামক স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সংঘটিত এই যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনীকে শের খান শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর শের খান প্রকৃতপক্ষে বিহারের অবিসংবাদিত অধিপতি হিসেবে আবির্ভূত হন। শেরখান বাংলার শাসনকর্তা মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে অগ্রসর হলে দুর্বল শাসক মাহমুদ শাহ তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং কিউল হতে সেরিগিলি পর্যন্ত অঞ্চলটি শের খানের অধীনে ন্যস্ত করে নিজে সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। শেরখান ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুনরায় বাংলা আক্রমণ করে রাজধানী গৌড় অবরুদ্ধ করলেন। এ সময়কালে সম্রাট হুমায়ুন গুজরাট অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। শেরখানের উত্তরোত্তর ও ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে তিনি গুজরাট অভিযান অসম্পন্ন রেখে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন। সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শেরশাহের প্রধান ঘাঁটি চুনার দুর্গ অবরুদ্ধ করেন। এটি ছিল সম্রাট অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে শেরখান ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে গৌড় জয় করেন এবং একই সাথে গৌড়ের শাসক সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। এছাড়াও তিনি রোটার দুর্গটিও দখল করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে সম্রাট হুমায়ুন চুনার দুর্গ জয় সম্পন্ন করে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু এটি ছিল সম্রাটের একটি বিলম্বিত পদক্ষেপ। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সৈন্যে গৌড়ে প্রবেশ করেন। গৌড়ের মনোরম আবহাওয়া হুমায়ুনকে প্রবলভাবে আকর্ষিত করে। তিনি প্রীত হয়ে এর নাম রাখেন জাম্নাতাবাদ।

অত্যন্ত কুশলী এবং দূরদর্শী শেরখান সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে হুমায়ুনকে গৌড় দখল করার সুযোগ দেন এবং স্বয়ং অগ্রসর হয়ে সমগ্র বিহার দখল করেন। তিনি এমনকি জৌনপুর ও কনৌজ অধিকার করে হুমায়ুনের বাংলা থেকে আত্মীয় প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দেন। চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯) সম্রাট হুমায়ুন গৌড় পরিত্যাগ করার পূর্বে জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনভার অর্পণ করেন। হুমায়ুন তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আত্মীয় অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শেরখান ও তাঁর আফগান অনুচররা সম্রাট হুমায়ুনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন চৌসায় উভয়পক্ষের মধ্যে এক তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে চৌসার যুদ্ধ নামে পরিচিত। এইযুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। চৌসার যুদ্ধে শের খানের জয়লাভ ভারতীয় উপমহাদেশে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এর ফলে শের খানের রাজ্য পশ্চিম দিকে কনৌজ হতে পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম এবং উত্তর দিকে রোটার হতে দক্ষিণ দিকে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এই যুদ্ধের পর শেরখান শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন ও পাঠের নির্দেশ প্রদান করেন। কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০) চৌসার যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি দূরীভূতকরণ এবং হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার মানসে সম্রাট হুমায়ুন পুনরায় সৈন্যবাহিনী সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। এসময় তিনি নিজ ভ্রাতাদের কাছে প্রয়োজনীয় সৈন্য সাহায্যের আবেদন করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে সম্রাট হুমায়ুন গোলন্দাজ বাহিনীসহ এক বিশাল সেনাবাহিনী সহকারে শেরশাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে কনৌজের নিকটবর্তী বিলগ্রাম নামক স্থানে মুঘল ও আফগান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ উপমহাদেশের ইতিহাসে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে শের শাহের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সম্রাট হুমায়ুন এই যুদ্ধেও আফগানদের হাতে পরাজিত হন।

কনৌজের যুদ্ধের মর্মান্তিক পরাজয়ের পর সম্রাট হুমায়ুন আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে পারস্যের শাসক শাহ তাহমাসপের রাজ দরবারে আশ্রয় লাভ করেন এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। এই যুদ্ধে শের শাহের জয়লাভের ফলে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের সাময়িক অবসান ঘটেছিল। শেরশাহ ভারতবর্ষে আফগান শূরী বংশের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, “হুমায়ুন আলেকজান্ডারের ন্যায় উদ্যমী ও এরিস্টটলের ন্যায় জ্ঞানী ছিলেন।” খুদামীর, সাহাবউদ্দিন, কাফা, জৌহর প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তি তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্য ও চিত্রকলায় উৎকর্ষ

সাধিত হয়। পারস্য থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি মীর সৈয়দ আলী এবং খাজা আব্দুস সামাদকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলার শুভ সূচনা হয়েছিল। নিষ্ঠাবান মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হুমায়ুন কখনও ধর্মাত্ম ছিলেন না। নিঃসন্দেহে হুমায়ুন একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পারস্যের শাসকের সহায়তায় মুঘল সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তিনি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পরে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সম্রাট আকবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। যুদ্ধক্ষেত্র, সমরনীতি, কূটনীতি ও প্রশাসন সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুঘলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ইতিহাসে তাই তিনি 'Akbar the Great' নামে পরিচিত। সম্রাট হুমায়ুন যখন শেরশাহ এর নিকট পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়ে স্ত্রী হামিদাবানুকে নিয়ে পারস্য অভিমুখে যাত্রাকালে, রাজস্থানের অমরকোট ২৩ নভেম্বর, ১৫৪২ সালে আকবর জন্মলাভ করেন। জন্মের পর হুমায়ুন শিশুপুত্রের নামকরণ করেন জালালউদ্দিন। প্রথমে কয়েকবছর আকবর তার চাচা হিন্দাল, শামছুদ্দিন খান ও মাহমুদ আনগার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। হুমায়ুন তার পুত্রের প্রথাগত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। আকবর খুব অল্প বয়সেই মল্লযুদ্ধ, অশ্বচালনা, তীরন্দাজ ইত্যাদি যুদ্ধকৌশল সহজেই রপ্ত করেন। ১৫৫১ খ্রি: মাত্র ৯ বছর বয়সে সম্রাট আকবর তার চাচা হিন্দালের কন্যা রুকাইয়া বেগমকে বিবাহ করেন। সিংহাসন আরোহণ ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনি খুব বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। ১৫৫৫ খ্রি: আগ্রার লাইব্রেরির সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আকবর

হুমায়ুনের মৃত্যুর প্রাক্কালে আকবর পাঞ্জাবে বৈরামখানের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করছিলেন। বৈরাম খান এখানেই আকবরকে পরবর্তী মুঘল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তার রাজ্য অভিষেকের ব্যবস্থা করেন। ১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর উপাধি নিয়ে মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশুদ্ধ বৈরাম খান আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং ১৫৬০ খ্রি: পর্যন্ত সম্রাট আকবর বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে রাজ্যশাসন করেন আইন-ই-আকবরী হল আকবরনামার তৃতীয় খণ্ড। এটি ষোড়শ শতাব্দীতে আবুল ফজল দ্বারা লিখিত। এতে ফসল, দাম, রাজস্ব এবং মজুরি ইত্যাদি সম্পর্কে সমৃদ্ধ পরিসংখ্যানগত বিবরণ রয়েছে।

এটি ভারতের জনগণের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে বিবরণও বর্ণনা করে। আইন-ই-আকবরী পাঁচটি বইতে বিভক্ত। আকবরের পূর্বপুরুষদের বিবরণ আকবরনামার প্রথম বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। পানিপথের ২য় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রি:) রাজ্যবিস্তারের প্রথম ধাপে আকবর আদিল শাহ শুরের সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রী হিমুর মুখোমুখি হন। হিমু হুমায়ুনের মৃত্যুর পর দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। আকবরের সাথে হিমুর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বৈরাম খান মুঘল বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথের প্রান্তরে হিমুকে পরাজিত করেন। বাংলা বিজয় (১৫৭৬ খ্রি:) এই সময় বাংলার শাসক ছিলেন দাউদ খান কররানি। তিনি তার পিতা সুলায়মান কররানীর মত মুঘলদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেননি। তিনি নিজ নামে খুৎবা ও মুদ্রা জারি করেন। আকবর প্রথমে জৈনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে বাংলা আক্রমণের নির্দেশ দেন। দাউদ খানের বিচক্ষণ উজির লোদী খানের মধ্যস্থতায় দাউদখান মুনিম খানের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু ১৫৭৪ খ্রি. আকবর হাজিপুর ও পাটনা অধিকার করেন এবং মুনিম খানকে বাংলার সুবাদার ও টোডরমলকে বাংলা অভিযান এর দায়িত্ব অর্পণ করে রাজধানীতে ফিরে যান। মুঘল বাহিনী একে একে ভাগলপুর, কোলগাও, তেলিয়াগিরি হয়ে তাড়া ও সপ্তগ্রাম অধিকার করে। মুঘলদের সাথে দাউদ খান ১৭৫৭ খ্রি. কটকের সন্ধি স্থাপন করে। অবশেষে রাজা টোডরমল ও হোসেন কুলি খান-এর নেতৃত্বে ১৫৭৬ খ্রি. ১০ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলা বিজয় সম্পন্ন হয়।

আকবরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা :

দিওয়ান- আকবরের শাসনামলে, দিওয়ান ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থ ও রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। দিওয়ানকে রাজকীয় অর্থ ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে কর সংগ্রহ এবং কর্মকর্তাদের বেতন বিতরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। আকবরের নবরত্নদের একজন, রাজা টোডরমল, দিওয়ান হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং কর আদায়কে সুগম করার জন্য "জাবত" নামে পরিচিত রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। দিওয়ান হিসাবের খাতা এবং নিরীক্ষার একটি পদ্ধতির মাধ্যমে আয় ও ব্যয়ের সঠিক রেকর্ড রাখা নিশ্চিত করেছিলেন, সাম্রাজ্যে আর্থিকশৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন। আকবরের প্রশাসনের অধীনে, অর্থ বিভাগ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুসংহত করতে এবং দক্ষ শাসন নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জাবতি- রাজা টোডরমল, যিনি তখন আকবরের অর্থমন্ত্রী ছিলেন,

দশশালা ব্যবস্থা বা জাবতি ব্যবস্থা (ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা) চালু করেছিলেন। এই ব্যবস্থায় দশ বছরের গড় উৎপাদন পাওয়া যেত। এই গড় উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ প্রতি বিধায় রূপিতে নির্ধারণ করা হত এবং রাজ্যের (মাল) অংশ হিসেবে নির্ধারিত হত।

দিওয়ানের ভূমিকা:

"দিওয়ান" শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ একটি রেজিস্টার বা হিসাবের দফতর। দিওয়ানকে প্রধান অর্থ কর্মকর্তা হিসাবে বিবেচনা করা হত এবং তিনি সরাসরি সম্রাটের কাছে রিপোর্ট

করতেন। আকবরের অধীনে অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা:

মীর বকশী: সামরিক প্রশাসন এবং সৈন্যদের বেতন পরিশোধের জন্য দায়ী ছিলেন।

সদর-উস-সুদুর: ধর্মীয় দান এবং বিচারিক বিষয়গুলি দেখাশোনা করতেন।

কাজী: প্রধান বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করতেন।

আকবরের প্রশাসনিক সংস্কার: আকবর একটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছিলেন, সাম্রাজ্যকে প্রদেশগুলিতে (সুবা) বিভক্ত করে। প্রতিটি সুবা একজন সুবেদার দ্বারা শাসিত হত, যার রাজস্ব, সামরিক এবং বিচারিক কার্যাবলীর জন্য পৃথক কর্মকর্তা ছিলেন। জায়গিরদারি ব্যবস্থা শব্দটি দুটি ফার্সি শব্দের সমন্বয়ে উদ্ভূত হয়েছিল: জাগির ("অধিষ্ঠিত জমি") এবং দার ("সরকারি")।

এটি ছিল ভূমি প্রজাস্বত্বের একটি রূপ যেখানে একটি সাম্রাজ্যের রাজস্ব সংগ্রহ এবং এটি পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তাকে অর্পণ করা হয়েছিল। এটা অবশ্যই স্পষ্ট করা উচিত যে এটি বরাদ্দকৃত জমি ছিল না, তবে জমি/ক্ষেত্র থেকে আয়/রাজস্ব জায়গিরদারদের দেওয়া হয়েছিল।

এই ব্যবস্থাটি সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়েছে এবং স্থিতিশীল হওয়ার আগে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যাইহোক, আকবরের শাসনাকালে মৌলিক কাঠামো গড়ে ওঠে। জায়গির ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশাসনিক কারণে এক জায়গির থেকে অন্য জায়গিরে স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরের এই ব্যবস্থা স্থানীয় শিকড়ের বিকাশ থেকে জায়গিরদারদের পরীক্ষা করে।

একই সময়ে, এর অসুবিধা ছিল যে এটি জায়গিরদারদের তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে নিরুৎসাহিত করেছিল। জায়গির বিভিন্ন প্রকার। সাধারণত চার ধরনের রাজস্ব নিয়োগ ছিল:

জায়গির, যা বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হত, জায়গীর তনখা নামে পরিচিত ছিল; নির্দিষ্ট শর্তে কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া জায়গিরকে মাশরুত জায়গির বলা হতো; যে জায়গিরগুলোতে চাকরির কোনো বাধ্যবাধকতা জড়িত ছিল না এবং পদমর্যাদার থেকে স্বাধীন ছিল তাদের বলা হতো ইনাম জায়গির, এবং যেসব জায়গির জমিদারদের (সর্বাধিক) স্বদেশে অর্পণ করা হতো, সেগুলোকে বলা হতো ওয়াতন জায়গির।

আকবরের প্রবর্তিত

ধর্ম

দীন-ই-ইলাহী আকবর কর্তৃক প্রস্তাবিত একটি ধর্মীয় পথ ছিল। এটি ছিল নৈতিক আচরণের একটি নীতিমালা যা আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা এবং তার সাম্রাজ্যে শান্তি, ঐক্য, সহিষ্ণুতা অর্জনের ইচ্ছা প্রতিফলিত করে। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, আলোর উৎসের উপাসনা, প্রাণীর হত্যা না করা, সকলের সাথে শান্তি বজায় রাখা - এগুলো ছিল দীন-ই-ইলাহীর কিছু বৈশিষ্ট্য। এতে কোনও ধর্মীয় রীতিনীতি, পবিত্র গ্রন্থ, মন্দির বা পুরোহিত ছিল না। এই ধর্মের উপাদানগুলি মূলত ইসলাম, হিন্দু ধর্ম এবং জোরোস্ট্রিয়ানিজম থেকে নেওয়া হয়েছিল, তবে কিছু অন্যান্য উপাদান খ্রিস্টধর্ম, জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম থেকেও নেওয়া হয়েছিল। অতএব, এটি কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের উপাদান নয় বরং সকল ধর্মের মিশ্রণ ছিল। দীন-ই-ইলাহী বা "ঈশ্বরের ধর্ম" ছিল মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক 1582 খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তিত ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যবস্থা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও হিন্দু ধর্মকে এক বিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করা এবং তার সাথে খ্রীস্টান, জুরোস্ট্রিয়ান-বাদ এবং জৈন ধর্মের দিকগুলিও যুক্ত করা। তিনি 1575 সালে ইবাদত খানা, বা "পূজা গৃহ" নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে সমস্ত প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিরা ধর্মতত্ত্বের প্রশ্নগুলি আলোচনার জন্য মিলিত হতে পারেন। 1570-এর দশকে ফতেপুর সিক্রিতে আকবর বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। সেখানে উলামা, ব্রাহ্মণ, জেসুইট ধর্মযাজক, রোমান, ক্যাথলিক এবং জরথুষ্ট্রিয়ানরা ছিলেন। ইবাদতখানায় এসব আলোচনা হয়। এগুলো ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়ে। এই মিথস্ক্রিয়া তাকে উপলব্ধি করেছিল যে ধর্মীয় পণ্ডিতরা গোঁড়া। তারা আচার এবং মতবাদের উপর জোর দেয়। তাদের শিক্ষা সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। এটি সুলহ-ই-কুল বা 'সার্বজনীন শান্তি' ধারণার দিকে পরিচালিত করে। জনপ্রিয় বিশ্বাসের অংশ হিসাবে সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে আকবর দ্বারা ঝাড়োকা দর্শন প্রবর্তন করা হয়েছিল। সম্রাটের মতে এটি সূর্যোদয়ের সময় কয়েকটি ধর্মীয় প্রার্থনার মাধ্যমে তার দিন শুরু করে

এবং তারপর একটি ছোট বারান্দায়, অর্থাৎ পূর্ব দিকে ঝাড়োখায় উপস্থিত হত। ঝাড়োখা-ই দর্শন 16 শতকের মুঘল সম্রাট আকবর দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, যদিও এটি ইসলামি আদেশের বিপরীত ছিল। আকবরের সময়ে স্থাপত্য বুলন্দ দরওয়াজা এটি 1601 সালে নির্মিত হয়েছিল। এটির নির্মাণের জন্য 12 বছর সময় লেগেছিল। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রা জেলার ফতেপুর সিক্রিতে অবস্থিত। এটি হিন্দু ও ফার্সি স্থাপত্য শৈলীর মিশ্রণে নির্মিত একটি স্থাপত্য শৈলী। আকবরের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলি হল নিম্নরূপ।

- ফতেপুর সিক্রি
- এলাহাবাদ দুর্গ
- আগ্রা দুর্গ

মাহাম আনাগা:

মাহাম আনাগা মুঘল সম্রাট আকবরের পালক মা ছিলেন এবং তাঁর শৈশব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে, বিশেষ করে 1560 থেকে 1562 সালের মধ্যে, তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যা প্রায়শই তাঁর প্রভাবশালী ভূমিকার কারণে "পেটি-কোট সরকার" নামে পরিচিত।

এই সময়কালে, তিনি কার্যকরভাবে সাম্রাজ্যের বিষয়গুলি পরিচালনা করেছিলেন এবং যুবক আকবরকে শাসন করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

বৈরাম খান:

আকবরের শৈশবের অভিভাবক এবং সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি আকবরের সিংহাসনে আরোহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং ১৫৬০ সাল পর্যন্ত আকবরের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

জাহাঙ্গীর (Nur-ud-din Muhammad Salim Jahangir)

রাজত্বকাল: ১৬০৫-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ জাহাঙ্গীরের প্রকৃত নাম ছিল নূরউদ্দিন মুহাম্মদ সেলিম। তিনি আকবরের পুত্র ছিলেন এবং 'জাহাঙ্গীর' উপাধির অর্থ 'বিশ্ববিজয়ী'। তাঁর রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য সামরিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং শিল্পকলা, বিশেষত চিত্রকলার ব্যাপক বিকাশ ঘটে।

প্রারম্ভিক চ্যালেঞ্জ ও বিদ্রোহ:

খসরুর বিদ্রোহ (১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ): সিংহাসনে আরোহণের পরপরই জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু (খুররমের ভাই) বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহে শিখ গুরু অর্জুন দেব খসরুকে আশীর্বাদ ও আর্থিক সহায়তা করায় জাহাঙ্গীর তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এটি মুঘল-শিখ সম্পর্কের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নূরজাহানের প্রভাব:

মেহেরুন্নিসা (নূরজাহান): জাহাঙ্গীরের স্ত্রী মেহেরুন্নিসা (পরবর্তীতে নূরজাহান) ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা জাহাঙ্গীরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু: যদিও জাহাঙ্গীর সার্বভৌম শাসক ছিলেন, নূরজাহান পর্দার আড়াল থেকে রাষ্ট্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন। তাঁর নামে মুদ্রা জারি হয়েছিল এবং তাঁর পিতা ইতমাদ-উদ-দৌলা ও ভাই আসফ খান সহ শাহজাদা খুররমকে (পরবর্তীকালে শাহজাহান) নিয়ে গঠিত 'নূরজাহান জুন্টা' (Junta) বেশ প্রভাবশালী ছিল।

সামরিক অভিযান ও সাম্রাজ্য বিস্তার:

মেবারের বিজয় : দীর্ঘদিনের প্রতিরোধের পর, মেবারের রাজপুত রানা অমর সিংহ (মহারানা প্রতাপের পুত্র) ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এটি মুঘলদের একটি বড় সামরিক ও কূটনৈতিক বিজয় ছিল, কারণ আকবর তা করতে পারেননি। মুঘলরা মেবারের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করে।

কাংড়া জয় (১৬২০ খ্রিস্টাব্দ) : শক্তিশালী কাংড়া দুর্গ জয় করেন।

দাক্ষিণাত্য নীতি : দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের সাফল্য সীমিত ছিল। আহমদনগরের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি মালিক অম্বর এক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং মুঘল সেনাবাহিনীকে বারবার পরাজিত করেন। যদিও শাহজাদা খুররমকে দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তা পুরোপুরি সফল হয়নি।

শিল্পকলা ও স্থাপত্য:

চিত্রকলা: জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল মুঘল চিত্রকলার স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। তিনি নিজে একজন শিল্পরসিক এবং চিত্র সমালোচক ছিলেন। তাঁর দরবারের বিখ্যাত চিত্রকরদের মধ্যে মনসুর (উদ্ভিদ ও প্রাণীর চিত্রণে পারদর্শী) এবং আবুল হাসান (পোর্ট্রেট ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রণে দক্ষ) অন্যতম।

স্থাপত্য: জাহাঙ্গীরের স্থাপত্যে তাঁর পিতা আকবরের প্রভাব দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হল: আগ্রার আকবরের সমাধি (সিকান্দ্রা)। আগ্রার ইতমাদ-উদ-দৌলার সমাধি: এটি সম্পূর্ণ শ্বেতপাথরে নির্মিত প্রথম মুঘল স্থাপত্য। এতে প্রথম 'পিয়েত্রা দুরা' (Pietra Dura) বা রঙিন পাথর খোদাই করে নকশা করার কৌশল ব্যবহৃত হয়।

সাহিত্য: জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' বা 'জাহাঙ্গীরনামা' (ফারসি ভাষায়) রচনা করেন। এটি মুঘল আমলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উৎস।

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন:

১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স এবং ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। তারা ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেন, যা ভবিষ্যতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ খুলে দেয়।

শাহজাহান (Shahab-ud-din Muhammad Khurram Shah Jahan)

রাজত্বকাল: ১৬২৮-১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ শাহজাহানের প্রকৃত নাম ছিল খুররম। তিনি 'শাহজাহান' উপাধির অর্থ 'জগতের অধিপতি' গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের "স্বর্ণযুগ" বলা হয়, বিশেষত স্থাপত্যের ক্ষেত্রে।

২.১. প্রারম্ভিক চ্যালেঞ্জ ও বিদ্রোহ: সিংহাসনে আরোহণের পরপরই তিনি বুন্দেলার জমিদার জুব্বার সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহী খান জাহান লোদির বিদ্রোহ দমন করেন, যা তাঁর শাসনের প্রাথমিক স্থিতিশীলতা প্রমাণ করে।

২.২. সামরিক অভিযান ও সাম্রাজ্য বিস্তার:

দাক্ষিণাত্য নীতি: শাহজাহান দাক্ষিণাত্য নীতিতে আরও আগ্রাসী ছিলেন। আহমদনগর: ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে আহমদনগর সম্পূর্ণরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজাপুর ও গোলকুন্ডা: এই দুটি রাজ্যকে মুঘলদের করদ রাজ্য হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত: তিনি কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, যা মুঘলদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের শাহের কাছে কান্দাহার চূড়ান্তভাবে হাতছাড়া হয়।

মধ্য এশিয়া অভিযান: মধ্য এশিয়ায় (বলখ ও বদখশান) মুঘল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এতে রাজকোষের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়।

স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ: শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর নির্মিত স্থাপত্যগুলি মুঘল স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি শ্বেতপাথর ও মার্বেলের ব্যাপক ব্যবহার করেন।

তাজমহল: আগ্রায় তাঁর প্রিয় স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মৃতিতে নির্মিত এই সৌধটি বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। এটি শ্বেতপাথরে নির্মিত এবং পিয়েত্রা দুরা শিল্পের এক অসাধারণ উদাহরণ। প্রধান স্থপতি ছিলেন উস্তাদ আহমেদ লাহোরি (ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে)।

ধর্মীয় নীতি: আকবর ও জাহাঙ্গীরের তুলনায় শাহজাহান ছিলেন কিছুটা বেশি রক্ষণশীল ও গোঁড়া সুন্নি মুসলিম। তিনি কিছু হিন্দু মন্দির ধ্বংসের আদেশ দেন এবং ধর্মান্তরের প্রতি উৎসাহ দেখান। তবে তিনি পুরোপুরি অসহিষ্ণু ছিলেন না।

উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও গৃহবন্দি (১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ): শাহজাহানের অসুস্থতার সুযোগে তাঁর চার পুত্রের (দারা শিকোহ, আওরঙ্গজেব, শাহ সুজা ও মুরাদ বখশ) মধ্যে সিংহাসন দখলের জন্য এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে আওরঙ্গজেব জয়ী হন এবং শাহজাহানকে আগ্রা দুর্গে গৃহবন্দী করেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দিল্লির স্থাপত্য:

লালকেল্লা: সম্পূর্ণ লাল বেলেপাথরে নির্মিত এই দুর্গটি মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেওয়ান-ই-আম (সাধারণের দরবার কক্ষ) এবং দেওয়ান-ই-খাস (ব্যক্তিগত দরবার কক্ষ)।

জামা মসজিদ: ভারতের বৃহত্তম মসজিদগুলির মধ্যে অন্যতম।

মতি মসজিদ: আগ্রা ফোর্টের মধ্যে অবস্থিত এটি একটি অপূর্ব শ্বেতপাথরের মসজিদ।

ময়ূর সিংহাসন: বিখ্যাত কোহিনূর হীরা খচিত এই সিংহাসনটি তাঁর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল, যা রাজকীয় ঐশ্বর্যের প্রতীক ছিল।

অর্থনীতি ও প্রশাসন:

শাহজাহানের সময়ে মুঘল অর্থনীতি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

তবে, তাঁর বিশাল স্থাপত্য নির্মাণ প্রকল্পগুলির কারণে রাজকোষে প্রচুর চাপ সৃষ্টি হয় এবং কৃষকদের উপর করের বোঝা বৃদ্ধি পায়।

আওরঙ্গজেব

আওরঙ্গজেবের সিংহাসন আরোহণ (১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ):

* উত্তরাধিকার যুদ্ধ: পিতা সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হওয়ার পর তার চার পুত্র – দারা শিকোহ, শাহ সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বক্তের মধ্যে ভয়াবহ উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয়।

* বিজয়ী: আওরঙ্গজেব তার ভাইদের পরাজিত ও হত্যা করে বা বন্দি করে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'আলমগীর' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার অসুস্থ পিতাকেও আত্মা দুর্গে বন্দি করে রাখেন।

২. আওরঙ্গজেবের সম্প্রসারণবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিসমূহ:

আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সাম্রাজ্যবাদী এবং একই সাথে গোঁড়া সুন্নি মুসলিম শাসক। তার নীতিগুলি সাম্রাজ্যের বিস্তারে সাহায্য করলেও, অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা তীব্র করে তোলে।

ক) ধর্মীয় নীতি (Religious Policy):

আকবরের উদার ধর্মীয় নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং শরিয়ত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।

জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন: ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি অমুসলিমদের উপর থেকে তুলে নেওয়া জিজিয়া কর (মাথাপিছু কর) পুনরায় চালু করেন। এর ফলে সাধারণ হিন্দু প্রজারা এবং রাজপুতরা বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হয়।

* তীর্থকর পুনঃ প্রবর্তন: হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর থেকে তুলে নেওয়া তীর্থকর আবার চালু করেন।

* মন্দির ধ্বংস: কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির, মথুরার কেশব রায় মন্দির সহ অসংখ্য মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ দেন।

* অমুসলিমদের উপর বিধিনিষেধ: হিন্দুদের মেলা, উৎসব, হোলি, দিওয়ালি উদযাপন নিষিদ্ধ করেন। দরবারে ঝারোখা দর্শন, নওরোজ উৎসব, গান-বাজনা নিষিদ্ধ করেন।

* ইসলামে ধর্মান্তরকরণ: অমুসলিমদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন প্রলোভন ও চাপ সৃষ্টি করেন। এর ফলে শিখ ও রাজপুতদের সঙ্গে তার দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত হয়।

* সরকারি চাকরিতে বৈষম্য: অমুসলিমদের সরকারি উচ্চপদ থেকে সরিয়ে মুসলিমদের নিয়োগ করতে শুরু করেন।

খ) দাক্ষিণাত্য নীতি (Deccan Policy)

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং একে "মুঘল সাম্রাজ্যের ক্যান্সার" বা "দক্ষিণের ঘা" (Deccan Ulcer) বলা হয়। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল দাক্ষিণাত্যের শিয়া রাজ্যগুলি (বিজয়পুর ও গোলকুন্ডা) এবং উদীয়মান মারাঠা শক্তিকে দমন করে সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা।

* মারাঠাদের সঙ্গে সংঘাত:

* শিবাজী (Shivaji): মারাঠা নেতা শিবাজী ছিলেন দাক্ষিণাত্যে এক শক্তিশালী স্বাধীন শক্তির প্রতীক। তিনি আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে মুঘলদের নাজেহাল করেন।

* আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খান এবং জয়সিংহকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠান। জয়সিংহের সঙ্গে শিবাজীর পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ) স্বাক্ষরিত হয়, যার দ্বারা শিবাজী ২৩টি দুর্গ মুঘলদের হাতে তুলে দেন এবং আওরঙ্গজেবের দরবারে যেতে রাজি হন।

গ) রাজপুত নীতি (Rajput Policy):

আকবরের রাজপুতদের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ নীতির পরিবর্তে আওরঙ্গজেব বিদ্বেষপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেন।

* মারওয়ারের রানা যশবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন এবং যশবন্ত সিংহের নাবালক পুত্র অজিত সিংকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। এর ফলে মেওয়ার ও মারওয়ারের রাজপুতদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়।

* মুঘলদের দীর্ঘদিনের অনুগত রাজপুতরা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে চলে যায়, যা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও রাজনৈতিক স্তম্ভকে দুর্বল করে দেয়।

ঘ) শিখ নীতি (Sikh Policy):

* শিখ গুরু তেগ বাহাদুরকে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে আওরঙ্গজেব ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে মৃত্যুদণ্ড দেন।

* এই ঘটনা শিখদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ (গুরু তেগ বাহাদুরের পুত্র) শিখদের একটি সামরিক জাতি 'খালসা'তে পরিণত করেন এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেন।

ঙ) অন্যান্য বিদ্রোহ:

আওরঙ্গজেবের নীতির কারণে জাট, সাতনামী, বুন্দেলা প্রমুখ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী বিদ্রোহ করে।

ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল একটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। পলাশি যুদ্ধের পর থেকে এই আন্দোলনের শুরু। নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য চান। এই ডাকে সাড়া দিয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাশিম পালিয়ে গেলেও ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। নবাবকে সাহায্য করার কারণে ইংরেজরা তাদের গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখতে থাকে।

চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী, ফকির-সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মীয় উৎসব, তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষে সারা বছর তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের হালকা অস্ত্র থাকত। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল স্বাধীন এবং মুক্ত। কিন্তু, ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতে থাকে। তীর্থস্থান দর্শনের ওপর করারোপ করে, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাছাড়া তাদের ডাকাত-দস্যু বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম ছিল মজনু শাহ। আর সন্ন্যাসীদের নেতার নাম ছিল ভবানী পাঠক। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাছারি ও নায়েব-গোমস্তার বাড়ি। ১৭৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে।

১৭৭১ সালে মজনু শাহ উত্তর বাংলায় ইংরেজবিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৭-১৭৮৬ সাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় ইংরেজদের সঙ্গে মজনু শাহ বহু সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁর যুদ্ধকৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি অর্থাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করে নিরাপদে সরে যাওয়া। ইংরেজদের পক্ষে তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ সালে মৃত্যুবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকির। এই নেতারা কয়েক বছর ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। ১৮০০ সালে তাঁরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। অপরদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠক ১৭৮৭ সালে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারীসহ নিহত হন। সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

তিতুমীরের সংগ্রাম

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমির চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যখন ওয়াহাবি আন্দোলনের জোয়ার চলছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে বারাসাত অঞ্চলে এই আন্দোলন তিতুমীরের নেতৃত্বে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলায় তার দুইটি ধারা প্রবহমান ছিল। যার একটি ওয়াহাবি বা মুহাম্মদিয়া আন্দোলন, অপরটি ফরাজিজি আন্দোলন নামে খ্যাত। উভয় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ নির্দেশ করা। বাংলার ওয়াহাবিরা তিতুমীরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত তারিখ-ই-মুহাম্মদিয়া বা ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত।

তিতুমির হজ্ব করার জন্য মক্কা শরিফ যান। ১৮২৭ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ধর্ম সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বহু মুসলমান বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক, তাঁতি সাড়া দেয়। ফলে, জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের ওপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং তাদের প্রতি নির্যাতনমূলক আচরণ শুরু করে। তিতুমির এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁর অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন। ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমির তাঁর প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন শক্তিশালী এক বাঁশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী।

ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমিরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে শাসক-শোষক জমিদারশ্রেণি কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমিরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালে তিতুমিরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমিরের নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান-বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমিরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলাবাহিনীতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। তিতুমির ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজদের গোলাবারুদ, নীলকর, জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তাঁর বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক। যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস জুগিয়েছে। উদ্ধুদ্ধ করেছে দেশপ্রেমিক হতে, প্রেরণা জুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নি মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমির চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যখন ওয়াহাবি আন্দোলনের জোয়ার চলছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে বারাসাত অঞ্চলে এই আন্দোলন তিতুমিরের নেতৃত্বে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলায় তার দুইটি ধারা প্রবাহমান ছিল। যার একটি ওয়াহাবি বা মুহাম্মদিয়া আন্দোলন, অপরটি ফরাজি আন্দোলন নামে খ্যাত। উভয় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ নির্দেশ করা। বাংলার ওয়াহাবিরা তিতুমিরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমিরের নেতৃত্বে পরিচালিত তারিখ-ই-মুহাম্মদিয়া বা ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শাহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত।

তিতুমির হজ্ব করার জন্য মক্কা শরিফ যান। ১৮২৭ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ধর্ম সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বহু মুসলমান বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক, তাঁতি সাড়া দেয়। ফলে, জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের ওপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং তাদের প্রতি নির্যাতনমূলক আচরণ শুরু করে। তিতুমির এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁর অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন। ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমির তাঁর প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন শক্তিশালী এক বাঁশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী।

ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমিরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে শাসক-শোষক জমিদারশ্রেণি কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমিরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালে তিতুমিরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমিরের নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান-বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমিরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলাবাহিনীতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। তিতুমির ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজদের গোলাবারুদ, নীলকর, জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তাঁর বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক। যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস জুগিয়েছে। উদ্ধুদ্ধ করেছে দেশপ্রেমিক হতে, প্রেরণা জুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নি

নীল বিদ্রোহ

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে। উপমহাদেশের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তারা এদেশের শাসক হয়ে ওঠে। তবে সব সময় তাদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল সজাগ। এই সজাগ ব্যবসায়িক বুদ্ধির কারণেই বাংলার উর্বর ফসলের ক্ষেতে তাদের দৃষ্টি পড়ে। তারা এই উর্বর ক্ষেতগুলোতে খাদ্য-ফসলের (খাবার ফসল) পরিবর্তে বাণিজ্য- ফসল (বাণিজ্যের জন্য যে ফসল) উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে

ওঠে। নীল ছিল তাদের সেই বাণিজ্যিক ফসল। ঐ সময়ে নীল ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। বস্ত্র শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানকার নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলা হয়ে ওঠে নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে নীল চাষ শুরু হয়।

নীল চাষের জন্য নীলকরা কৃষকের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিত। কৃষকদের নীল চাষের জন্য অগ্রিম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশপরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না। নীল চাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের। ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীল চাষের খরচও বৃদ্ধি পায়। নীলকররা বিষয়টি বিবেচনায় রাখত না। তাছাড়া, প্রথম দিকে তারা চাষিদের বিনামূল্যে নীল বীজ সরবরাহ করলেও পরের দিকে তাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নীল চাষ অব্যাহত রাখা চাষিদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

উপর্যুক্ত বঞ্চনার হাত থেকে চাষিদের বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। আইন ছিল তাদের নাগালের বাইরে। আইন যারা প্রয়োগ করবেন, সেসব বিচারকের বেশির ভাগ ছিলেন নীলকরদের স্বদেশি বা বন্ধু। আবার নীলকররাও অনেক সময় নিজেরাই অবৈতনিক (অনারারি) ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ পেতেন। ফলে, আইনের আশ্রয় বা সুবিচার পাওয়া চাষির জন্য ছিল অসম্ভব। এমতাবস্থায় নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয় দোদুল প্রতাপশালী এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার রূপেও আত্মপ্রকাশ করে। এরা এতটাই নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, অবাধ্য নীলচাষিকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি।

শেষ পর্যন্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীল চাষিরা ১৮৫৯ সালে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এসব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীলচাষিরাই। যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেণী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলিতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই। স্থানীয় পর্যায়ে এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কৃষকরা নীল চাষ না করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশও অগ্রাহ্য করে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীলচাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি ছাপা হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের কাহিনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত বাংলার সংগ্রামী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ সরকার ইণ্ডিগো কমিশন' বা 'নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের 'ইচ্ছাধীন' বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া ইণ্ডিগো কন্ট্রাক্ট বাতিল হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তীকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ সালে এদেশে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

ফরায়েজি আন্দোলন

ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলার শাসশাইল গ্রামে ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্মের ওপর লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি বুঝতে পারেন যে, বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার প্রবেশ করেছে। ইসলাম ধর্মকে কুসংস্কার আর অনাচারমুক্ত করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এই প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি এক ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের নামই 'ফরায়েজি আন্দোলন'।

'ফরায়েজি' শব্দটি আরবি 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে এসেছে। যারা ফরজ পালন করেন তাঁরাই ফরায়েজি। আর বাংলায় যাঁরা হাজী শরীয়তউল্লাহর অনুসারী ছিলেন, ইতিহাসে শুধু তাদেরকেই ফরায়েজি বলা হয়ে থাকে। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয়, তা পালন করার জন্য তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান। তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পারেননি। তিনি ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' অর্থাৎ 'বিধর্মী দেশ' বলে ঘোষণা করেন। তিনি বিধর্মী-বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য তাঁর অনুসারী মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বাংলার শোষিত, নির্যাতিত দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতি, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। শরীয়তউল্লাহর ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আস্থা, বিশ্বাস, তাঁর অসাধারণ সাফল্য নিম্নশ্রেণির জনগণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে জমিদাররা বাধা প্রদান করতে থাকে। তিনি প্রজাদের অবৈধ কর দেয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন এবং জমিদারদের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নেন। দেশজুড়ে অভাব দেখা দিলে তিনি নুন-ভাতের দাবিও উত্থাপন করেন। জমিদারশ্রেণি নানা অজুহাতে ফরায়েজি প্রজাদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে প্রজাদের রক্ষার জন্য তিনি লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৩৯ সালে তাঁর ওপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৮৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর যোগ্য পুত্র মুহম্মদ মুহসিন উদ্দিন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া। তিনি ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মতো পণ্ডিত না হলেও তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন একাধারে ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকশ্রেণির শোষণ মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। যার ফলে এই আন্দোলনের চরিত্র শেষ পর্যন্ত শুধু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ইংরেজ শাসকদের চরম অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত বাংলার কৃষক এই আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণবিরোধী প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। নীলকর সাহেবদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য হাজার হাজার কৃষক ও শত শত জমিদার ফরায়েজি আন্দোলনে যোগদান করেন।

দুদু মিয়া ছিলেন ফরায়েজিদের গুরু বা ওস্তাদ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শান্তিপ্রিয় নীতি পরিহার করে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। ফরায়েজিদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি নিজে লাঠি চালনা শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতার আমলের লাঠিয়াল জালালউদ্দিন মোল্লাকে সেনাপতি নিয়োগ করে তিনি এক সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অবৈধ কর আরোপ এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। এখানে উল্লেখ্য, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে নীল চাষের জন্য ছিল উৎকৃষ্ট। সুতরাং এ অঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রাও ছিল দুঃসহ। তাঁর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছিল। কৃষক প্রজাসাধারণকে নিয়ে স্বাধীন সরকারের একটা সেনাবাহিনীও (লাঠিয়াল বাহিনী) গঠন করা হয়েছিল।

ফরায়েজিদের সরকার ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলাকে কতকগুলো হলকা বা এলাকায় বিভক্ত করা হয়। দুদু মিয়া তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী জমিদার, নীলকর সরকারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চালিয়ে যান। দেশীয় জমিদাররা বিদেশি ইংরেজ সরকার ও নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে থাকে। কিন্তু দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষী না পেয়ে বারবার তাঁকে মুক্তি দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে ইংরেজ সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ভীত ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে কোলকাতার কারাগারে আটকে রাখে। ১৮৬০ সালে তিনি মুক্তি পান এবং ১৮৬২ সালে এই দেশপ্রেমী বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফরায়েজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে

যুদ্ধ

১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধের নকশা

মীর কাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগল সম্রাট শাহ আলম সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। [৪] ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর তাদের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর সাথে বিহারের বক্সার নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১৭,০৭২ জন, [৫] যার মধ্যে ১,৮৫৯ জন ব্রিটিশ নিয়মিত, ৫,২৯৭ জন ভারতীয় সিপাহী এবং ৯,১৮৯ জন ভারতীয় অশ্বারোহী ছিলেন। জোট সেনাবাহিনীর সংখ্যা ৪০,০০০ এরও বেশি বলে অনুমান করা হয়েছিল। অন্যান্য সূত্র অনুসারে, মুঘল, আওধ এবং মীর কাসিমের সম্মিলিত সেনাবাহিনী ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিল। [৬]

প্রধান তিনটি ভিন্ন মিত্রদের মধ্যে মৌলিক সমন্বয়ের অভাব তাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য দায়ী ছিল। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজেরা জয়লাভ করে। মীর কাসিম কয়েক বছর অজ্ঞাত অবস্থায় ঘুরে বেড়ান। ১৭৭৭ সালে দিল্লির কাছে এক জায়গায় তার মৃত্যু হয়। বক্সার যুদ্ধের পর ইংরেজেরা অযোধ্যাও দখল করে নেয়। সুজাউদ্দীন রোহিলাখণ্ডে আশ্রয় নেন। এমন প্রেক্ষাপটে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ছিল এটির অংশ।

তারিখ ২২ অক্টোবর (N.S.), ১৭৬৪

অবস্থান বক্সারের নিকটে

ফলাফল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয়

দেওয়ানি লাভ

১৭৬৫ সালে মীর জাফরের মৃত্যুর পর তার পুত্র নাজিম-উদ-দৌলাকে শর্ত সাপেক্ষে বাংলার সিংহাসনে বসানো হয়। শর্ত থাকে যে, তিনি তার পিতার মতো ইংরেজদের নিজস্ব পুরাতন দস্তক অনুযায়ী বিনা শুক্রে অবাধ বাণিজ্য করতে দেবেন এবং দেশীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা বাতিল করবেন। এ সময়ে ইংরেজ কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্থাৎ দেওয়ানি লাভ করে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজরাই বাংলার সত্যিকার শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

মুর্শিদ কুলি খানের পূর্ব পর্যন্ত দেওয়ান এবং সুবেদার পদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হতো। মুর্শিদ কুলি খান এই প্রথা ভঙ্গ করে দুইটি পদ একাই দখল করে নেন। তাঁর সময় কেন্দ্রে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো হলেও পরবর্তীকালে অনেকেই তা বন্ধ করে দেয়। আলীবর্দি খানের সময় থেকে একেবারেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট কোম্পানিকে বার্ষিক উপঢৌকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণের অনুরোধ করেন। কিন্তু এই অনুরোধ কোম্পানি তখন গ্রাহ্য করেনি। বঙ্গারের যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

ক্লাইভ দেশ থেকে ফিরে প্রথমেই পরাজিত অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লির সম্রাটের দিকে নজর দেন। তিনি অযোধ্যার পরাজিত নবাবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। বিনিময়ে আদায় করে নেন কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুইটি। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। অপরদিকে তিনি দেওয়ানি শর্ত সংবলিত দুইটি চুক্তি করেন। একটি দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে। এতে কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি দান করা হয়। এর বিনিময়ে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নবাব প্রতিবছর সম্রাটকে পাঠাবেন। এই টাকা নিয়মিত পাঠানোর জামিনদার হবে কোম্পানি।

অপর চুক্তিটি হয় মীর জাফরের নাবালক পুত্র নবাব নাজিম-উদ-দৌলার সঙ্গে। বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবাব কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সকল শর্ত মেনে নেন। এই চুক্তিদ্বয়ের ফলে কোম্পানির ক্ষমতা একচেটিয়া বৃদ্ধি পায়। নবাব তখন বস্তুত কোম্পানির পেনশনার মাত্র। সম্রাটও তাই। সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে। দেওয়ানি থেকে যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানির যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব। সুতরাং দেওয়ানির গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে হয় যে-

দেওয়ানি লাভ কোম্পানির শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশাল বিজয়।

সম্রাট ও নবাব উভয়েই ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন। প্রকৃতপক্ষে তারা হয়ে যান কোম্পানির পেনশনভোগী কর্মচারী।

দেওয়ানি লাভের ফলে এবং নবাব কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী শুল্কহীন বাণিজ্যের কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের অর্থলোভ দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে দেশীয় বণিকশ্রেণি, সাধারণ মানুষ। তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে।

দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। এর পরিমাণ এতটাই ছিল যে, এই অর্থের বলে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

রবার্ট ক্লাইভ দেওয়ানি সনদের নামে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করে। দিল্লি কর্তৃক বিদেশি বণিক কোম্পানিকে এই অভাবিত ক্ষমতা প্রদানে সৃষ্টি হয় দ্বৈত শাসনের। অর্থাৎ কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাব পরিণত হন ক্ষমতাহীন শাসকে। অথচ নবাবের দায়িত্ব থেকে যায় ষোলোআনা। ফলে বাংলায় এক অভূতপূর্ব প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়, যার চরম মাসুল দিতে হয় এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে।

১৭৭০ সালে (১৭৭৬ বঙ্গাব্দ) গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যা ইতিহাসে **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর** নামে পরিচিত। কোম্পানির মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি রিচার্ড বেচারের ভাষায় 'দেশের কয়েকটি অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাহা গুজব নয়, অতি সত্য।' এই দুর্ভিক্ষে বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৭৬৫-৭০ সালে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যা ছিল, দুর্ভিক্ষের বছরও আদায় প্রায় তার কাছাকাছি ছিল। ফলে চরম শোষণ-নির্যাতনে বাংলার মানুষ হতদরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়ে। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় নবাবের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় প্রশাসন পরিচালনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। সারাদেশে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান। তিনি হন প্রথম গভর্নর জেনারেল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

কোম্পানির শাসন দুর্নীতিমুক্ত ও সুসংগঠিত করতে ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসকে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ বছর ২২শে মার্চ নির্দিষ্ট রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা জমিদারদের নিজ নিজ জমির ওপর স্থায়ী মালিকানা দান করে যে বন্দোবস্ত চালু করা হয়, তাকেই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলা হয়।

রবার্ট ক্লাইভ, লর্ড

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম সেনানায়ক। রবার্ট ক্লাইভ (সেপ্টেম্বর ২৯, ১৭২৫ - নভেম্বর ২২, ১৭৭৪) ছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাপতি এবং ধূর্ত ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী। তিনি ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করেন। তার উপাধি ছিল পলাশীর প্রথম ব্যারন। পলাশীর যুদ্ধে তার নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাদল বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদলকে পরাজিত করে এবং তিনি ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর ছিলেন।

১৭৬০ থেকে ১৭৬৫ সাল, এই পাঁচ বছর ক্লাইভ ছিলেন ইংল্যান্ডে। এই সময় কোম্পানির শাসনে চরম বিশৃঙ্খলা, লোভ, দুর্নীতি ও ক্ষমতার দখলবাজি দেখা যায়। ক্লাইভ তখন ব্রিটেনে নিজের জাগিরের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য লড়াই করছিলেন। এই জাগির ছিল বছরে ২৩ হাজার পাউন্ডের আয় (আজকের হিসেবে প্রায় ৩ মিলিয়ন পাউন্ড), মীরজাফর তাকে উপহার দিয়েছিলেন, আর মুঘল সম্রাট তাকে 'মনসবদার' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

লন্ডনে ফিরে ক্লাইভ রাজা ও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুনরায় সাদরে গ্রহণ পেলেন। সামরিক ক্ষেত্রে তার খ্যাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে জর্জ তৃতীয় রাজা বলেছিলেন, "যদি কেউ যুদ্ধশিক্ষা নিতে চায়, তাহলে সে ক্লাইভের কাছে যাক।" পিট দ্য এল্ডারও তাকে সংসদে বর্ণনা করেছিলেন 'স্বর্গপ্রদত্ত জেনারেল' হিসেবে।

ওয়ারেন হেস্টিংস

(ইংরেজি: Warren Hastings; ৬ই ডিসেম্বর, ১৭৩২ - ২২শে আগস্ট, ১৮১৮) ছিলেন বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল।

১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিং কলকাতা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

হেস্টিংসের সংস্কার

হেস্টিংস যখন ভারতে আসেন তখন আদর্শ শাসনব্যবস্থার কোনো দৃষ্টান্ত তার কাছে ছিল না। তাই শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে হেস্টিংসের শাসনকাল অতিবাহিত হয়েছিল। নিজ প্রতিভা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরে তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার যে রূপরেখা রচনা করে যান, প্রধানত তার উপরে ভিত্তি করে পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ এক বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। পার্সিভ্যাল ও স্পীয়ারের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায়, "যদি ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন, তবে ওয়ারেন হেস্টিংস তাকে সংগঠিত করে একটি কার্যকরী সংস্থায় পরিণত করেছিলেন, আর কর্নওয়ালিশ আপন চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী তাকে একটি সুসংহত ও সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেছিলেন।" ওয়ারেন হেস্টিংস তার আমলে প্রথমেই দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা লোপ করা হয় ও শাসনব্যবস্থা কোম্পানির তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন।

উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন।

রাজস্ব আদায়কারী অত্যাচারী রেজা খাঁ ও সিঁতা বরায়কে পদচ্যুত করে কালেক্টর নামক এক কেন্দ্রীয় কর্মচারীর হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার দেন।

রাজকোষের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য তিনি রাজকোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন।

হেস্টিংস রাজস্ব বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের জন্য 'আমিনি কমিশন' নামে এক সংস্থা স্থাপন করেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি কালেক্টর পদের পুনঃপ্রবর্তন করেন।

কোম্পানির কর্মচারীরা যাতে বাদশাহ প্রদত্ত দস্তকের অপব্যবহার ও বিনা শুদ্ধে ব্যবসা না করতে পারেন সে দিকে হেস্টিংস কড়া নজর রাখতেন।

কোম্পানির ব্যয় সংকোচনের জন্য তিনি দিল্লির মোগল বাদশাহ এবং বাংলার নবাবের বার্ষিক ভাতার পরিমাণ হ্রাস করেন।

এই ভাবে ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কলকাতার গভর্নর জেনারেল ও তার সুপ্রীম কাউন্সিলের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, যা ভারতের কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থার সূচনা করে। এছাড়াও নবজাগরণের তার ভূমিকা ছিল ব্যাপক।

কর্নওয়ালিস, লর্ড চার্লস

(১৭৩৮-১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দ)

ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি'র অধীনস্থ বাংলার দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল। উল্লেখ্য প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি'র প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার রূপকার। কর্নওয়ালিস সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রথম বিধি বিধান চালু করেন। পরবর্তীকালে, গর্ত ক্যানিং এর সময়ে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস নামে প্রচলিত হয়। তিনি ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় দশ শালা বন্দোবস্ত চালু করেন। ১৭৯৩ সালে তিনি দশ শালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা দেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিক হয় জমিদারগণ। সূর্য্যাপ্ত আইনের কারণে নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে জমিদারি নিলামে তোলা হত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল ব্রিটিশ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রবর্তিত একটি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের হাত ধরে বাংলায় এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির জন্য একটি নির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল রাজস্বের উৎস নিশ্চিত করা। এই ব্যবস্থার অধীনে, জমিদাররা জমির চিরস্থায়ী মালিকানা লাভ করেন এবং একটি নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকেন।

লর্ড ওয়েলেসলি

- সাম্রাজ্য বিস্তারে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক গৃহীত নীতির নাম অধীনতামূলক মিত্রতা।
- টিপু সুলতানের সাথে লর্ড ওয়েলেসলির যুদ্ধ হয় ১৭৯৯ সালে।
- তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা (১৮০০ খ্রিস্টাব্দে)।
- ভারতে ওয়েলেসলির শাসনামলে সম-সাময়িক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (ফ্রান্স)।

ডেভিড হেস্টিংস

ডেভিড হেস্টিংস ১৮১৭ সালে কলকাতা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গ (১৮৩৩-১৮৩৫)

১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গ সতীদাহ প্রথা বাতিল করেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গ রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগিতা লাভ করেন জঘন্য সতীদাহ প্রথা সংস্কারে ১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সর্বপ্রথম ম্যাকলে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেন বেন্টিন্গ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গ সরকারি অফিস আদালতে ফারসি ভাষার বদলে ইংরেজি ভাষা চালু করেন।

লর্ড ডালহৌসি(১৮৪৮-১৮৫৬)

- সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসি "স্বত্ব বিলোপ নীতি" প্রবর্তন করেন।
- ১৮৫০ সালে প্রথম কলকাতায় টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন।
- ১৮৫৩ সালে তিনি উপমহাদেশে প্রথম রেলপথ ব্যবস্থা চালু করেন (হাওরা-হুগলি)।
- বাংলাদেশে প্রথম রেলপথ স্থাপন করেন ১৯৬২ সালে (দর্শনা-কুষ্টিয়া)।
- বিশ্বের প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় লন্ডনে ১৮২৫ সালে।
- ১৮৫৬ সালে (The Hindu Widows Re-marriage Act) পাস করে।
- হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

স্বত্ববিলোপ নীতি

স্বত্ববিলোপ নীতি (Doctrine of Lapse) হলো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি সংযুক্তি নীতি, যা লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তন করেন। এই নীতির মাধ্যমে কোনো দেশীয় রাজার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী (পুরুষ উত্তরসূরি) না থাকলে, তার রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যেত। এই নীতিটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের একটি কৌশল ছিল এবং এর ফলে ব্রিটিশরা সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুরসহ অনেক রাজ্য সরাসরি দখল করে নেয়, যা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের একটি অন্যতম কারণ ছিল।

ক্যানিং (১৮৫৮-১৮৬২)

- উপমহাদেশের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ক্যানিং ।
- ক্যানিং উপমহাদেশের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন ।
- তিনি উপমহাদেশে কাগজের মুদ্রা চালু করেন- ১৮৫৭ সালে ।
- ক্যানিং এর আমলে ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশে সিপাহি বিদ্রোহ হয় ।
- ১৮৬১ সালে লর্ড ক্যানিং উপমহাদেশে পুলিশ সার্ভিস ও ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস চালু করেন ।
- জমিদারদের থেকে রায়তদের রক্ষার্থে (Tenancy Act 1885) পাশ করেন ।
- লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-১৮৭২)
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারি পরিচালিত হয় লর্ড মেয়ো এর সময় ।
- প্রথম আদমশুমারি পরিচালিত হয় ১৮৭২ সালে ।
- লর্ড মেয়ো একমাত্র ভাইসরয় যিনি খুন হন ।
- লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০)
- লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালে অস্ত্র আইন (The Arms Act) পাশ করেন ।
- তিনি ১৮৭৮ সালে সংবাদপত্র আইন (Vernacular Press Act) করে কথা বলার অধিকার হরণ করে ।

লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪)

- লর্ড রিপন ১৮৮১ সালে শ্রমিক কল্যাণের জন্য ফ্যাক্টরি আইন চালু করে ।
- ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারকে চেয়ারম্যান করে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন লর্ড রিপন ।
- সংবাদপত্র আইন রহিত করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন ।
- ভারতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তক লর্ড রিপন ।
- তিনি ইলবার্ট বিল পাশ করেন ।
- Judge me by my acts and not by my words -লর্ড রিপন

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)

- ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় লর্ড কার্জন এর সময়কালকে ।
- ১৯০৪ সালে তিনি কার্জন হল প্রতিষ্ঠা করেন ।
- ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করে লর্ড কার্জন ।
- ভারতের বৃহত্তম লাইব্রেরি ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি (কলকাতা)প্রতিষ্ঠা করেন ।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬)

- বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ ।
- ১৯১১ সালে ১২ ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লিতে আগমন উপলক্ষে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় ।
- তিনি ১৯১১ সালে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করেন ।
- ১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নাথান কমিশন (১৩) গঠন করেন ।
- ১৯১২ সালে সারদা পুলিশ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন লর্ড হার্ডিঞ্জ ।
- ১৯১৫ সালে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (রেলসেতু) নির্মাণ করেন ।

চেমস (১৯১৬-১৯২১)

- মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন (১৯১৯) প্রণীত হয় যা ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত ।
- এই আইন মোতাবেক, কেন্দ্রীয় আইনসভা ছিল দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ।
- দ্বৈতশাসন নীতি কার্যকর থাকলেও গভর্নরের হাতে ছিল প্রকৃত ক্ষমতা ।
- এজন্য জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবী পূরণ হয়নি ।

লর্ড রিডিং (১৯২১-১৯২৬)

- লর্ড রিডিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২১ সালে।
- লর্ড আরউইন (১৯২৬-১৯৩১)
- লর্ড আরউইন সাইমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২৭ সালে।
- তিনি প্রথম গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন করেন ১৯৩০ সালে।

উইলিংডন (১৯৩১-১৯৩৬)

- উইলিংডন ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) প্রণয়ন করেন।

লর্ড লিনলিথগো (১৯৩৬-১৯৪৩)

- লর্ড লিনলিথগো প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন প্রদান করেন ১৯৩৭ সালে।
- লর্ড লিনলিথগো উপমহাদেশে ক্রিপস মিশন (১৯৪২) প্রেরণ করে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন (মারচ-আগস্ট, ১৯৪৭)

- ১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষকে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র করার পরিকল্পনা করেন, যা 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত।
- তিনি সাইরিল ব্র্যাডক্রিফকে দুটি সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান করেন।
- ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ হয়।

নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

রাজা রামমোহন রায়।

বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ সালে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বিশেষ করে আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসারসহ উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে তুফাতুল মুজাহহিদীন (একেশ্বরবাদ সৌরভ), মনজারাতুল আদিয়ান (বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি সম্বাদ কৌমুদী, মিরাতুল আখবার ও ব্রাহ্মণিকাল ম্যাগাজিন নামে তিনটি পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন। আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি সব কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে আত্মীয় সভা নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ সালে ২০শে আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন। তাঁর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজন ইংরেজি শিক্ষার। এ কারণে তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯২৩ সালে প্রস্তাবিত সরকারি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। রাজা রামমোহন ১৮২২ সালে কোলকাতায় 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইংরেজি, দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। এ দেশের মানুষকে সংস্কৃত শিক্ষার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহাস্টকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্যও আবেদন করেন। ১৮৩৩ সালে ভারতীয় রেনেসাঁর স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পর ১৮৩৫ সালে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়। ভারতীয়দের পাশ্চাত্য ভাষা ইংরেজিতে শিক্ষা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

“ইয়াং বেঙ্গল”

হেনরি লুই ডিরোজিও ১৮০৯ সালের ১৮ই এপ্রিল কোলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন পর্তুগিজ এবং মা ছিলেন বাঙালি। ডিরোজিও ইংরেজি শিক্ষার স্কুল ডেভিড ড্রামন্ডের ধর্মতলা একাডেমিতে পড়ালেখা শুরু করেন। স্কুলে প্রধান শিক্ষক ড্রামন্ড ছিলেন প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ মানবতাবাদী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান শিক্ষক। এই শিক্ষকের আদর্শ ডিরোজিওকে

তাঁর শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রভাবিত করে রেখেছিল। যে কারণে পরবর্তীকালে তিনি হতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি ছিলেন ‘রেনেসাঁ’ যুগে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী “ইয়াং বেঙ্গল” আন্দোলনের প্রবক্তা। বয়সে তরুণ হলেও তিনি ইতিহাস, ইংরেজি, সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি, বাগ্মিতা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা তৎকালীন তরুণ সমাজকে ব্যাপক প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অসাধারণ মেধা আর অধ্যবসায়ের গুণে তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ঐ বয়সে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতের দায়িত্ব লাভ করেন। একই সঙ্গে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বও পালন করেন।

কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোযোগী হন। বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করেন। তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেন। এ জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। শিশুদের লেখাপড়া সহজ করার জন্য তিনি রচনা করেন বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে সহজ করার জন্য তিনি ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করেন। তাছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন।

শুধু সাহিত্য নয়, শিক্ষা বিস্তারে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার, বাংলা শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। তাছাড়া স্কুল পরিদর্শক থাকাকালে গ্রামে-গঞ্জে ২০টি মডেল স্কুল, ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোর ইমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন। এখন এটি বিদ্যাসাগর কলেজ নামে খ্যাত। তিনি একজন সফল সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। দেশে প্রচলিত নানা ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। তিনি কন্যাশিশু হত্যা, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তিনি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের পক্ষে কঠোর অবস্থান নেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ১৮৫৬ সালে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়।

বিদ্যাসাগর দান-দাক্ষিণ্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। এ কারণে তাঁকে দয়ার সাগরও বলা হতো।

হাজী মুহম্মদ মহসীন

১৭৩২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ। মায়ের নাম ছিল জয়নাব খানম। তাদের আদি নিবাস ছিল পারস্যে। হাজী মুহম্মদ মহসীনের পূর্বপুরুষ ভাগ্য অন্বেষণে হুগলী শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। মহসীনের শিক্ষাজীবন শুরু হুগলীতে। তাঁর গৃহশিক্ষক আগা সিরাজি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তাঁর কাছে আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। ভোলানাথ ওয়াদ নামে একজন সঙ্গীতবিদের কাছে সঙ্গীত সেতার বাজানো শেখেন। তাঁর উচ্চশিক্ষা শুরু হয় মুর্শিদাবাদে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি হুগলী ফিরে আসেন এবং ১৭৬২ সালে দেশ ভ্রমণে বের হন। তিনি মক্কা, মদিনা গমন করেন এবং পবিত্র হজ পালন করেন। আরব, মিশর, পারস্য ভ্রমণ করে তিনি সাতশ বছর পর দেশে ফিরে আসেন। আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি এবং ইতিহাস ও বীজগণিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮০৩ সালে তাঁর একমাত্র বোনের মৃত্যু হলে নিঃসন্তান বোনের বিশাল সম্পত্তির মালিক হন তিনি। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তখন বাংলার মুসলমানদের ছিল চরম দুর্দিন। অর্থ ব্যয় করে লেখাপড়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তিনি তাঁর সমুদয় অর্থ শিক্ষা বিস্তার চিকিৎসা এবং দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করেন।

তিনি হুগলীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দান করেন। মৃত্যুর ছয় বছর পূর্বে ১৮০৬ সালে একটি ফান্ড গঠন করে জনহিতকর কার্যে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। মহসীন ফান্ডের অর্থে তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩৬ সালে হুগলী মহসীন ফান্ড, হুগলী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১৮৪৮ সালে হুগলীতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহসীন ফান্ডের বৃত্তির অর্থে হাজার হাজার মুসলমান তরুণ উচ্চ-শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এর মধ্যে বাংলার মুসলমান সমাজকে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁদের অগ্রদূত সৈয়দ আমির আলীও ছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর মৃত্যুর পরও বাঙালি মুসলমানদের জন্য শিক্ষার পথ সুগম করে যান। এই দানশীল বিদ্যানুরাগী মহাপুরুষ ১৮১২ সালে ২৯শে নভেম্বর হুগলীতে পরলোকগমন করেন।

আবদুল লতিফ

১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে কোলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৭ সালে তাকে কোলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৮৪ সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তাঁর কৃতিত্বের জন্য সরকার তাঁকে প্রথমে খান বাহাদুর ও পরে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজন এবং তাদের ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারেন। তাই তিনি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ সালে 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শীর্ষক এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কোলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। সেখানে উর্দু, বাংলা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে মুসলমান ছাত্রদের সমস্যার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হলে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে ১৮৭৩ সালে মহসীন ফান্ডের টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষায় ব্যয় হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৮৬৩ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ।

সৈয়দ আমির আলি।

উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে বাংলার মুসলমান সমাজের নবজাগরণে যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তিনি হলেন সৈয়দ আমির আলি। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতি করতে চেয়েছেন। পাশাপাশি তিনি তাদের রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করতে চেয়েছেন। সৈয়দ আমির আলি ১৮৪৯ সালে হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৩ সালে লন্ডনের লিংকল ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৯ সালে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন।

বাংলা তথা ভারতে তিনিই প্রথম মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ সালে কোলকাতায় 'সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। ফলে ১৮৮৫ সালে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি ১৮৮৪ সালে কোলকাতায় মাদ্রাসায় কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা এবং করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন।

তাঁর বিখ্যাত দুইটি গ্রন্থ 'The Spirit of Islam' এবং 'A Short History of the Saracens'-এ ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আধুনিক ভারতের উন্নতির জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান। ১৯১২ সালে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সৈয়দ আমির আলি নারী অধিকারের বিষয়েও সচেতন ছিলেন।

বেগম রোকেয়া

১৮৮০ সালে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলি সাবের। মায়ের নাম মোসাম্মৎ বাহাতননেসা সাবেরা চৌধুরানি। ঐ অঞ্চলে সাবের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং রক্ষণশীল। মেয়েরা ছিল খুবই পর্দানশিন। বেগম রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের এবং বড় বোন করিমুন্নেসার কাছে শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর “অবরোধবাসিনী”, ‘পদ্মরাগ’, ‘মতিচূর’, ‘সুলতানার স্বপ্ন’ প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে। বিবাহিত জীবনে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে জ্ঞানচর্চার উৎসাহ লাভ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর জীবনের বাকি সময়টা নারী শিক্ষা আর সমাজসেবায় ব্যয় করেন। তিনি স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল

উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩১ সালে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নীত হয়। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৬ সালে কোলকাতায় আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্বে সমিতি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার মনে নারীর প্রতি অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ছিল তীব্র ক্ষোভ ও বিদ্রোহের সুর। তিনি কর্মের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ১৯৩২ সালে এই মহীয়সী নারী কোলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন

পলাশি যুদ্ধের একশ' বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহীদের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা, সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ- এসবই এই সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। নিম্নে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

রাজনৈতিক : পলাশি যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য বিস্তার, একের পর এক দেশীয় রাজ্যগুলো দখল, দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীতি, অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, বাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। তাছাড়া অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। এসব ঘটনায় দেশীয় রাজন্যবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

সামরিক : সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে পদবি এবং বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তার ওপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে উভয়ই ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম : বিদ্রোহের আগুন প্রথমে জ্বলে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহি। দ্রুত এই বিদ্রোহ মিরাত, কানপুর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এই বিদ্রোহে शामिल হয়। বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের বাদশা বলে ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নানা সাহেব, বাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোদ্ধার বেগম হজরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লাহসহ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গ। বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সিপাহি ও যুদ্ধরত বিদ্রোহী নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হন। এই সংগ্রামে জড়িত অধিকাংশই যুদ্ধে শহিদ হন, বাকিদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (মিয়ানমার) নির্বাসিত করা হয়। রানি লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে নিহত হন। নানা সাহেব পরাজিত হয়ে অন্তর্ধান করেন। সাধারণ সৈনিক বিদ্রোহীদের ওপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক সৈনিকের লাশ। এ ধরনের বীভৎস ঘটনা ঘটিয়ে শাসকগোষ্ঠী জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে। ফলে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৮৫৮ সালের জুলাইয়ের মধ্যে সব আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। তবে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব : এই বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক গুরুত্বও ছিল। এর ফলে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়। এরপর থেকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়। তাছাড়া এই ঘোষণাপত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। এই বিদ্রোহের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব হচ্ছে এই বিদ্রোহের ক্ষোভ থেমে যায়নি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ সচেতন হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

বঙ্গভঙ্গ

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু- মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যায়। একে অপরকে শত্রু ভাবতে শুরু করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। নেতাদের উদার প্রচেষ্টা, যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচির ফলে মাঝে মাঝে একেবারে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিভেদ নীতিরই জয় হয়। উল্লেখ্য, উপনিবেশগুলোতে ব্রিটেন 'ভাগ কর ও শাসন কর' (Divide and Rule) নীতি অনুসরণ করত। পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ হয়। জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি নতুন রাষ্ট্রের।

বঙ্গভঙ্গ পটভূমি :

ভারতের বড় লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এই বিভাজিত ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। ভাগ হবার পূর্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। বঙ্গভঙ্গের এই পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন অনেক বড় হওয়ার কারণে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারি মহলে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯০৪ সালে ভারত সচিব এটি অনুমোদন করেন এবং ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। এই বছর অক্টোবরে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ। প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কোলকাতা।

বঙ্গভঙ্গের কারণ :

বঙ্গভঙ্গের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল, যা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো- প্রশাসনিক কারণ : লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। উপমহাদেশের এক- তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সিতে। কোলকাতা থেকে পূর্বাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল কঠিন কাজ। যে কারণে লর্ড কার্জন এত বড় অঞ্চলকে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে রাখা যুক্তিসংগত মনে করেননি। তাই ১৯০৩ সালে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯০৫ সালে তা কার্যকর হয়।

আর্থ-সামাজিক কারণ : বাংলা ভাগের পেছনে আরো কারণ ছিল যার একটি অর্থনৈতিক, অপরটি সামাজিক। তখন কোলকাতা হয়ে উঠেছিল আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। শিল্প, কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতাকে ঘিরে। যা কিছু উন্নতি অগ্রগতি, সবই ছিল কোলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে, পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যাহত হয়। অথচ এখান থেকে যে কাঁচামাল সরবরাহ করা হতো তার জন্যও সুষ্ঠু যোগাযোগব্যবস্থা ছিল না। ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারায় এ অঞ্চলের লোকজন অশিক্ষিত থেকে যায়। কর্মহীনের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। এ অবস্থার কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন ছিল।

রাজনৈতিক কারণ : লর্ড কার্জন শুধু শাসন-সুবিধার জন্য বা পূর্ব বাংলার জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গ করেননি। এর পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কংগ্রেস নেতারা কোলকাতা থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। সুতরাং কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তি, এক্যবদ্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপজ্জনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হলো, অপরদিকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবেই কার্জন 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে যতটা না পূর্ব বাংলার কল্যাণে, তার চেয়ে বেশি ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলা ভাগ করেন। এভাবে কৌশলে ভারতীয় জাতীয় এক্যকে দুর্বল করার ব্যবস্থা করা হলো।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া : বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলোও বঙ্গ বিভাগে সন্তোষ প্রকাশ করে। নতুন প্রদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাবে এ আশায় তারা বঙ্গভঙ্গের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করে।

অপরদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এর পেছনের কারণ সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন উঁচুতলার মানুষ অর্থাৎ পুঁজিপতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, জমিদার, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক, রাজনীতিবিদদের স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে এরা বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। তবে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার কারণে হোক বা জাতীয় ঐক্যের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হোক, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলকসহ গোখলের মতো উদারপন্থী নেতাও অংশ নেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গভঙ্গকে জাতীয় দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। চরমপন্থী নেতাদের কারণে এই আন্দোলনের সঙ্গে সশস্ত্র কার্যকলাপও যুক্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে। রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে ১৯১১ সালে দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন।

বয়কট' আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাকেই স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল দুইটি— বয়কট ও স্বদেশী।

‘বয়কট’ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। ক্রমে ক্রমে বয়কট’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। বয়কট শুধু বিলেতি পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বিলেতি শিক্ষা বর্জনও কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। ফলে স্বদেশী আন্দোলন শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে রূপ নেয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন করার অপরাধে সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বহু শিক্ষার্থীকে বের করে দেওয়া হয়। যে কারণে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কয়েকটি কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রও গড়ে ওঠে।

স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিলেতি শিক্ষা বর্জনের মতো পণ্য বর্জনের জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। স্থানে স্থানে সমিতির মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারে শপথ নেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলা এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকেন। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যেতে থাকে। একই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময় দেশি তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়ার দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন : হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আন্দোলন দুটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয়ভিত্তিক গণআন্দোলন। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন গড়ে তোলে। অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন।

খিলাফত আন্দোলনের কারণ : ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় বিব্রত হয়। কারণ ধর্মীয় কারণে তারা খলিফার অনুগত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থাকতে বাধ্য। নিজ দেশের সরকার হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন দিয়েছে। তবে শর্ত ছিল যে এই সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু, যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধ শেষে জার্মানির পক্ষে যোগদানের জন্য ১৯২০ সালে সেভার্সের চুক্তি অনুযায়ী শান্তিস্বরূপ তুরস্ককে খণ্ডবিখণ্ড করার পরিকল্পনা করা হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানরা মর্মান্বিত হয় এবং খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে, যা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন দুই ভাই মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী।

অসহযোগ আন্দোলন : ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের পেছনে বিভিন্ন কারণ ছিল। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নতুন ধারার জন্ম দেয়। ১৯১৯ সালে সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই আইনে যেকোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এই

আইন ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবও আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য কংগ্রেস বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। সরকারের দমননীতির পাশাপাশি চলে সংবাদপত্রে হস্তক্ষেপ।

তাছাড়া মহাযুদ্ধের সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯২৩ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২১-২২ সালে এই আন্দোলন সর্ব-ভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমী যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে, তাকেই বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অতর্কিত বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত্যা, গেরিলা পদ্ধতিতে খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসতে থাকে।

১৯১১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই সংগ্রাম জোরদার হলেও এর আগেই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। ১৯০৮ সালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদ্রিরামের বোমা হামলার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। এই আন্দোলন মূলত শেষ হয় ১৯৩০ সালে। তবে এর পরেও বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা ঘটে।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের আগেই বাংলার প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। প্রথম পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ। পুলিন বিহারী দাস ছিলেন ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক। এরা বোমা তৈরি থেকে শুরু করে সব ধরনের অস্ত্র সংগ্রহসহ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সশস্ত্র আক্রমণ, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে এরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। অপরদিকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় নিয়োজিত প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন এবং ধরা পড়ার পর ক্ষুদ্রিরামের ফাঁসি হয়। এছাড়া মানিকতলা বোমা হামলাসহ নানা অভিযোগে বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে ঐ সময় ফাঁসি দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে কারাবন্দী ও দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। এই সমস্ত চরম দমননীতির কারণে প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লব স্তিমিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় ১৯১২ সালে। এই আন্দোলন কোলকাতাকেন্দ্রিক হলেও ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। এই সময় বিপ্লবীরা আবার হত্যা, বোমা হামলা, ডাকাতি ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে কোলকাতায় গোপনে বোমার কারখানা স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কোলকাতা ও পূর্ব বাংলার যশোর, খুলনায় অনেক সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ১৯১২ সালের শেষের দিকে দিল্লিতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় লর্ড হার্ডিংকে হত্যার জন্য বোমা হামলা চালানো হয়। হার্ডিং বেঁচে যান। কিন্তু, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বাংলার অনেক বিপ্লবী বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহের মতো দুঃসাহসী চেষ্টাও করেছেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করা। এঁদের মধ্যে ছিলেন বাঘা যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ডা. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ শক্তির প্রতিপক্ষ জার্মানি থেকে অস্ত্র সাহায্যের ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই অর্ডিন্যান্সের বলে অনেক বিপ্লবী কারারুদ্ধ হলে বিপ্লবী কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে শুরু করেন আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আবার বৃদ্ধি পায়।

আশ্বাস পান। একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, যাঁর আসল নাম সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪)। কলেজ জীবনে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এর মধ্যেই তিনি মাস্টারদা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, নগেন সেনের সহায়তায় একটি বিপ্লবী

সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর সংগঠন এবং তিনি নিজে একের পর এক সশস্ত্র কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারবার গ্রেফতার হলেও প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই আত্মঘাতী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি'। এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। স্বাধীন চিটাগাং সরকার'-এর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধ ছিল অসম শক্তির যুদ্ধ। সূর্য সেনের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে

ইংরেজ সরকার বিশাল বাহিনী নিয়োগ করে। চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় জালাবাদ পাহাড়ে। গোলাবারু ফুরিয়ে গেলে বিপ্লবীরা পিছু হটতে বাধ্য হন। অনেক তরুণ বিপ্লবী এই খন্ড যুদ্ধ এবং অন্যান্য অভিযানে নিহত হন। বিপ্লবীরা গ্রামের কৃষকদের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন গ্রেফতার। ১৯৩৪ সালে সংক্ষিপ্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারে তাকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। চরম নির্যাতনের পর ১২ জানুয়ারি তাকে ফাঁসি দিয়ে তাঁর মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনীকে নারী যোদ্ধাও ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কল্পণা দত্ত এবং প্রীতিলতা ওয়াদেদার। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা ১৯০০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডিসটিঙ্কশন নিয়ে বি.এ. পাস করেন। ইতোমধ্যে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সূর্য সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। হন। সাহসী নারী প্রীতিলতাকে তার যোগ্যতার জন্য চট্টগ্রাম "পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব" আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তার সঙ্গী বিপ্লবীদের নিরাপদ স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। কিন্তু ধরা পড়ার আগে বিষপানে তিনি আত্মহত্যা করেন। প্রীতিলতা বাংলার সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে কিংবদন্তী হয়ে আছেন।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পাশাপাশি কোলকাতায় পক্ষ দল যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। ১৯৩০ সালে ডালহৌসি স্কোয়ারে চার্লস টেপার্টকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওই বছর ডিসেম্বরে এক অভিযানে নিহত হন কোলকাতা রাইটার্স বিন্ডিংয়ে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন। এর আগে বিনয় বসুর হাতে নিহত হন অত্যাচারী পুলিশ অফিসার লোম্যান। এই বিপ্লবী অভিযানের সঙ্গে জড়িত বিনয় ও বাদল আত্মহত্যা করেন এবং দীনেশের ফাঁসি হয়। ঐ বছরই বাংলার গভর্নর জ্যাকলনকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত বীণা দাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মেদিনীপুরে পরপর তিনজন ইংরেজ ম্যাজিকেট বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন।

বিপ্লবীদের ব্যাপক তৎপরতা কমে গেলেও চট্টগ্রামে তারা এরপরও একের পর এক অভিযান চালিয়েছে। ১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের পল্টন ময়দানে ইংরেজদের ক্রিকেট খেলার আয়োজনে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে সক্ষম হয়। ঐ দিনও দুজন বিপ্লবী নিহত হন এবং দুজন ধরা পড়লে তাদের পরে হত্যা করা হয়।

স্বরাজ পার্টি

১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কংগ্রেসের অনেক নেতা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ সময় মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা চিত্তরঞ্জন দাস (সি.আর. দাস) ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। সি. আর. দাস ও তাঁর সমর্থকরা নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক পরিষদগুলোতে যোগদানের পক্ষে ছিলেন। কারণ ঐ সময় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণে আইন অমান্য আন্দোলনের পরিবেশে না থাকায় তাঁরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আইনসভায় যোগ দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯১৯ সালে সংস্কার আইন অচল করে দেওয়া। কিন্তু কংগ্রেসের গোয়া সম্মেলনে তাঁদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২২ সালে কংগ্রেসের একাংশের সমর্থনে সি.আর. দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয় স্বরাজ পার্টি। সি.আর. দাস হন এ দলের সভাপতি। মতিলাল নেহরু হন অন্যতম সম্পাদক।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যাঁরা স্বরাজ লাভের জন্য স্বরাজ পার্টির সমর্থক ছিলেন, তাঁদেরকে পরিবর্তনপন্থী এবং যাঁরা স্বরাজ পার্টির বিপক্ষে অংশ নেন তাঁদের বলা হয় পরিবর্তনবিরোধী। এই দুই পক্ষের সঙ্গে শুধু আন্দোলনের পন্থা নির্ধারণের ধরন ছাড়া আর কোনো বিষয়ে বিরোধ ছিল না। স্বরাজ দলের বিরোধীরা অসহযোগ আন্দোলনের ধারা বজায় রেখে আইন বয়কট করার সিদ্ধান্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। অন্যদিকে স্বরাজ দল গঠনের পরপর বাংলার অনেক বিপ্লবী- সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক যুবনেতা এতে যোগদান করেন।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার বা মন্টে-ফোর্ড সংস্কার

ব্রিটিশ ভারতে ধীরে ধীরে স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। এই সংস্কারগুলির নামকরণ করা হয়েছে ১৯১৭ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট এডউইন মন্টেগু এবং ১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের নামানুসারে। ১৯১৮ সালে প্রস্তুত মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে এই সংস্কারগুলির রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইনের ভিত্তি তৈরি করেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা সাংবিধানিক সংস্কারগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর না করার কথা বিবেচনা করেছিলেন যদিও ব্রিটিশ রক্ষণশীলরা এর সমালোচনা করেছিলেন। এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল:

ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এখন দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হবে: কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং রাজ্য পরিষদ।
 প্রদেশগুলিকে দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা বা দ্বৈতশাসন অনুসরণ করতে হয়েছিল।

বেঙ্গল প্যাক্ট

একটি চুক্তি যা ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যজনিত সমস্যা সমাধানকল্পে সম্পাদিত হয়েছিল। চুক্তির উদ্যোক্তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলিমদের সাথে হিন্দুদের রাজনৈতিক অংশীদারত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। এই চুক্তিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বেঙ্গল প্যাক্ট চিত্তরঞ্জন দাস প্যাক্ট বা কলকাতা প্যাক্ট নামেও পরিচিত।

চুক্তি

রাজনৈতিক কর্মসূচির সাফল্যের জন্য চিত্তরঞ্জন দাশ আইন পরিষদের মুসলিম সদস্যবৃন্দের সহায়তা চান। এসময় ১৯২৩ সালের এপ্রিলে স্যার আবদুর রহিম, মৌলভী আবদুল করিম, মৌলভী মুজিবুর রহমান, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি প্রমুখ মুসলিম নেতা ও জে এম সেনগুপ্ত, শরত চন্দ্র বসু, জে এম দাশ গুপ্ত, বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ হিন্দু নেতাদের সহায়তায় বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তিটি রচিত হয়। সে বছরের ১৬ ডিসেম্বর স্বরাজ্য দল এবং ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই চুক্তি অনুমোদন করে। প্রদেশে স্বনিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে চুক্তি কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

চুক্তির কতিপয় ধারা ছিল:

বঙ্গীয় আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
 স্থানীয় পরিষদসমূহে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শতকরা ৪০ ভাগ। সরকারি চাকরির ৫৫% পদ পাবে মুসলিমরা। যতদিন ঐ অনুপাতে না পৌঁছানো যায় ততদিন মুসলিমরা পাবে ৮০% এবং হিন্দুরা পাবে ২০%। সরকারি চাকরি ছাড়াও কলকাতা কর্পোরেশন, জেলা ও স্থানীয় বোর্ড তথা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলিমরা ঐ হারে চাকরি পাবে।

কোনো সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো আইন বা সিদ্ধান্ত ঐ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৭৫% এর সম্মতি ছাড়া উপস্থাপন করা যাবে না। মসজিদের সামনে বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করা যাবে না।

খাদ্যের জন্য গরু জবাই নিয়ে আইন সভায় কোনো আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া যাবে না। আইন সভার বাইরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা আনার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। গরু জবাই করার সময় যাতে তা হিন্দুদের দৃষ্টিতে পড়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধর্মীয় কারণে গরু জবাইয়ের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করে। হিন্দু-মুসলিমের দাবিদাওয়া বিবেচনা করার লক্ষ্যে ১৯২৭ সালের শেষের দিকে ব্রিটিশ সরকার স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি শাসনতান্ত্রিক কমিশন গঠন করে। এ সাইমন কমিশনে ভারতীয় কোনো সদস্য না থাকায় ভারতীয় জনগণ একে সম্পূর্ণ সাদা কমিশন (All White Commission) বলে সমালোচনা করে। ১৯২৯ সালে নেহেরু রিপোর্ট ও মুসলমানদের দাবিদাওয়াসংবলিত জিহ্মাহর চৌদ্দ দফা এ দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ করে। যুগপৎভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা নিরসনে ভারত সরকার পর পর তিনটি গোলটেবিল বৈঠক করে। ব্রিটিশ সরকার গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল হিসেবে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এ শ্বেতপত্রটি সংশোধন, পরীক্ষা ও পর্যালোচনার জন্য একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হয়। যুক্ত কমিটি ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্বর শ্বেতপত্রটির পরিবর্তিত ও সংশোধিত রিপোর্ট পেশ করে। ১৯৩৫ সালে এ রিপোর্টটি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে আলোচনা সাপেক্ষে ভারত শাসন আইনরূপে পাস হয়। ১৯৩৫ সালের ২রা আগস্ট ভারত শাসন আইন রাজকীয় অনুমোদন লাভ করে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য

১। সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যের সমন্বয়ে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

২। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কেন্দ্রবিন্দুরূপ। প্রাদেশিক বিষয়গুলো যেমন- কৃষি, শিক্ষা, স্থানীয় শাসন প্রভৃতির উপর প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হলেও বাস্তবে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে স্বায়ত্তশাসন ব্যাহত হয়।

৩। কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন

এ আইনে কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়গুলো সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত- এ দু'ভাগে বিভক্ত। 'হস্তান্তরিত' বিষয়গুলো দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের দ্বারা এবং 'সংরক্ষিত' বিষয়গুলো গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টামণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হতো।

৪। ক্ষমতা বণ্টননীতি

এ আইনের শাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

ক) কেন্দ্রীয় বিষয়, খ) প্রাদেশিক বিষয়, গ) যুগ্ম বিষয়।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

এ আইন দ্বারা সর্বপ্রথম একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আদালত সংবিধানের ব্যাখ্যাদান, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করতে পারত।

৬। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি

এ আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান গভর্নর ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হন। তাদের হাতে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা, বিশেষ ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধিমূলক ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৭। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা

এ আইনের দ্বারা কেন্দ্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন করা হয়। উচ্চকক্ষের নাম 'রাষ্ট্রীয়' সভা এবং নিম্নকক্ষের নাম 'ব্যবস্থাপক' সভা।

লাহোর প্রস্তাব কী?

লাহোর প্রস্তাব হল ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবী জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলীম লীগের অধিবেশনে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হক। পরবর্তীতে এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামের দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এজন্য লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাবও বলা হয়।

প্রস্তাবটি পাঠ করা হয় উর্দু ভাষায়। এবং এই প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য এই সম্মেলনে এ. কে. ফজলুল হক "শেরে বাংলা" উপাধিতে ভূষিত হন।

লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

প্রথমত, "নিখিল ভারত মুসলিম লীগ দৃঢ়তার সাথে পুনঃঘোষণা করেছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা রয়েছে, তা এ দেশের উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে অসঙ্গত ও অকার্যকর বিধায় তা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অগ্রহণযোগ্য।"

দ্বিতীয়ত, “সমস্ত সাংবিধানিক পরিকল্পনা নতুনভাবে বিবেচনা না করা হলে মুসলিম ভারত অসন্তুষ্ট হবে এবং মুসলমানদের অনুমোদন ও সম্মতি ছাড়া সংবিধান রচিত হলে কোন সংশোধিত পরিকল্পনাও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।”

তৃতীয়ত, “নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সুচিন্তিত অভিমত এরূপ যে, ভারতে কোন শাসনাত্মক পরিকল্পনা কার্যকর হবে না বা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা নিম্নবর্ণিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত না হয়-

- ক) ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে ‘অঞ্চল’ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে,
- খ) প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানা পরিবর্তন করে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেখানে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকাগুলো ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ (Independent Sates) গঠন করতে পারে,
- গ) ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।”

চতুর্থত, এ সমস্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে সংবিধানের কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান রাখতে হবে। ভারতবর্ষের মুসলমান জনগণ যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার এবং স্বার্থরক্ষার জন্য পরামর্শ সাপেক্ষে সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান রাখতে হবে।

আরও পড়ুন: অসহযোগ আন্দোলন কী? অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ও কারণসমূহ

লাহোর প্রস্তাবের মূল ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়-

- ১। অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিতকরণ : ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে ‘অঞ্চল’ হিসেবে চিহ্নিতকরণ।
- ২। মুসলমানদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন : ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ (Independent Sates) গঠন।
- ৩। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর সীমানা পরিবর্তন : এসব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজনবোধে ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর সীমানা পরিবর্তন।
- ৪। স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীন অঙ্গরাজ্য : এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।
- ৫। সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ : সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শ করে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান করা।
- ৬। মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ : লাহোর প্রস্তাবের উল্লিখিত বিষয়গুলো দেশের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে

দ্বি-জাতি তত্ত্ব

সৈয়দ আহমদ খান সর্বপ্রথম দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা জনসমক্ষে নিয়ে আসেন বলে ধারণা করা হয়। যখন সমগ্র ভারত স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী রূপ নিচ্ছে, তখনই তিনি মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হতে নিরুৎসাহিত করেন। সেসময় তার এই প্রচারকে সানন্দে গ্রহণ করে তৎকালীন শাসকেরা। কেননা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রুখতে এটিই ছিল অন্যতম ট্রাম্প কার্ড।

পরবর্তীতে কবি ও দার্শনিক মুহাম্মদ ইকবাল মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। মুহাম্মদ ইকবাল ১৯৩০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে তার ধারণা পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মাঝে মাত্র আট কোটি মুসলমানের নিরাপত্তা প্রদান করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সমাধান হিসেবে হয়তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনতা মেনে নেয়া অথবা সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করা।

১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনের সভাপতির বক্তব্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার ধারণা ধারণা বা আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেন।

লাহোর প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাব হল ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবী জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হক। পরবর্তীতে এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে ‘ভারত’ ও ‘পাকিস্তান’ নামের দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এজন্য লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাবও বলা হয়লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব, যাকে পাকিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণাও বলা হয়, তা হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশে

বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবী জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের পক্ষ হতে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রারম্ভিক খসড়া তৈরি করেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খান যা আলোচনা ও সংশোধনের জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাবজেক্ট কমিটি সমীপে পেশ করা হয়। সাবজেক্ট কমিটি এ প্রস্তাবটিতে আমূল সংশোধন আনয়নের পর ২৩ মার্চ সাধারণ অধিবেশনে মুসলিম লীগের পক্ষ হতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হক সেটি উপস্থাপন করেন এবং চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ তা সমর্থন করেন। মূল প্রস্তাবটি ছিল উর্দু ভাষায়। এই সম্মেলনে ফজলুল হককে "শেরে বাংলা" উপাধি দেয়া হয়।

লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

প্রথমত, "নিখিল ভারত মুসলিম লীগ দৃঢ়তার সাথে পুনঃঘোষণা করছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা রয়েছে, তা এ দেশের উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে অসঙ্গত ও অকার্যকর বিধায় তা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অগ্রহণযোগ্য।"

দ্বিতীয়ত, "সমস্ত সাংবিধানিক পরিকল্পনা নতুনভাবে বিবেচনা না করা হলে মুসলিম ভারত অসন্তুষ্ট হবে এবং মুসলমানদের অনুমোদন ও সম্মতি ছাড়া সংবিধান রচিত হলে কোন সংশোধিত পরিকল্পনাও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।"

তৃতীয়ত, "নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সুচিন্তিত অভিমত এরূপ যে, ভারতে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে না বা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা নিম্নবর্ণিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত না হয়-

ক) ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে 'অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে,

খ) প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানা পরিবর্তন করে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেখানে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকাগুলো 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) গঠন করতে পারে,

গ) 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।"

চতুর্থত, এ সমস্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে সংবিধানের কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান রাখতে হবে। ভারতবর্ষের মুসলমান জনগণ যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার এবং স্বার্থরক্ষার জন্য পরামর্শ সাপেক্ষে সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান রাখতে হবে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ

জিন্নাহ'র দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রস্তাবনার পর আরও নানান ঘটনা ঘটতে থাকে ভারতীয় উপমহাদেশে। ১৯৪২ এ ১৯৪৬ সালে লন্ডন থেকে আগত দুটি মিশনের মূল লক্ষ্যই ছিল ভারতকে স্বাধীনতা দিলেও তারা যেন কমনওয়েলথের অধীনে থাকে, তা নিশ্চিত করা। যদিও তাদের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল যে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করতেই এসেছেন।

পরবর্তীতে ব্রিটিশদের প্ররোচনায় এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা আরও প্রকট আকার ধারণ করলে ক্যাবিনেট মিশন ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করার চিন্তার দিকে এগোচ্ছিল। হিন্দু-মুসলিম হিসেবে ভাগ করার পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রদের কথাও তাদের মাথায় ছিল। লর্ড মাউন্টব্যাটন ধারণা করেছিলেন, সকলে সম্মত হলেও বাংলা স্বতন্ত্র 'ডোমিনিয়ান' হিসেবেই থাকতে চাইবে। তবে বাস্তবে ঘটে তার উল্টোটা!

ভারত ভাগ করতে গিয়ে সবচেয়ে বিপাকে পড়তে হয়েছিল বাংলা ও পাঞ্জাব অঞ্চলকে নিয়ে। ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই চেয়েছিল এই দুটো অঞ্চল তাদের সঙ্গে থাকুক। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সবটুকু রাখাও সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই বাংলা ও পাঞ্জাবভাগের পক্ষে সম্মত হলেন। ইংল্যান্ড থেকে উড়িয়ে আনা হলো ব্যারিস্টার র্যাডক্লিফকে। কখনো ভারতবর্ষের মাটিতে পা না রাখাই র্যাডক্লিফের যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হলো। তারপর বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রায় নয় কোটি মানুষের ভাগ্য তিনি পেন্সিল দিয়ে কেটে ভাগ করে দিলেন। হয়তো এ কারণে তিনি মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্তও হয়েছিলেন। ১৯৪৭ তাদের ১৩ই অগাস্ট ভারত ত্যাগ করেন র্যাডক্লিফ আর ১৬ই অগাস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত ও পাকিস্তানের মানচিত্র উন্মুক্ত করেন সকলের সামনে। এভাবে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে গেল একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী।

ভাষা আন্দোলন

সক্রিয় ভাষা আন্দোলনের আরম্ভ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে হলেও এই আরম্ভেরও আরেকটি আরম্ভ ছিল, সেটি করেছিলেন লেখক সম্প্রদায়। ‘ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসগুলির বিবরণ অনুযায়ী বাঙালি লেখকগণ বাংলা রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে পত্র-পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে এবং এ প্রয়াসের সূচনা ঢাকায়। কিন্তু তা ঠিক নয়। এ প্রচেষ্টার শুরু আরো আগে এবং কোলকাতায়।’ [আবদুল হক, ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব, পৃ ৩১]

১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদুন মজলিশ ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা নাকি উর্দু?’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে যেখানে বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করার দাবী করা হয়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। তমদুন মজলিশের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া এই কমিটির আহবায়ক ছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রস্তাবে সংশোধনী এনে বাংলাকেও পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি জানান।

এসময় তমদুন মজলিস, গণ আজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও বিভিন্ন ছাত্রাবাসের যৌথ উদ্যোগে ২রা মার্চ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। [শহীদ তাজউদ্দীনের ডায়েরী ২.৩.১৯৪৮] রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঐদিন এক প্রস্তাবে সারা পূর্ব বাঙলায় ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ভোরে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে ছাত্ররা বের হয়ে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। শেখ মুজিব, শামসুল হক, অলি আহাদসহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করলে ঢাকায় ১৩-১৫ মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়। এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৫ই মার্চ ৮ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৫ই মার্চ ভাষা-আন্দোলনের বন্দী ছাত্র ও কর্মীদের মুক্তি দেয়া হয়।

২১ মার্চ ১৯৪৮ রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর পূর্ব পাকিস্তান সফর উপলক্ষে আয়োজিত একটি বিশাল সমাবেশে জিন্নাহ বলেন, ‘উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে, অন্য কোনো ভাষা নহে। যে কেহ অন্য পথে চালিত হইবে সেই পাকিস্তানের শত্রু’। ২৪ মার্চ তারিখে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাবি’র সমাবর্তনে তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন ‘Urdu and Urdu alone shall be the state language of Pakistan’ জিন্নাহ যখন বলেন, উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা, তখন হলের মধ্যে বহু ছাত্র ‘না,না’ বলে চিৎকার করতে থাকেন। ছাত্ররা এইদিন প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন, এ.কে.এম আহসান প্রমুখ। ২৪ শে মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাতদান করেন। জিন্নাহ কঠোর ভাষায় তাদেরকে শাসিয়ে দেন, ‘যে কোন অসাংবিধানিক আন্দোলন কঠোর হস্তে দাবিয়ে রাখা হবে। ২৮শে মার্চ জিন্নাহ ঢাকা ত্যাগ করেন এবং সেদিন সন্ধ্যায় রেডিওতে তার দেয়া বক্তব্যে তার অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

১৯৪৮ সালের পর বাংলা ভাষা আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও পাকিস্তানের শাসক শ্রেণির বাংলা ভাষা বিরোধী ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। বাংলা ভাষাকে সমূলে উৎপাটন করাই ছিল এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। এ জন্য আরবি হরফে বাংলা লেখার আজগুবি এক প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয় তারা। এ কাজে বাংলাভাষী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন তৎকালীন পাক শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। অতঃপর ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ তারিখে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি বাংলা হরফকে বাদ দিয়ে তদস্থলে আরবি হরফে বাংলা লেখা প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। তার এ ঘোষণার প্রতিবাদে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা মোস্তফা নূর উল ইসলামের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং নজরুল ইসলাম, আশরাফ সিদ্দিকী, ইলা দাস গুপ্ত, নূরুল ইসলাম, মমতাজ বেগম, রিজিয়া সিদ্দিকী, খলিলুর রহমান প্রমুখের সমন্বয়ে একটি বর্ণমালা সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। এই কমিটি ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২৭ জানুয়ারি ১৯৫২ তারিখে ঢাকার পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু’ এবং ‘উর্দু হরফে বাংলা লিখনের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে’ বলে উক্তি করেন। তার বক্তৃতায় প্রদেশব্যাপী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের এক প্রতিবাদ

সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হয় ও ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের আহ্বান করা হয়। [আবদুল মতিন, বাঙালি জাতির উৎস সন্ধান ও ভাষা আন্দোলন, পৃ ৬২] বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সহযোগে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ৩১ তারিখে নাজিমুদ্দিনের ভাষা সম্পর্কিত ঘোষণার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগের উদ্যোগে বার লাইব্রেরী হলে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী। সভায় আরবি লিপিতে বাংলা লেখার সরকারি প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং ৩০ শে জানুয়ারির সভায় গৃহীত ধর্মঘটের সমর্থন দেওয়া হয়। পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতাল, সমাবেশ ও মিছিলের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সভায় আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন কাজী গোলাম মাহবুব। একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতারা ঠিক করেন - তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন।

আজকের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ সেসময় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন। সেখানে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভকারীরা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গেলে পুলিশ ছাত্রদের গ্রেফতার করে, পরে কাঁদানে গ্যাসও নিক্ষেপ করে। দুপুরের পর বিক্ষোভরত ছাত্রদের একটি দল গণপরিষদ ভবনের দিকে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে।

নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০শে জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান করে। ৩১শে জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ সভায় একুশে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সময় হঠাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরনের সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ করেন। সরকারি এ ঘোষণা পাওয়া মাত্রই ঢাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা কিছুতেই ১৪৪ ধারা মেনে নিতে পারেননি। ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে এ সভায় ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্তে দ্বিমত দেখা দেয়। অধিকাংশ সদস্য প্রথমে ১৪৪ ধারা অমান্য করার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু আবদুল মতিন, অলি আহাদ, গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন। অবশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চত্বরে) ছাত্রদের সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশে যোগ দেন। কতিপয় নেতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করে। তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন। ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

ছাত্র-ছাত্রীরাও পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে সমবেত হয়ে গণপরিষদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আবদুল জব্বার ঘটনাস্থলে শহিদ হন। আব্দুস সালাম ঐদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ই এপ্রিল শহিদ হন। সে সময় গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। গুলির খবর পেয়ে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ আইন পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি গণবিক্ষোভ শুরু হয়। জনতা শহিদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে গ্রেফতার হন। যেস্থানে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সেখানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩শে ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদ মিনার নির্মাণ করেন। পরে পুলিশ শহিদ মিনারটি ভেঙে দেয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহিদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহিদ মিনারটি ভেঙে দিলে ১৯৭২ সালে সে নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

তারপরও ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। প্রবল আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। জাতীয় পরিষদে বাংলা ভাষা বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের একপর্যায়ে এর সদস্য আদেলউদ্দিন আহমদের দেওয়া সংশোধনী

প্রস্তাব অনুযায়ী উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিল পাস করা হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির একুশে দিনটি বাঙালির শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রিসহ সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে ভাষাশহিদদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। একুশের প্রভাতফেরি ও প্রভাতফেরির গান বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। এদিন শহিদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাঙালি চেতনাকে লালন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কানাডার ভ্যাকুভার-এ বসবাসরত Mother Language Lover of the World নামের একটি বহুভাষী ও বহুজাতিক ভাষাপ্রেমী গ্রুপ ১৯৯৮ সালের ২৮ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান-এর কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করে। যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগী আব্দুস সালাম। জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ২৭ ধারার উপর ভিত্তি করে তাঁরা আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীকে মাতৃভাষা ব্যবহার না করার জন্য, মাতৃভাষা ভুলে যাওয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে; বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। যা 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ'-এর সরাসরি লঙ্ঘন। পত্রে তারা প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য বাঙালির ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত পটভূমি তুলে ধরেন। যা সারা পৃথিবী জুড়ে অনন্য।

তারা ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আবেদন জানান। যাতে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী তাদের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্য একটি বিশেষ দিবস পাবে। এ আবেদনে বিভিন্ন ভাষাভাষী ১০ জন ইউনেস্কো তথা জাতিসংঘ বাংলাদেশের প্রস্তাবটি মেনে নেয়। ২৮টি রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রস্তাবে লিখিতভাবে সমর্থন জানায় এবং Draft Resolution - 35 হিসেবে চিহ্নিত করে এক্সিকিউটিভ বোর্ডে প্রেরণ করে।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সর্বসম্মতিক্রমে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রকে দিবসটি উদ্যাপনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে ১৯৫২ সাল থেকে যে ২১ শুধু আমাদের ছিল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অহংকার বাঙালির ভাষা বিশ্বসভায় আসন করে নেয়। ২০১০ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাবিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি বা বাংলাভাষা শুধু বাংলাদেশের মানুষের কথা বলে না, কোনো একটি জাতি-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার কথা বলে না। সকল দেশ, সকল জাতির মাতৃভাষারও প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলাভাষা।

ভাষা আন্দোলনে নারী

আটচল্লিশ ও বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে তৎকালীন এদেশের নারী সমাজের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মিছিল, শ্লোগান, সভা-সমিতিতে তারাও পুরুষের পাশাপাশি সংগ্রাম করেছেন। ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, বিশেষ করে কামরুন্নেসা স্কুল এবং ইডেন কলেজের ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল সংগ্রামী। মিছিল মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে নাদিরা বেগমসহ আরও অনেকে পোস্টার, ফেস্টুন লিখন এবং নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ঢাকার বাইরেও নারী সমাজের ভূমিকা ছিল সক্রিয় এবং প্রতিবাদী। যশোরে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন হামিদা রহমান। বগুড়ার বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন রহিমা খাতুন, সালেহা খাতুনসহ অনেকে। ভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীদেরও ব্যাপক ভূমিকা ছিল। এ আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা রাখেন হাজেরা মাহমুদ, যোবেদা খাতুন চৌধুরী, শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সৈয়দা নাজিরুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া খাতুনসহ আরও অনেকে। পোস্টার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন সচল রাখার তৎপরতা চালানোর সময় ১৯৪৯ সালের ১৩ই আগস্ট গ্রেফতার হন লিলি চক্রবর্তী। এসব সংগ্রামী ভূমিকার পাশাপাশি ঐ সময় বিভিন্ন স্থানে নারীরা ভাষা আন্দোলনকারীদের সহযোগিতা করেন। তাঁদের মধ্যে নিবেদিতা নাগ, সারা তৈফুর মাহমুদ, সাহেরা বানু উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যাঁরা পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন ছিলেন অন্যতম। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের

সাথে ছাত্রীরাও দুঃসাহসী ভূমিকা রাখেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গায় যাঁরা সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন, তারা হলেন শামসুন্নাহার, রওশন আরা, সুফিয়া ইব্রাহিমসহ অনেকে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের নেত্রী মমতাজ বেগম গ্রেফতার হলে পুলিশ-জনতার মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল।

যুক্তফ্রন্ট এবং প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৫৪ সালে)

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তার দোসরদের শোষণের বিরুদ্ধে এক 'ব্যালট বিপ্লব'। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যর্থ শাসন, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি প্রভৃতির কারণে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এ সময় পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনের চরম ব্যর্থতার ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। আগে থেকেই ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় নানা টালবাহানা করে নির্বাচনের তারিখ বারবার পিছিয়ে দেয়। অবশেষে সরকার পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য করে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ।

যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি এবং ২১ দফা কর্মসূচি:

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল পুরাতন ও বড় দল। এছাড়া পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করত মুসলিম লীগ। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত পাঁচটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ১. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ৩. মওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম পার্টি, ৪. হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল ও ৫. খিলাফত-ই-রাব্বানি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল 'নৌকা'। আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচির ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে প্রণীত এই ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। প্রধান দফাগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
- বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্ধৃত জমি বিতরণ করা;
- পাটশিল্পকে জাতীয়করণ করা;
- কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা;
- অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা;
- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান;
- '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ;
- ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা;
- ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান;
- আইন পরিষদের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি না করা;
- আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা;

নির্বাচনের ফলাফল:

১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটের ভোট দেয়। ২রা এপ্রিল সরকারিভাবে নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন।

নির্বাচনের তাৎপর্য:

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক ও ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতার পরাজয় ঘটে। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ আসন লাভ ভবিষ্যতে তাদের পূর্ব বাংলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইক্ষান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি দেশের সংবিধান বাতিল করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেন এবং মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয় সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। এর কিছুদিনের মধ্যে ২৭শে অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইক্ষান্দার মির্জাকে অপসারণ করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরিফ কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। এ প্রতিবেদনের সুপারিশে ছাত্রদের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে কঠোর আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন 'বাঘটির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৫ই আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত এবং কয়েকশ' আহত হয়। এ আন্দোলনের ফলে শরিফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে ছাত্ররা আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯৬২ সালের ৮ই জুন সামরিক আইন স্থগিত করা হলে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরে আসে। আইয়ুব খান নিজেই কনভেনশন মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এসময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে আইয়ুববিরোধী মোর্চা গঠনের আহ্বান জানান। ফলে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এনডিএফ গঠিত হয়। এ ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। খুব তাড়াতাড়ি এ ফ্রন্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করেন। ১৯৬৪ সালের শুরুতেই আওয়ামী লীগ এনডিএফ থেকে বেরিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নতুন যাত্রা শুরু হয়। এর ফলে এনডিএফ নিক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানবিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে একটি জোট বা COP (Combined Opposition Party) গঠন করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে কপ-এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়। নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পূর্ব থেকেই আইয়ুব খান নিজের অনুকূলে নিয়ে আসেন। জনগণ ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ করে কিন্তু নির্বাচনে আইয়ুব খান জয়ী হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। সেখানেও আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

শিক্ষা আন্দোলন

১৯৬২সালের পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) শিক্ষা আন্দোলন ছিল শরীফ কমিশন, সরকারি নাম কমিশন অন ন্যাশনাল এডুকেশন কর্তৃক পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের কাছে সুপারিশকৃত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন। কমিশনের প্রতিবেদনে ইংরেজি এবং উর্দু বাধ্যতামূলক বিষয় করা হয়েছিল। এটি শিক্ষাকে বেসরকারীকরণ করেছিল এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকারকে অবাস্তবভাবে "ইউটোপিয়ান" হিসাবে বাতিল করেছিল।

আন্দোলন শুরু হয় ১৭ সেপ্টেম্বর যা বাংলাদেশে শিক্ষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। প্রতিবেদনের সুপারিশ ২৬শে আগস্ট ১৯৫৯ কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দেয় যা ১৯৬২ সালে একটি বই হিসাবে প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনে কমিশন শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়: "আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে জনগণের ঐতিহ্যগত চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করতে হবে। তারা মনে করে যে শিক্ষা একটি সন্তা জিনিস যা পরিবর্তন করা উচিত। আমাদের সত্যটি মনে রাখতে হবে যে উচ্চ মানের পণ্যের উচ্চ মূল্য রয়েছে।

প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চ স্তরের মতো মোট শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক ও উচ্চ স্তরের কোর্সের মেয়াদ ছিল ৫ বছর এবং উচ্চতর ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর। স্নাতকোত্তর কোর্সের মেয়াদ ছিল ২ বছর। পাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর ছিল ৫০, দ্বিতীয় শ্রেণির নম্বর ছিল ৬০ এবং প্রথম শ্রেণির নম্বর ছিল ৭০। তাদের সুপারিশ ছিল ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, শিক্ষকদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষকদের কাজের সময়কাল ১৫ ঘণ্টা। তারা বাংলা বর্ণমালার জায়গায় রোমান বর্ণমালা প্রয়োগ করতে চেয়েছিল।

- উর্দু হবে পাকিস্তানের ভাষা।
- ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরেজি বাধ্যতামূলক হতে হবে।

আন্দোলন

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা এই রিপোর্টের বিরোধিতা করে এবং ঢাকা কলেজের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬২ সালে তারা সেই রিপোর্টের বিরোধিতা করার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন দিবস এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, নেশন স্টুডেন্টস ফেডারেশন, ছাত্রশক্তির মতো সংগঠনগুলো একসঙ্গে আন্দোলনে কাজ করছিল। ১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারা হরতাল পালন করে এবং সভা-সমাবেশ করে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ওই মাসের ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আন্দোলনকে ভয় দেখানোর জন্য সরকার ফিল্ড ক্যানন দেয়। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্ররা হরতাল ঘোষণা করে। সেদিন ঢাকায় বিক্ষোভ হয়। তারা সরকারের মন্ত্রী খাজা হাসান আসকারীর একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং পুলিশের তিনটি এসইউভি পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও লাইভ বুলেট ব্যবহার করে। বিক্ষোভের দ্বিতীয় অংশটি হয় পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের সামনে। পুলিশ বাবুল, গোলাম মোস্তফা ও ওয়াজিউল্লাহ নামে তিনজনকে হত্যা করে। তারা বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে আটকও করেছে। টঙ্গীতে সুন্দর আলী নামে এক শ্রমিককে হত্যা করেছে তারা।

ফলাফল

পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম ফারুক খানের সাথে দেখা করেন যার ফলে সরকার শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্বীকৃত করে। বাংলাদেশ ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস হিসেবে পালন করে।

ছয় দফা

ছয় দফা কর্মসূচি তথা ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "৬ দফা দাবি" পেশ করেন।

৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোরে পৌঁছান এবং তার পরদিন অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি পত্রিকায় শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে নিজেই ৬ ফেব্রুয়ারির সম্মেলন বর্জন করেন। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা প্রস্তাব এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি সংগৃহীত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা সংবলিত ছয় দফা কর্মসূচির একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। যার নাম ছিল ছয় দফা আমাদের বাঁচার দাবি।

২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধীদলীয় সম্মেলনে ৬ দফা পেশ করেন। এরপর ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। ২৩ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে লাহোর প্রস্তাবের সাথে মিল রেখে ছয় দফা উত্থাপন করা হয়। ছয় দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য- পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র, ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে এই ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে(প্ররাষ্ট্র/উপরাষ্ট্র)পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। পরবর্তীকালে এই ৬ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার হয়। বাংলাদেশের জন্য এই আন্দোলন এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে একে ম্যাগনা কার্টা বা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদও বলা হয়।

প্রতি বছর ৭ই জুন বাংলাদেশে ‘৬ দফা দিবস’ পালন করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬ দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। এই দিনে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে টঙ্গী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও ইপিআরের গুলিতে মনু মিয়া, শফিক, শামসুল হক, মুজিবুল হকসহ মোট ১১ জন বাঙালি নিহত হন। ৬ দফা আন্দোলনে প্রথম নিহত হয়েছিলেন সিলেটের মনু মিয়া। ছয় দফা মূলত স্বাধীনতার এক দফা ছিল। ছয় দফার মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৈষম্য আলোচনা করা হলো :

১. অগণতান্ত্রিক শাসন কার্যাবলি :

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী অগণতান্ত্রিকভাবে পূর্ববাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করে। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক আইনসভা ছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভা তথা গণপরিষদের সদস্যগণ প্রাদেশিক আইনসভাগুলো কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলার আইনসভার আয়ু বর্ধিত করার ফলে ১৯৫৪ সালের পূর্বে পূর্ববাংলায় কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। এমনকি ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হওয়ার পর পূর্ববাংলার আইনসভায় যে ৩৪টি আসন শূন্য হয় তার কোনোটিতে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় নি। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক শাসন অব্যাহত ছিল।

২. রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা :

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ববাংলার জনসাধারণের উপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্যাতন-নিপীড়নের স্টিমরোলার চালিয়ে দেওয়ার মাত্রা বৃদ্ধি করে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে বাঙালির কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে এবং বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হলে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

৩. আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে নিয়ন্ত্রণ :

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার আমলাতন্ত্রের মাধ্যমেও পূর্ববাংলাকে নিয়ন্ত্রণ করতো। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলাগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু আমলা শ্রেণীতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে মোট ১৭ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ২ন ছিলেন বাঙালি।

সচিবালয়ে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যেও বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ২১%। ১৯৬৬ সালের মোট ৮০১ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১৭০ জন বাঙালি ছিলেন। ১৯৬৫ সালের দিকে কেন্দ্রীয় চাকরিতে সার্বিকভাবে বাঙালির সংখ্যা ছিল ২৪%। আইয়ুব শাসনামলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত থাকার ফলে এ আমলা শ্রেণী শাসন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করায় পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অবস্থা চরম সংকটাপন্ন হয়ে উঠে।

৪. পূর্ববাংলার নিরাপত্তাহীনতা :

পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক শাসকচক্রের শোষণ ও রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণে পূর্ববাংলার জনগণ যখন চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় নিমজ্জিত, তখন ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৭ দিনব্যাপী এ যুদ্ধের সময় পূর্ববাংলা পাকিস্তান তথা বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে। ফলে বাঙালিদের মনে গভীর নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলাকে শুধু শাসন ও শোষণ করার নীতি গ্রহণ করে। এ অঞ্চলের জনগণের অধিকার ও নিরাপত্তার জন্য তারা কোনো ভূমিকা রাখে নি।

৫. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতারণা :

পূর্ববাংলার জনগণ যখনই তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবি তুলেছে, তখনই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও কয়েমি স্বার্থবাদীরা ঐসব দাবির পশ্চাতে ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের কাল্পনিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে। বাঙালির ন্যায্য দাবি না মিটিয়ে তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য সরকার নির্যাতনমূলক দমননীতি গ্রহণ করেছে। পূর্ববাংলার জনগণের অধিকার আন্দোলনকে দাবিয়ে

রাখার জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারি, মিছিলে পুলিশকে গুলি চালানোর নির্দেশ, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার প্রভৃতির মাধ্যমেও বাঙালিকে ঠেকাতে না পেরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বারবার পূর্ববাংলার জনসাধারণের সাথে রাজনৈতিক প্রতারণা করেছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী নানা অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নি; বরং তারা বাঙালিদের সাথে প্রদত্ত ওয়াদা ভেঙে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা চালায়।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বৈষম্য নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বৈষম্য আলোচনা করা হলো :

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক শাসনের আরেকটি ক্ষেত্র ছিল সামরিক বৈষম্য। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য। সামরিক বাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে যে কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাতে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং মাত্র ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারণ করা হয়। বাঙালির দাবির মুখে সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও তা ছিল নগণ্য। ১৯৫৫ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, সামরিক বাহিনীর মোট ২২১১ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ৮২ জন। ১৯৬৬ সালে সামরিক বাহিনীর ১৭ জন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। আইয়ুব খানের শাসনামলে মোট বাজেটের ৬০% সামরিক বাজেট ছিল। এর সিংহভাগ দায়ভার বহন করতে হতো পূর্ব পাকিস্তানকে, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার প্রতি অবহেলা দেখানো হতো।

১. রিক্রুটিং এজেন্সিতে পশ্চিমাদের আধিপত্য :

সামরিক প্রতিষ্ঠান ও রিক্রুটিং এজেন্সিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল শাখার সদর দপ্তর, অস্ত্র কারখানা সবই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রতিরক্ষা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোও পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। যার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সহসা বাঙালিদেরকে অফিসার পদে নিয়োগ দিত না।

২. নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য :

সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্যকে পাঞ্জাব থেকে নিয়োগ দেওয়া হতো। ১৯৬৫ সালে মোট ১৭ জন জেনারেল, লে. জেনারেল ও মেজর জেনারেলের মধ্যে মাত্র ১ জন মেজর জেনারেল ছিলেন বাঙালি। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর অফিসার শ্রেণীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে ৫%, ১০% ও ১৬%। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৯৫% ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, আর মাত্র ৫% ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগকৃত।

৩. নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৈষম্য :

১৯৬০-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাজেটের ৫৬% প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা হলেও পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় মাত্র ১০%। যার কারণে ১৯৬৫ সালে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলাকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে পাক-ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

৪. প্রতিরক্ষা বিভাগে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত করা :

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চার বছর পর্যন্ত বাঙালিদের মাত্র ৮১০ জনকে প্রতিরক্ষা বিভাগে চাকরি প্রদান করা হয়। বাঙালিদেরকে প্রতিরক্ষা বিভাগের চাকরি থেকে দূরে সরিয়ে

রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। যেমন-

- (i) প্রতিরক্ষা বিভাগের চাকরির জন্য নাম লেখাতে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে হতো। প্রতিরক্ষা সার্ভিসে প্রবেশের জন্য বাঙালিদের কোনো রকম উৎসাহ দেওয়া হতো না।
- (iii) প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়েছিল।
- (iv) প্রতিরক্ষা বিভাগে নিযুক্ত বেশির ভাগ সদস্যকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়োগ দেওয়া হতো। ফলে ২০-২২ বছর বয়সী যুবকেরা নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে চাকরি করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলত।

৫. দৈহিক যোগ্যতা :

যেসব বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ করা হতো তাদের প্রায় সকল সদস্যই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রার্থীদের এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিত। তাছাড়া সামরিক বাহিনীর জোয়ান পদে এমন সব দৈহিক যোগ্যতা আরোপ করা হতো যা বাঙালি ছেলেরদের থাকত না। যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের পদচারণা ছিল খুবই কম।

৬. নিয়োগের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবিদের প্রাধান্য :

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালিরা খুবই অবহেলিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করতো যে, বাঙালিরা পশতুন বা পাঞ্জাবিদের মতো 'সাহসী' নয়। তাই সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৭% এরও কম এবং অফিসার পর্যায় প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। সশস্ত্র বাহিনীর ৮৫% সদস্যই ছিল পাঞ্জাবি। যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের সাক্ষ্য বহন করে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য : পূর্ব পাকিস্তানিদের দুর্দশার অন্যতম কারণ হল অর্থনৈতিক বৈষম্য। সামরিক শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের তুলনায় ৩২% বেশি। ১০ বছর পরে এ পার্থক্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১%। পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার দরুন তেমন কোন শিল্পকারখানা গড়ে উঠে নি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ভারী ও ব্যয়বহুল শিল্প কারখানার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদারভাবে অর্থ বরাদ্দ করে। পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে গণ্য করতেন। পাকিস্তানের ৫৬% লোকের বসতি পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু এখানকার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৫০-৫১/১৯৫৪-৫৫ সালে শতকরা ২০%। পরবর্তী পর্যায়ে এটা ৩০% এ এসেছিল। পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের ৫০ থেকে ৭০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব পাকিস্তানের পাট, চামড়া ও চা ইত্যাদি পণ্য হতে। কিন্তু বৈদেশিক আমদানির ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বরাবরই বঞ্চিত রাখা হয়েছে। পাকিস্তানি সরকার কেবল পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি, ব্যবসায়ি, শিল্পপতি ও আমলাদের স্বার্থ রক্ষাই যেন কেবল করেছে। এ বৈষম্যের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। পাকিস্তানের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যের একটি পরিসংখ্যান (উন্নয়নের দশক পূর্ব) দেখানো হল :

গড় বাৎসরিক বাজেট মোট রাজস্ব ৬০০ কোটি টাকা।

দেশ রক্ষা খাতে ব্যয় মোট ৬০%। পূর্ব পাকিস্তান ১০%, পশ্চিম পাকিস্তান ৫০%।

বেসামরিক খাতে ব্যয় মোট ৪০%। পূর্ব পাকিস্তান ১৫%, পশ্চিম পাকিস্তান ২৫%।

অর্থাৎ, মোট রাজস্বের ৬০% আসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। অথচ এখানে ব্যয় হয় ২৫%। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তান হতে আয় ৪০%। কিন্তু সেখানে দেওয়া হয় ৭৫%।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় ক্ষেত্রে বৈষম্য : বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজমান ছিল তার একটি তালিকা দেওয়া হল : পশ্চিম পাকিস্তান রপ্তানি আমদানি পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানি আমদানি ৮২ কোটি টাকা ৪১% ২৩১.৫ কোটি টাকা ৭০% | ১১৫.৩ কোটি টাকা ৫৯% ১০০ কোটি টাকা ৩০% মোটকথা, পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যের ৫৯ ভাগ রপ্তানি করত পূর্ব পাকিস্তানে, অথচ তার মোট আমদানি পরিমাণ শতকরা মাত্র ৩০%। ভোগ্যপণ্য ও খাদ্য আমদানি করতেই এ সামান্য অর্থের সিংহভাগ ব্যয় হতো বলে উন্নয়নের কাজ বরাবর ব্যাহত হতো। উল্লিখিত সময়ে পাকিস্তানে ৪১% বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। কিন্তু তার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭০%। এ বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশই ব্যয় হতো সেখানকার উন্নয়নমূলক কাজে।

বৈদেশিক সাহায্য ক্ষেত্রে বৈষম্য : ১৯৬৫ সালে চীন পাকিস্তানকে ৬০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ঋণ দেয়। এর সিংহভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয় মাত্র ১,২৫,০০০ ডলার। এ সময়ে বিশ্বব্যাংক, রাশিয়া ও যুক্তরাজ্য প্রচুর ঋণ দেয়। এসব ঋণের বেশির ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য খরচ করা হয়।

কৃষি সংক্রান্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য : পূর্ব পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি উন্নয়নের ব্যাপারেও এখানে সীমাহীন বৈষম্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি। এছাড়া এখানে বছরে ২/৩টি ফসল হয়। তাই কৃষির প্রতি নজর দিলে এখানে একটি গতিশীল অর্থনীতি গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করে পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিখাতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন। কৃষির জন্য পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৬০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। কিন্তু এ অর্থ বেশির ভাগ পেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষকরা। যৌথ প্রকল্পের নামে বড় বড় সেচ প্রকল্পগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করেন এবং এ অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়। সেচ প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু বন্য়ার কবল হতে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ভূমিকে রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

বিদ্যুৎ উন্নয়নে বৈষম্য : বিদ্যুৎ উন্নয়নের কথাও বলা দরকার। ব্যাপক বিদ্যুতের ব্যবহার ও সরবরাহ জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন উপায়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৩% ও ১৭%। "পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের একটা বিরাট অংশ ব্যয় করা হতো। সিন্ধু অববাহিকায় দু'টি বৃহৎ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রায় ১৮০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়। অথচ পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদার জন্য পাঁচ বছরের (১৯৫৯-৬৪) খরচ করা হয় ১৪৫৩ মিলিয়ন ডলার।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য : শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যায় তা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছিল সেখানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা আনুপাতিক হারে হ্রাস পেতে থাকে। অথচ এ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিদ্যালয়ের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। আসলে পূর্ব পাকিস্তানিদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ রোধ এবং চাকরির ক্ষেত্রে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত রাখাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় দ্বিগুণ ছিল। সাত বছরে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৫ গুণ কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে দাঁড়ায় ৩০ গুণ। প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিশাল ব্যবধান ছিল। উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য কলম্বো পরিকল্পনা, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, কমনওয়েলথ এইড ইত্যাদি নানা ধরনের বৃত্তি ও অর্থ সাহায্যের অধিকাংশ সুযোগ সুবিধা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ত হানতে চেয়েছিল। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্য দেখানো হয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ২০৮৪ মিলিয়ন রুপি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭৯৭ মিলিয়ন রুপি। পাকিস্তানের সর্বমোট ৩৫টি বৃত্তির ৩০টি পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান এবং মাত্র ৫টি বরাদ্দ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।

চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য : পাকিস্তানি শাসনামলে চাকরির ক্ষেত্রেও বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। সামরিক ও বেসামরিক চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের বরাবর বঞ্চিত করা হয়। বিমান, নৌ সেনা সদরদপ্তরগুলো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এসব দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রির মূল্যের বৈষম্য : পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রির মধ্যে মূল্যগত বিরাট ব্যবধান ছিল। দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে চাল ও গমের দর যথাক্রমে ৫০.০০ ও ৩৫.০০ টাকা প্রতি মণ ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে চালের দাম ছিল ১৮.০০ টাকা এবং গমের দাম ছিল মাত্র ১০.০০ টাকা। সুতরাং, এ থেকে যে বৈষম্য ছিল তা বুঝা যায়।

প্রশাসনিক বৈষম্য: পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি ছিল সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তারা। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার ৯৫৪ জনের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ১১৯ জন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২০০০ কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯০০। ১৯৪৭ সালে করাচিকে রাজধানী করায় সরকারি অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপক হারে চাকরি লাভ করে। সরকারের সব দপ্তরের সদর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বাঙালির পক্ষে সেখানে গিয়ে চাকরি লাভ করা সম্ভব ছিল না।

মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য: ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের পূর্বাংশের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি ছিল। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ তে এ ব্যবধানের হার আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯.৪৬ শতাংশ। আর এ বৈষম্যমূলক প্রবৃদ্ধির পেছনে শুধু প্রাক বিভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চতর অর্থনৈতিক বিকাশস্তরই দায়ী ছিল না, পরবর্তীকালে অনুসৃত নানারকম বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতিও এ ব্যবধান বা বৈষম্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সক্রিয় অবদান রেখেছিল।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য: দুই অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬%। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অপরদিকে ৪৪% জনসংখ্যার পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। উর্দুভাষী ছিল মাত্র ৩.২৭%। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষা ও সুসমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা। প্রথমেই তারা বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এবং বাংলা ভাষাকে উর্দু বর্ণে লেখানোর ষড়যন্ত্র শুরু করে। বাঙালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য। বাঙালি সংস্কৃতিতে আঘাত হানার জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রচনাবলি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে হিন্দু প্রভাব বলে উল্লেখ করে সেখানেও বাধাদানের চেষ্টা করা হয়।

রাজস্ব আয় ও ব্যয়ে বৈষম্য: সরকারি রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। নিয়ে ছকের সাহায্যে উভয় অঞ্চলের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হলো : (১৯৬৫-১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮-১৯৬৯ সাল কোটি টাকায়)

খাত	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
আয়	৭২৮	১৭৮১.৭
ব্যয়	১৩৩৬.২	২৭৬৭.১
ঘাটতি	৬০৭.৭	৯৮৫.৪

ঘাটতি পূরণ ৬০৬.৭ ৯৮৫.৪

ঋণ বরাদ্দে বৈষম্য: ঋণ বিতরণকারী সংস্থাসমূহ বিশেষত পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক, পাকিস্তান শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন, হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ এরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ বরাদ্দে বৈষম্য করে।

অবকাঠামোগত বৈষম্য: ১৯৭০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫৫০ হাজার কিলোওয়াট। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৯৫৬ হাজার কিলোওয়াট। বার্ষিক মাথাপিছু বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ১৩ কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯২ কিলোওয়াট ঘণ্টা। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তাছাড়া সেনা ও নৌবাহিনীর সদরদপ্তর এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়।

আঞ্চলিক বিনিয়োগে বৈষম্য: ১৯৫০ এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট বিনিয়োগের ২১% থেকে ২৬%। ১৯৬০ এর দশকে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩২% থেকে ৩৬%। অপরদিকে রাজস্ব ও উন্নয়নখাত মিলে পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ করা হয় প্রথম দশকে ৭৪% থেকে ৭৯% এবং দ্বিতীয় দশকে ৬৪% থেকে ৬৮%।

সড়ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈষম্য: দেশবিভাগের সমসাময়িককালের এক হিসেব থেকে দেখা যায় পাকিস্তানে উন্নত সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল মোট ৮,৩৫২ মাইল। পূর্ব-বাংলায় ছিল মাত্র ৭৫৭ মাইল অর্থাৎ মোট উন্নত সড়কের মাত্র শতকরা ৯.০৬ ভাগ। সে তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নত সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ৭,৫৯৫ মাইল তথা মোট উন্নত সড়কের শতকরা ৯০.৯৪ ভাগ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন।

"আগরতলা ষড়যন্ত্র"

৬ জানুয়ারি, ১৯৬৮ সালে ২ জন সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান (সি. এস. পি) অফিসারসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের গ্রেফতার সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয় যে,

“গত মাসে (অর্থাৎ ডিসেম্বর, ১৯৬৭) পূর্ব-পাকিস্তানে উদঘাটিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।”

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই ষড়যন্ত্রকে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" নামে অভিহিত করে। এই একই অভিযোগে ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও গ্রেফতার করা হয়। [৪] ৩৫ জনকে আসামি করে সরকার পক্ষ মামলা দায়ের করে।

নামকরণ

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটিকে সরকারিভাবে নামকরণ করেছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার। এই মামলায় ৩৫ জনকে আসামি করা হয়। [

বিচার প্রক্রিয়া

প্রথমে আসামিদেরকে 'দেশরক্ষা আইন' থেকে মুক্তি দেয়া হয়। পরবর্তীতে 'আর্মি, নেভি অ্যান্ড এয়ারফোর্স অ্যাক্টে' শেখ মুজিবুর রহমান, সার্জেন্ট জহুরুল হক-সহ অন্যান্য আসামিকে পুনরায় গ্রেফতার করে সেন্ট্রাল জেল থেকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে স্থানান্তর করা হয়। মামলার বিচারের জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধি সংশোধন করে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে ৩৫ জনকে আসামি করে ১২১-(ক) এবং ১৩১ ধারায় মামলাটির শুনানি কার্যক্রম শুরু হয়।

অভিযোগনামা

'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য' শিরোনামের মামলার অভিযোগনামায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে,

“অভিযুক্তরা ভারতীয় অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিয়ে কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল।”

মামলার স্থান হিসেবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে অবস্থিত 'সিগন্যাল অফিসার মেসে' নির্ধারণ করা হয়। মামলাটির শেষ তারিখ ছিল ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে। [

গণঅভ্যুত্থান

বাংলাদেশের স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি একটি ঐতিহাসিক দিন। মুক্তিকামী নিপীড়িত জনগণের পক্ষে জাতির মুক্তি সনদ খ্যাত ৬ দফা এবং পরবর্তীতে ছাত্র সমাজের দেয়া ১১ দফা কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছিলো এ গণঅভ্যুত্থান।

এগারো দফা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্যের পটভূমিতে একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির বাস্তবায়ন এবং অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট আইউব খানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস বিশ শতকের ষাটের দশকের প্রথম দিকেই লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলনের সূচনা হলেও বঙ্গবন্ধুসহ গণহারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর নির্যাতনের ফলে ছয়দফা কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এরই পটভূমিতে গড়ে উঠা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) ও ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) যখন স্বৈরাচারী আইউব সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেগবান করতে ব্যর্থ হয়, তখন ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এক ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং অচিরেই এ আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মেনন ও মতিয়া গ্রুপ রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলে। এ দুই সংগঠন ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে ‘ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে এবং আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে নিম্নোক্ত ১১-দফা দাবি ঘোষণা করে।

এগারো দফা

- ১। (ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্ববস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।
- (খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্ত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্সিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।
- (গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই.এ, আই.এস-সি, আই.কম ও বি.এ, বিএস-সি, বি.কম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এম.এ ও এম.কম ক্লাস চালু করিতে হইবে।
- (ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।
- (ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক ‘সাবসিডি’ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।
- (চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।
- (ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।
- (জ) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।
- (ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিনেন্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।
- (ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেরও ক্লাশ দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।
- (ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের ‘কনডেন্সড কোর্সের’ সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।
- (ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই.ই.আর ছাত্রদের দশ-দফা; সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম.বি.এ ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা ‘ফ্যাকাল্টি’ করিতে হইবে।
- (ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের কনডেন্সড কোর্সের দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, স্টিমায়ে ও লঞ্চের ছাত্রদের ‘আইডেন্টিটি কার্ড’ দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ‘কন্সেনসনে’ টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও ‘কন্সেনসন’ দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়া শহরের যে কোনো স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ ‘কন্সেনসন’ দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধাসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ ‘কন্সেনসন’ দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক- স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে:

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এজিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫। ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেটো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও ছলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে রুজুকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির ব্যাপক প্রতিফলন ঘটে। এগারো দফায় বাঙালি মধ্যবিত্ত কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দাবিও অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এগারো দফার আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করে এবং আইউব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যত চলে আসে ছাত্র-নেতৃবৃন্দের হাতে। ছাত্র আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে তুঙ্গে উঠে এবং মধ্য জানুয়ারিতে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় ছাত্র সমাজের এগারো দফা আন্দোলন প্রত্যক্ষ অবদান রাখে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শহীদের নাম হলো ড. মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা, শহীদ আসাদ (আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান), শহীদ মতিউর রহমান, এবং শহীদ রুস্তম। এছাড়া, এই গণআন্দোলনে আরও অনেকে শহীদ হয়েছিলেন, যেমন প্রেসকর্মী ইসহাক, ছাত্রনেতা নূরুল ইসলাম খোকা, এবং চাকুরীজীবী রহমতুল্লাহ।

কিছু উল্লেখযোগ্য শহীদের তথ্য:

ড. মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা: তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি এই গণআন্দোলনের প্রথম শহীদ হওয়া বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত।

শহীদ আসাদ (আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান): তিনি ছিলেন একজন ছাত্রনেতা এবং ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে তিনি শহীদ হন।

শহীদ মতিউর রহমান: তিনি ছিলেন ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের তিন শহীদের মধ্যে একজন।

শহীদ রুস্তম: ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের আরেক পথিকৃৎ শহীদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন।

এছাড়া, বিভিন্ন তারিখে শহীদের তালিকা পাওয়া যায়, যেমন:

ইসহাক: নাজিরাবাজারে প্রেসকর্মী।

নূরুল ইসলাম খোকা: রাজশাহী সিটি কলেজের ছাত্রনেতা।

রহমতুল্লাহ: নাজিরাবাজারে চাকুরীজীবী।

ঘটনাপ্রবাহ

৪ঠা জানুয়ারি - সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি পেশ করেন।[২]

৭ ও ৮ জানুয়ারি - গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাজনৈতিক এক্য ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি বা ড্যাক (DAC) গঠিত হয়।

২০ জানুয়ারি - ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষনের ঘটনায় নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান।

২৪ জানুয়ারি - পুলিশের গুলিতে নিহত হন নবকুমার ইন্সটিটিউটের কিশোর ছাত্র মতিয়ুর রহমান-সহ আরো অনেকে।

১৫ ফেব্রুয়ারি - কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে আটক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক কে হত্যা। [৩]

১৮ ফেব্রুয়ারি - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৌন মিছিলে গুলি চালালে নিহত হন শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা।

২২ ফেব্রুয়ারি - আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দান

২৬ ফেব্রুয়ারি - বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক আহবান করেন। পরবর্তীতে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন

প্রাপ্তবয়স্ক এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন দু'দফায় যথাক্রমে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ এবং ১৭ই জানুয়ারি ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রধান দু'টি দল হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন 'আওয়ামী লীগ' এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি'। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইস্যু ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা। অপরদিকে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রচারণার মূল বিষয়বস্তু ছিল- 'শক্তিশালী কেন্দ্র', 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' এবং অব্যাহত ভারত বিরোধিতা। নিচে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব তুলে ধরা হলো।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলঃ

ফলে ততকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটলে, তার স্থলাভিষিক্ত হোন আরেক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান। এবং পূর্ব পাকিস্তানে(বাংলাদেশ) আন্দোলনের ফলে ২৬ মার্চ ১৯৬৯ সালে তিনি ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ঘোষণা দিতে বাধ্য হোন। তো, ঘোষণা অনুযায়ী, জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হয় ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয় ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাদেশিক নির্বাচন। ১৯৭০ সালে একই সাথে কেন্দ্রীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঐ নির্বাচন ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় পরিষদ: সমগ্র পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল ৩১৩ টি। এর মধ্যে সাধারণ আসন ছিল ৩০০ টি এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ছিল ১৩ টি। ৩১৩ আসনের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ছিল ১৬৯ টি। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ছিল ১৪৪ টি। নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামীলীগ পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬৯ টি সাধারণ আসনের মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ মোট ১৬৭ টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি ১৩৮ টি সাধারণ আসনের মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ সর্বমোট ৮৮ টি আসন পায়।

প্রাদেশিক পরিষদ: সমস্ত পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৬২১ টি। নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামীলীগ ৩০০ টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২৮৮ এবং সংরক্ষিত ১০ টি আসনের সবকয়টিসহ মোট ২৯৮ টি আসনে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে পিপিপি'র চরম পরাজয় ঘটে। নিম্নে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলের একটি চার্ট দেওয়া হলো:

দল	প্রার্থী	সাধারণ আসন	মহিলা আসন	মোট
আওয়ামীলীগ	৩০০	২৮৮	১০	২৯৮
পিডিপি	১৪৪	২	০	২
জামায়াতে ইসলামী	১৭৪	১	০	১
ন্যাপ	১০৭	১	০	১
স্বতন্ত্র	৪৮	৮	০	৮
মোট	৩০০	১০	৩১০	

মুক্তিযুদ্ধ

জেনারেলদের ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী ছিল সেনাশাসক আইয়ুব খানের একসময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো। হঠাৎ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লারকানায় ‘পাখি শিকার’ করতে আমন্ত্রণ জানাল। ‘পাখি শিকার’ করতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগ দিল পাকিস্তানের বাঘা বাঘা জেনারেল। বাঙালিদের হাতে কেমন করে ক্ষমতা না দেয়া যায় সেই ষড়যন্ত্রের নীল নকশা সম্ভবত সেখানেই তৈরি হয়েছিল।

ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চলতে থাকলেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেটি বাইরে বোঝাতে চাইল না। তাই সে ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করল ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। সবাই তখন গভীর আগ্রহে সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

এর মাঝে ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের ভালোবাসা এবং মমতার শহীদ দিবস উদযাপিত হলো অন্য এক ধরনের উন্মাদনায়। শহীদ মিনারে সেদিন মানুষের ঢল নেমেছে, তাদের বুকের ভেতর এর মাঝেই জন্ম নিতে শুরু করেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালিদের সেই উন্মাদনা দেখে পাকিস্তান সেনাশাসকদের মনের ভেতরে যেটুকু দ্বিধাভ্রম ছিল সেটিও দূর হয়ে গেল। জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিল সংখ্যালঘু দলে, তার ক্ষমতার অংশ পাবার কথা নয়, কিন্তু সে ক্ষমতার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ঠিক দুই দিন আগে ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দিল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বুকের ভেতর ক্ষোভের যে বারুদ জমা হয়ে ছিল, সেখানে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করল। সারাদেশে বিক্ষোভের যে বিস্ফোরণ ঘটল তার কোনো তুলনা নেই।

উত্তাল মার্চ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেছে, এ ঘোষণাটি যখন রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে, তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের সাথে কমনওয়েলথ একাদশের খেলা চলছে। মুহূর্তের মাঝে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঢাকা স্টেডিয়াম হয়ে ওঠে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকান-পাট সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে আসে, পুরো ঢাকা শহর দেখতে দেখতে একটি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়ে যায়। মানুষের মুখে তখন উচ্চারিত হতে থাকে স্বাধীনতার শ্লোগান: ‘জয় বাংলা’ ‘বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।’

বঙ্গবন্ধু ঢাকা এবং সারাদেশে মিলিয়ে ৫ দিনের জন্যে হরতাল ও অনিদিষ্টকালের জন্যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। সেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারকে কোনোভাবে সাহায্য না করার কথা বলেছিলেন এবং তাঁর মুখের একটি কথায় সারা পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে গেল। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে কারফিউ দেয়া হলো ছাত্র জনতা সেই কারফিউ ভেঙে পথে নেমে এল। চারিদিকে মিছিল, শ্লোগান আর বিক্ষোভ, সেনাবাহিনীর গুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছে তারপরেও কেউ থেমে রইল না, দলে দলে সবাই পথে নেমে এল।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হলো। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় জাতীয় সংগীত হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি নির্বাচন করা হলো।

পাঁচদিন হরতালের পর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিতে এলেন। ততদিনে পুরো পূর্ব পাকিস্তান চলছে বঙ্গবন্ধুর কথায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর ভাষণ শুনতে এসেছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আক্ষরিক অর্থে একটি জনসমুদ্র। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ভাষণ খুব বেশি দেয়া হয়নি। এই ভাষণটি সেদিন দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অকাতরে প্রাণ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার শক্তি জুগিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে একদিকে যখন সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছে অন্যদিকে প্রতিদিন দেশের আনাচে কানাচে পাকিস্তান মিলিটারির গুলিতে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে। পাকিস্তান মিলিটারির গতিবিধি থামানোর জন্যে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা পথে পথে ব্যারিকেড গড়ে তুলছে। সারাদেশে ঘরে ঘরে কালো পতাকার সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। দেশের ছাত্র-জনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে ট্রেনিং নিচ্ছে। মাওলানা ভাসানী ৯ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় পরিষ্কার ঘোষণা দিয়ে বলে দিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেন আলাদা করে তাদের শাসনতন্ত্র তৈরি করে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে নিজেদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে নেবে। ঠিক এই সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণহত্যার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠাল, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোনো বিচারপতি তাকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে রাজি হলেন না। ইয়াহিয়া খান নিজে মার্চের ১৫ তারিখ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার ভান করতে থাকে, এর মাঝে প্রত্যেক দিন বিমানে করে ঢাকায় সৈন্য আনা হতে থাকে। যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র এসে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে, কিন্তু জনগণের বাধার কারণে সেই অস্ত্র তারা নামাতে পারছিল না। ২১ মার্চ এই ষড়যন্ত্রে ভুট্টো যোগ দিল, সদলবলে ঢাকা পৌঁছে সে আলোচনার ভান করতে থাকে।

১৯ মার্চ জয়দেবপুরে বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করে বসে। তাদের থামানোর জন্যে ঢাকা থেকে যে সেনাবাহিনী পাঠানো হয় তাদের সাথে সাধারণ জনগণের সংঘর্ষে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস, কিন্তু সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট আর গভর্নমেন্ট হাউজ ছাড়া সারা বাংলাদেশে কোথাও পাকিস্তানের পতাকা খুঁজে পাওয়া গেল না। ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসাতেও সেদিন ‘আমার সোনার বাংলা’ গানের সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হলো।

পরদিন ২৪ মার্চ, সারাদেশে একটি থমথমে পরিবেশ মনে হয় এই দেশের মাটি, আকাশ, বাতাস আগেই গণহত্যার খবরটি জেনে গিয়ে গভীর আশঙ্কায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে ছিল।

গণহত্যার শুরু : অপারেশন সার্চলাইট

গণহত্যার জন্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ তারিখটা বেছে নিয়েছিল কারণ সে বিশ্বাস করত এটা তার জন্যে একটি শুভদিন। দুই বছর আগে এই দিনে সে আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যার আদেশ দিয়ে সে সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম পাকিস্তানে যাত্রা শুরু করে দিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে বলেছিল, ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে! গণহত্যার নিখুঁত পরিকল্পনা অনেক আগে থেকে

করা আছে সেই নীল নকশার নাম অপারেশন সার্চলাইট, সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে কেমন করে আলাপ আলোচনার ভান করে কালক্ষেপণ করা হবে, কীভাবে বাঙালি সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করা হবে, সোজা কথায়, কীভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

শহরের প্রতিটি রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে দেরি হবে তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাত সাড়ে এগারোটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের কাজ শুরু করে দিল। শুরু হলো পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ, এই হত্যাযজ্ঞের যেন কোনো সাক্ষী না থাকে সেজন্যে সকল বিদেশী সাংবাদিককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তারপরেও সাইমন ড্রিং নামে একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা শহরে লুকিয়ে এই ভয়াবহ গণহত্যার খবর ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে জানিয়েছিলেন।

ঢাকা শহরের নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পাকিস্তান মিলিটারি সব বাঙালি অফিসারকে হয় হত্যা না হয় গ্রেপ্তার করে নেয়, সাধারণ সৈন্যদের নিরস্ত্র করে রাখে। পিলখানায় ই.পি. আরদেরকেও নিরস্ত্র করা হয়েছিল, তারপরেও তাদের যেটুকু সামর্থ্য ছিল সেটি নিয়ে সারারাত যুদ্ধ করেছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়নি এবং এই পুলিশবাহিনীই সবার আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সত্যিকার একটি যুদ্ধ শুরু করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনেক ক্ষতি স্বীকার হয়ে পিছিয়ে গিয়ে ট্যাংক, মর্টার, ভারী অস্ত্র, মেশিনগান নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত রাজারবাগ পুলিশ লাইনের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

২৫ মার্চের বিভীষিকার কোনো শেষ নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসে ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) আর জগন্নাথ হলের সব ছাত্রকে হত্যা করল। হত্যার আগে তাদের দিয়েই জগন্নাথ হলের সামনে একটি গর্ত করা হয়, যেখানে তাদের মৃতদেহকে মাটি চাপা দেয়া হয়। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যটি বুয়েটের প্রফেসর নূর উল্লাহ তাঁর বাসা থেকে যে ভিডিও করতে পেরেছিলেন, সেটি এখন ইন্টারনেটে মুক্তিযুদ্ধের আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে, পৃথিবীর মানুষ চাইলেই নিজের চোখে সেটি দেখতে পারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্রদের নয় সাধারণ কর্মচারী এমনকি শিক্ষকদেরকেও তারা হত্যা করে। আশেপাশে যে বস্তিগুলো ছিল সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে মেশিনগানের গুলিতে অসহায় মানুষগুলোকে হত্যা করে। এরপর তারা পুরানো ঢাকার হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলো আক্রমণ করে, মন্দিরগুলো গুঁড়িয়ে দেয়, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। যারা পালানোর চেষ্টা করেছে সবাইকে পাকিস্তান মিলিটারি গুলি করে হত্যা করেছে। ২৫ মার্চ ঢাকা শহর ছিল নরকের মতো, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে আগুন আর আগুন, গোলাগুলির শব্দ আর মানুষের আতর্জিতকার।

স্বাধীন বাংলাদেশ

কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাবার আগে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আহবান জানিয়ে গেলেন। তাঁর ঘোষণাটি তৎকালীন ই.পি.আর এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। যখন ঘোষণাটি প্রচারিত হয় তখন মধ্যরাত পার হয়ে ২৬ মার্চ হয়ে গেছে, তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬ মার্চ।

প্রতিরোধ আর প্রতিরোধ

ঢাকা শহরে পৃথিবীর একটি নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ২৭ মার্চ সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হলে শহরের ভয়াবহ নারী-পুরুষ-শিশু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে ছুটে যেতে লাগল। জেনারেল টিক্কা খান ভেবেছিল সে যেভাবে ঢাকা শহরকে দখল করেছে, এভাবে সারা বাংলাদেশকে এপ্রিলের দশ তারিখের দশ তারিখের মাঝে দখল করে নেবে। কিন্তু বাস্তবে সেটি সম্ভব হলো না। বিভিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা, এই দেশের ছাত্র-জনতা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার কোনো তুলনা নেই।

চট্টগ্রামে বাঙালি সেনাবাহিনী এবং ই.পি.আর বিদ্রোহ করে শহরের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবার স্বাধীনতা ঘোষণা পড়ে শোনান। এই ঘোষণাটি সেই সময় বাংলাদেশের সবার ভেতরে নতুন একটি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধেজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করতে হয় এবং বিমান আক্রমণ চালাতে হয়। বাঙালি যোদ্ধাদের হাত থেকে চট্টগ্রাম শহরকে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ হয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া এবং পাবনা শহর প্রথমে দখল করে নিলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে শহরগুলো পুনর্দখল করে এপ্রিলের মাঝামাঝি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে

রাখে। বগুড়া দিনাজপুরেও একই ঘটনা ঘটে। বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে শহরগুলোকে পুনর্দখল করে নেয়। যশোরে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করার সময় তারা বিদ্রোহ করে, প্রায় অর্ধেক সৈন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ হারালেও বাকিরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হয়ে আসতে পারে। কুমিল্লা, খুলনা ও সিলেট শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিজেদের দখলে রাখলেও বাঙালি সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই সময়ে পাকিস্তান থেকে দুইটি ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে নিয়ে আসে। এছাড়াও পরবর্তী সময়ে অসংখ্য মিলিশিয়া বাহিনী আনা হয়, তার সাথে সাথে আনা হয় যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র আর গোলা বারুদ। বিশাল অস্ত্রসম্ভার এবং বিমানবাহিনীর সাহায্যে নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি তারা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বড় বড় শহর নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পারে।

পাকিস্তান সরকার ১১ এপ্রিল টিঙ্কা খানের পরিবর্তে জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজীকে সশস্ত্রবাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। মুক্তিযোদ্ধারা তখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার জন্যে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

শরণার্থী

২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু করার পর বাংলাদেশে কেউই নিরাপদ ছিল না। তবে আওয়ামী লীগের কর্মী বা সমর্থক আর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে এরকম তরুণেরাও সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু ছিল। সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের মাঝে ছিল কমবয়সী মেয়েরা। সেনাবাহিনীর সাথে সাথে বাংলাদেশের বিহারি জনগোষ্ঠীও বাঙালি নিধনে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের ভয়ংকর অত্যাচারে এই দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী পাশের দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসংঘ কিংবা নিউজ উইকের হিসেবে মোট শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি। সে সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যাই ছিল মাত্র সাত কোটি যার অর্থ দেশের প্রতি সাতজন মানুষের মাঝে একজনকেই নিজের দেশ ও বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে পাশের দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ভারত এই বিশাল জনসংখ্যাকে আশ্রয় দিয়েছিল, কিন্তু তাদের ভরণপোষণ করতে গিয়ে প্রচণ্ড চাপের মাঝে পড়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আগরতলায় মোট অধিবাসী থেকে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। শরণার্থীদের জীবন ছিল খুবই কষ্টের, খাবার অভাব, থাকার জায়গা নেই, রোগে শোকে জর্জরিত, কালেরা ডায়রিয়া এরকম রোগে অনেক মারা যায়। ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, যুদ্ধ শেষে কোনো কোনো শরণার্থী ক্যাম্পে একটি শিশুও আর বেঁচে নেই।

বাংলাদেশ সরকার

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আকাজ্খা এই দেশের মানুষের বুকের মাঝে জাগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে যে মানুষটি এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাজউদ্দিন আহমেদ। তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে তাঁদের নিজেদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ৩০ মার্চ সীমান্ত পাড়ি দেয়। তখন তাঁর সাথে অন্য কোনো নেতাই ছিলেন না, পরে তিনি তাঁদের সবার সাথে যোগাযোগ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। এপ্রিলের ১০ তারিখ মুজিবনগর থেকে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সনদ ঘোষণা করা হয়। এই সনদটি দিয়েই বাংলাদেশ নৈতিক এবং আইনগতভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই নতুন রাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা) বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে শপথ গ্রহণ করে তাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। তাদের প্রথম দায়িত্ব বাংলাদেশের মাটিতে রয়ে যাওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা।

পালটা আঘাত

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধগুলো ছিল পরিকল্পনামূলক এবং অপ্রস্তুত। ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের সংগঠিত করে পালটা আঘাত হানতে শুরু করে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফের দায়িত্ব দেয়া হয় কর্নেল (অবঃ) এম.আতাউল গণি ওসমানীকে, চিফ অফ স্টাফ করা হয় লে. কর্নেল আবদুর রবকে এবং ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে.খন্দকারকে। পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ১নং সেক্টরের (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম) কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। ২নং সেক্টরের (নোয়াখালি, কুমিল্লা, দক্ষিণ ঢাকা, আংশিক ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, তারপর ক্যাপ্টেন আব্দুস সালেক চৌধুরী এবং সবশেষে ক্যাপ্টেন এ.টি.এম হায়দার। ৩নং সেক্টরের (উত্তর ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহের অংশবিশেষ)

কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর কে.এম সফিউল্লাহ এবং তারপর মেজর এ.এন.এম. নুরুজ্জামান। ৪, ৫ এবং ৬নং সেক্টরের (যথাক্রমে দক্ষিণ সিলেট, উত্তর সিলেট এবং রংপুর, দিনাজপুর) কমান্ডার যথাক্রমে মেজর সি.আর.দত্ত, মেজর মীর শওকত আলী এবং উইং কমান্ডার এম.কে বাশার। ৭নং সেক্টরের (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা) কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক, একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর পর মেজর কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেন। ৮নং সেক্টরের (কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এবং তারপর মেজর এম.এ মনজুর। ৯নং সেক্টরের (খুলনা, বরিশাল) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.এ.জলিল। ১০নং সেক্টর ছিল নৌ-অঞ্চলের জন্যে, সেটি ছিল সরাসরি কমান্ডার ইন চিফের অধীনে। কোনো অফিসার ছিল না বলে এই সেক্টরের কোনো কমান্ডার ছিল না। নৌ-কমান্ডার যখন যে সেক্টরে তাদের অভিযান চালাতেন, তখন সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করতেন। এই নৌ-কমান্ডার অপারেশন জ্যাকপটের অধীনে একটি অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়ে আগস্টের ১৫ তারিখ চট্টগ্রামে অনেকগুলো জাহাজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১১নং সেক্টরের (টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.আবু তাহের, নভেম্বরে একটি সম্মুখযুদ্ধে আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এর দায়িত্ব পালন করেন।

এই এগারোটি সেক্টর ছাড়াও জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ এবং শফিউল্লাহর নেতৃত্বে তাঁদের ইংরেজি নামের অদ্যাক্ষর ব্যবহার করে জেড ফোর্স, কে ফোর্স এবং এস ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড তৈরি করা হয়। এছাড়াও টাঙ্গাইল আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি অঞ্চলভিত্তিক বাহিনী ছিল। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি যে শুধু কাদেরিয়া বাহিনী নামে একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত বাহিনী গড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তা নয়, এই বাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে সশস্ত্রবাহিনীর সাথে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীও যোগ দিয়েছিল এবং এই যুদ্ধে প্রথম বিমান আক্রমণের কৃতিত্বও ছিল বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান মিলিটারির নাকের ডগায় ঢাকা শহরে দুঃসাহসিক গেরিলা অপারেশন করে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ত্র্যাক প্লাটুন নামে দুঃসাহসী তরুণ গেরিলাযোদ্ধার একটি দল।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সত্যিকার অর্থে একটি জনযুদ্ধ। এই দেশের অসংখ্য ছাত্র-জনতা-কৃষক-শ্রমিক যোগ দেয় সমতল ও পাহাড়ী আদিবাসী মানুষ। মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ে জুতো কিংবা গায়ে কাপড় ছিল না, প্রয়োজনীয় অস্ত্র ছিল না এমনকি যুদ্ধ করার জন্যে প্রশিক্ষণ নেবার সময় পর্যন্ত ছিল না। খালেদ মোশাররফের ভাষায়, যুদ্ধক্ষেত্রেই তাদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। তাদের বুকের ভেতরে ছিল সীমাহীন সাহস আর মাতৃভূমির জন্যে গভীর মমতা। বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী যখন প্রচলিত পদ্ধতিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাথে যুদ্ধ করেছে, তখন এই গেরিলাবাহিনী দেশের ভেতরে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে তাদেরকে বাধ্য করেছে তাদের গতিবিধি নিজেদের ঘাঁটির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি, কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধাদের মতোই অবদান রেখেছিল, সেরকম প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহায্যে এই বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সেই সময়ের অনেক দেশের গান এখনো বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানের কথা আলাদা করে না বললে ইতিহাসটি অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা জন্যেই মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করতে পেরেছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন, এমনকি অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন।

দেশদ্রোহী দল

বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো বন্ধু ছিল না, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কিছু দেশদ্রোহী। বাংলাদেশের মানুষ এদের সবাইকে নির্বাচনে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই দেশদ্রোহী মানুষগুলো ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়েরউদ্দিন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ুম মুসলিম লীগের খান এ সবুর খান, জামায়াতে ইসলামীর গোলাম আযম এবং নেজামে ইসলামীর মৌলভী ফরিদ আহমেদ। এদের মাঝে জামায়াতে ইসলামী নামের রাজনৈতিক দলটির কথা আলাদা করে বলতে হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে রাজাকারবাহিনী তৈরি করা হয়েছিল সেটি ছিল মূলত জামায়াতে ইসলামীরই সশস্ত্র একটি দল। সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল জেনারেল নিয়াজীর কাছে এটা নিয়ে অভিযোগ করলে জেনারেল নিয়াজী তার অধস্তন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয় তখন থেকে রাজাকারদের আলবদর এবং আলশামস

বলে ডাকতে! এই রাজাকার কিংবা আলবদর ও আলশামসের মুক্তিযোদ্ধাদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা বা সাহস কোনোটাই ছিল না, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পদলেহী হিসেবে থেকে এরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার এবং নির্যাতন করেছে তার অন্য কোনো নজির নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই দেশের মানুষকে চিনত না- আলবদর, আলশামস প্রকৃত অর্থ যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের মানুষের কাছে এর চাইতে ঘৃণিত কোনো শব্দ নেই, কখনো ছিল না কখনো থাকবে না।

দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রবাসী অনেক বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্যে টাকা তুলেছেন, পাকিস্তানের গণহত্যার কথা পৃথিবীকে জানিয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরি করেছেন। যাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, তাঁরা হচ্ছেন জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী, স্থপতি এফ.আর. খান, প্রফেসর মুহম্মদ ইউনুস এবং প্রফেসর রেহমান সোবহান। শুধু যে বাংলাদেশের মানুষই এগিয়ে এসেছিলেন তা নয়, আগস্টের ১ তারিখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে রবিশংকর, জর্জ হ্যারিসন সহ অসংখ্য শিল্পীকে নিয়ে স্মরণার্থীত কালের বৃহত্তম একটি কনসার্ট সারা পৃথিবীর বিবেককে নাড়িয়ে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি অ্যালেন গিনসবার্গ শরণার্থীদের কষ্ট নিয়ে সেন্টেম্বর অন যশোর রোড' নামে যে অসাধারণ কবিতাটি রচনা করেন, সেটি এখনো মানুষের বুকে শিহরণের সৃষ্টি করে।

পক্ষের দেশ বিপক্ষের দেশ

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার কথা পৃথিবীতে প্রচার হওয়ার পর পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেরই সমবেদনা বাংলাদেশের পক্ষে ছিল, তবে দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পাকিস্তানের পক্ষে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। একাত্তরে যদিও ইসলামের নামে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলমানকেই হত্যা করা হচ্ছিল, তার পরেও পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশও পাকিস্তানের পক্ষে থেকে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। যদিও রাজনৈতিক কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার দৃশ্য দেখে সে সময়কার মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্চার কে.রুড ক্ষুব্ধ হয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টে যে টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন সেটি কূটনৈতিক জগতে সবচেয়ে কঠিন ভাষায় লেখা চিঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের একেবারে শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সপ্তম নৌবহরের যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নও নিউক্লিয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত যুদ্ধজাহাজ এই এলাকায় রওনা করিয়ে দিয়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটি সত্যি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের দুই পরাশক্তি নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথবাহিনীর জয় একেবারে সুনিশ্চিত তখন সেই বিজয়ের মুহূর্তটিকে থামিয়ে দেবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়ে এ প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে আমাদের বিজয়ের পথ সুনিশ্চিত করেছিল। তবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে দেশটির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি, সেই দেশ হচ্ছে ভারত। এই দেশটি প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ আর আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর ভারত মুক্তিবাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়। এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় দেড়হাজার সৈনিক প্রাণ দিয়েছিল।

যৌথবাহিনী

জুলাই মাসের দিকে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করে অক্টোবর মাসের ভেতর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী দেখতে দেখতে শক্তিশালী আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্ডার আউটপোস্টগুলো নিয়মিতভাবে আক্রমণ করে দখল করে নিতে শুরু করে। গেরিলাবাহিনীর আক্রমণও অনেক বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই আক্রমণের জবাব দিত রাজাকারদের নিয়ে গ্রামের মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে আর স্থানীয় মানুষদের হত্যা করে। ততদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, তারা আর সহজে তাদের ঘাঁটির বাইরে যেতে চাইত না।

বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখতে দেখতে এত খারাপ হয়ে গেল যে পাকিস্তান তার সমাধান খুঁজে না পেয়ে ডিসেম্বরে তিন তারিখ ভারত আক্রমণ করে বসে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ আক্রমণ করে ভারতের বিমানবাহিনীকে পুরোপুরি পঙ্গু করে দেবে, কিন্তু সেটি করতে পারল না। ভারত সাথে সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে

বাংলাদেশে তার সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ভেতর তখন পাকিস্তানের পাঁচটি পদাতিক ডিভিশন। যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আক্রমণের জন্য তিনগুণ বেশি অর্থাৎ ১৫ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভারতীয়রা মাত্র আট ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার সাহস পেয়েছিল। কারণ তাদের সাথে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী। সেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে এর মাঝেই পুরোপুরি অচল করে রাখতে পেরেছিল। শুধু যে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তা নয় এই যুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষও ছিল যৌথবাহিনীর সাথে। যুদ্ধ শুরু হবার পর সেটি চলেছে মাত্র তেরো দিন। একেবারে প্রথম দিকেই বোমা মেরে এয়ারপোর্টগুলো অচল করে দেবার পর পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের সব পাইলট পালিয়ে গেল পাকিস্তানে। সমুদ্রে যে কয়টি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ ছিল সেগুলো ডুবিয়ে দেবার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাকি রইল শুধু তার স্থলবাহিনী। নিরীহ জনসাধারণ হত্যা করতে তারা অসাধারণ পারদর্শী কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধে কেমন করে, সেটি দেখার জন্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একটি একটি করে পাকিস্তানের ঘাঁটির পতন হতে থাকল। তারা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে অল্পকিছু জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে রইল। ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিবাহিনী তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঢাকার কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে যায়। মেঘনা নদীতে কোনো ব্রিজ ছিল না, সাধারণ মানুষ তাদের নৌকা দিয়ে সেনাবাহিনীকে তাদের ভারী অস্ত্রসহ পার করিয়ে আনল। ঢাকায় জেনারেল নিয়াজী এবং তার জেনারেলরা বাংলাদেশের যুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে যে দুটি বিষয়ের ওপর ভরসা করছিল, সেগুলো ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। প্রথমত, তারা বিশ্বাস করত পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে তারা ভারতকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করবে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর সরে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্যে উত্তর দিক থেকে আসবে চীনা সৈন্য আর দক্ষিণ দিক থেকে আসবে আমেরিকান সৈন্য। কিন্তু দেখা গেল, তাদের দুটি ধারণাই ছিল পুরোপুরি ভুল। পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানিরাই চরমভাবে পর্যুদস্ত হলো আর কোনো চীনা বা আমেরিকান সৈন্য তাদের সাহায্যে জন্যে এগিয়ে এল না!

আত্মসমর্পণ

মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহ্বান করল। গভর্নর হাউসে বোমা ফেলার কারণে তখন গভর্নর মালেক আর তার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান শেরাটনে) আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ লিফলেট ফেলেছে, সেখানে লেখা ‘মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো।’

ঢাকার ‘পরম পরাক্রশালী’ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথাটি দেখে একজন পাকিস্তানি জেনারেল দুর্বলভাবে একবার সেখান থেকে বাংলাদেশের নামটি সরানোর প্রস্তাব করেছিল কিন্তু কেউ তার কথাকে গুরুত্ব দিল না, ইতিহাসে সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই!

১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলা রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে মাথা নিচু করে বিদায় নেয়ার দলিলে স্বাক্ষর করল। যে বিজয়ের জন্যে এই দেশের মানুষ সুদীর্ঘ নয় মাস অপেক্ষা করছিল সেই বিজয়টি এই দেশের স্বজন হারানো সাতকোটি মানুষের হাতে এসে ধরা দিল।

বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানের সব সৈন্য আত্মসমর্পণ করে শেষ করতে করতে ডিসেম্বরের ২২ তারিখ হয়ে গেল।

প্রথম মুসলিম আক্রমণ করেছিলেন মোহাম্মদ বিন কাসিম (৭১২ খ্রি.)।

প্রথম তুর্কি আক্রমণটি করেছিলেন মাহমুদ গজনভি (৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ-১০৩০ খ্রি.): ১০২৫ সালে,

তিনি সোমনাথের সবচেয়ে বিখ্যাত হিন্দু মন্দির আক্রমণ ও লুট করেন।“

"ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

১৮। বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান কে ছিলেন ?

- ক) বখতিয়ার খিলজী খ) হোসেন শাহ
গ) ইলিয়াস শাহ ঘ) সরফরাজ খান

উত্তর - বখতিয়ার খিলজি

১৯। হযরত শাহজালাল (র) কোন শাসককে পরাজিত করে সিলেটে আযান ধ্বনি দিয়েছিলেন ?

- ক) বিক্রমাদিত্য খ) কৃষ্ণচন্দ্র
গ) গৌর গোবিন্দ ঘ) লক্ষ্মণ সেন

উত্তর - গৌর গোবিন্দ

২০. বাংলার কোন সুলতানের শাসনামলে স্বর্ণযুগ বলা হয় ?

- ক) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ খ) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

উত্তর - আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

২১. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কখন বৃহত্তর বাংলা শাসন করেন ?

- ক) ১৪৯৮-১৫১৬ খৃষ্টাব্দ খ) ১৪৯৮-১৫১৭ খৃষ্টাব্দ
গ) ১৪৯৮-১৫১৮ খৃষ্টাব্দ ঘ) ১৪৯৮-১৫১৯ খৃষ্টাব্দ

উত্তর - ১৪৯৮-১৫১৯ খৃষ্টাব্দ

২২. সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানীর নাম কি ?

- ক) সোনারগাঁ খ) জাহাঙ্গীরনগর
গ) ঢাকা ঘ) গৌড়

উত্তর - গৌড়

২৩. কোন শাসকের সময় থেকে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পরিচিত হয়ে উঠে বাঙ্গালাহ নামে ?

- ক) ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াছ শাহ
গ) আকবর ঘ) দীসা খান

উত্তর - শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

২৪. বাংলার কোন সুলতানের শাসনকালে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় ?

- ক) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ খ) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ

উত্তর - আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

২৫. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন-

- ক) হাজী ইলিয়াস শাহ খ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
গ) হুসাইন শাহ ঘ) মোহাম্মদ ঘুরী

উত্তর - ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

২৬। ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের ? / বাংলার কোন সুলতানের পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছিল?

- ক) গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ খ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
গ) ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ ঘ) ইলিয়াস শাহ

উত্তর - গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ

২৭। কোন ব্যক্তি বাংলাদেশকে 'ধনসম্পদপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেন ?

- ক) ফা হিয়েন খ) ইবনে বতুতা
গ) হিউয়েন সাং ঘ) ইবনে খালদুন

উত্তর - ইবনে বতুতা

২৮। ফা-হিয়েন কার শাসনামলে বাংলায় আসেন—

- ক) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত খ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
গ) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঘ) হর্ষবর্ধন

উত্তর - দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

২৯। চীন দেশীয় ইতিহাসের জনক সুমা-কিয়েন ভারতীয়

ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা করেন-

- ক) খ্রিঃ পূর্ব ৩য় শতকে খ) খ্রিঃ পূর্ব ৪র্থ শতকে
গ) খ্রিঃ পূর্ব ৫ম শতকে ঘ) খ্রিঃ পূর্ব ১ম শতকে

উত্তর - খ্রিঃ পূর্ব ১ম শতকে

৩০। হিউয়েন সাং বাংলায় (ভারতবর্ষে) এসেছিলেন যার আমলে-

- ক) সম্রাট অশোক খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
গ) শশাঙ্ক ঘ) হর্ষবর্ধন

উত্তর - হর্ষবর্ধন

৩১। কোন বাঙালি ৭ম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন ?

- ক) শীলভদ্র খ) অতীশ দীপংকর
গ) কাহুপা ঘ) জীমূতবাহন

উত্তর - শীলভদ্র

৩২। মেগাস্থিনিস তার কোন গ্রন্থে ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করেন ?

- ক) ইন্ডিয়া খ) ইন্ডিকা
গ) ইন্ডিয়ানা ঘ) ইন্ডাস

উত্তর - ইন্ডিকা

৩৩। বাংলায় প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক কে ?

- ক) ই-সিং খ) ফা হিয়েন
গ) হিউয়েন সাং ঘ) জেন ডং

উত্তর - ফা হিয়েন

৩৪। ইবনে বতুতা কার শাসনামলে বাংলায় আসেন?

- ক) শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ খ) হাজী ইলিয়াস শাহ
গ) হোসাইন শাহ ঘ) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ

উত্তর - ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

ইবনে বতুতা কোন শতকে বাংলায় আসেন ? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাঃ ২০১২ কর্ণফুলী/প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকঃ ০৯]

চতুর্দশ	পঞ্চদশ	ষষ্ঠদশ	অষ্টাদশ	গ)মান সিংহ	ঘ)শায়েস্তা খান
৩৫. প্রতাপ আদিত্য কে ছিলেন ?				উত্তর -ইসলাম খান	
ক)বাংলার বারো ভূঁইয়াদের একজন	খ)রাজপুত রাজা			৪৫.ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপনের সময় মোগল সুবেদার কে ছিলেন ?	
গ)বাংলার শাসক	ঘ)মোগল সেনাপতি			ক)ইসলাম খান	খ)ইব্রাহীম খাঁন
উত্তর -বাংলার বারো ভূঁইয়াদের একজন				গ)শায়েস্তা খান	ঘ)মীর জুমলা
৩৬. বারো ভূঁইয়া বলা হতো কোন আমলের জমিদারদেরকে ?				উত্তর -ইসলাম খান	
ক)পাল আমল	খ)মোঘল আমল			৪৫.ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন—	
গ)সুলতানি আমল	ঘ)সেন আমল			ক)শাহজাদা আজম খাঁ	খ)নবাব শায়েস্তা খাঁ
উত্তর -মোঘল আমল				গ) যুবরাজ	ঘ)সুবেদার ইসলাম খান
৩৭.ঈসা খাঁর রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল—				উত্তর -সুবেদার ইসলাম খান	
ক)গৌড়	খ)লক্ষনাবতী			৪৬.বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষকে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে কে রক্ষা করেন ?	
গ) মহাস্থানগড়	ঘ)সোনারগাঁ			ক)মুর্শিদকুলী খান	খ)ইসলাম খান
উত্তর -সোনারগাঁ				গ)শায়েস্তা খান	ঘ)ঈসা খান
৩৮.বাংলাদেশের বার ভূঁইয়ার অভ্যুত্থান ঘটে—				উত্তর -শায়েস্তা খান	
ক)বাবরের সময়	খ)আওরঙ্গজেবের সময়			৪৭.বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন নবাব কে ?	
গ)জাহাঙ্গীরের সময়	ঘ)আকবরের সময়			ক)নবাব সিরাজউদ্দৌলা	খ)মুর্শিদ কুলী খান
উত্তর -আকবরের সময়				গ)ইলিয়াস শাহ	ঘ)আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
৩৯.সোনারগাঁ কোন আমলে বাংলাদেশের রাজধানী ছিল ?				উত্তর -মুর্শিদ কুলী খান	
ক)পাল আমলে	খ)গুপ্ত যুগে			৪৮.সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয় কত সালে ?	
গ)মোঘল আমলে	ঘ)সেন আমলে			ক) ১৭০২	খ)১৭০৪
উত্তর :মোঘল আমলে				গ)১৭২৭	ঘ)১৭০৩
৪০.কোন মোঘল সুবেদার পর্তুগীজদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন ?				উত্তর -১৭০৩	
ক)কাসিম খান	খ)মীরজুমলা			৪৯.মীর কাশিম বাংলার রাজধানী কোথায় স্থানান্তর করেন ?	
গ)ইসলাম খান	ঘ)শায়েস্তা খান			ক)ঢাকা	খ) মুন্সের
উত্তর -শায়েস্তা খান				গ) তান্ডা	ঘ) মুর্শিদাবাদ
৪১.কোন মুঘল সম্রাটের সময় লালবাগ দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল?				উত্তর - মুন্সের	
ক)আকবর	খ)শাহজাহান			৫০.সমুদ্রগুপ্তকে বলা হয়—	
গ)জাহাঙ্গীর	ঘ)আওরঙ্গজেব			ক) নেপোলিয়ন অফ ইন্ডিয়া	খ) নেপোলিয়ন অফ বাংলা
উত্তর - আওরঙ্গজেব				গ) এশিয়ার নেপোলিয়ন	ঘ) নেপোলিয়ন অফ সুলতান
৪২।কোন নগরীতে মুঘল আমলে সুবে বাংলার রাজধানী ছিল ?				উত্তর -নেপোলিয়ন অফ ইন্ডিয়া	
ক)গৌড়	খ) সোনারগাঁও			৫১.চট্টগ্রামকে ‘পূর্ববাংলার দ্বার’ বলা হয় কার আমলে?	
গ) ঢাকা	ঘ)হুগলি			ক) ইসলাম খাঁ	খ) শায়েস্তা খাঁ
উত্তর - ঢাকা				গ) মীর জাফর	ঘ) আলিবর্দী খান
৪৩. কোন মুঘল সম্রাটের সময় বাংলা বিজিত হয় ?				উত্তর -শায়েস্তা খাঁ	
ক)বাবর	খ)জাহাঙ্গীর			৫২.বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?	
গ)আকবর	ঘ)আওরঙ্গজেব			ক) ১৫৭৬	খ) ১৬১০
উত্তর -জাহাঙ্গীর				গ) ১৬৫৭	ঘ) ১৭৫৭
৪৪. বাংলার প্রথম সুবাদার কে ছিলেন ?				উত্তর -১৬১০	
ক)মীর জুমলা	খ)ইসলাম খান				

১১০.পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কে ঘোষণা দেন যে রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু?

- ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ) লিয়াকত আলী খান
গ) খাজা নাজিমুদ্দিন ঘ) আইয়ুব খান

উত্তর -মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১১১.বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে প্রথম আন্দোলন শুরু হয়—

- ক) ১৯৪৭ সালে খ) ১৯৪৮ সালে
গ) ১৯৫০ সালে ঘ) ১৯৫২ সালে

উত্তর -১৯৪৭ সালে

১১২.ভাষা আন্দোলনের সময় গঠিত ছাত্র সংগঠনের নাম—

- ক) ছাত্র সমাজ খ) রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
গ) ছাত্রলীগ ঘ) ছাত্র ফেডারেশন

উত্তর -রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১১৩.বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব জাতীয় পরিষদে প্রথম উত্থাপন করেন কে?

- ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গ) এ কে ফজলুল হক

ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

উত্তর -ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

১১৪.গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্ররা কয় দফা দাবি উত্থাপন করেছিল?

- ক. ৫ দফা খ. ৬ দফা
গ. ১০ দফা ঘ. ১১ দফা

উত্তর :১১ দফা

১১৫. গণঅভ্যুত্থানকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন—

- ক. ইয়াহিয়া খান খ. মোনায়েম খান
গ. নূরুল আমিন ঘ. টিক্কা খান

উত্তর -মোনায়েম খান

১১৬.. গণঅভ্যুত্থান চলাকালে আইয়ুব খানের পদত্যাগের তারিখ—

- ক. ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ খ. ২৫ মার্চ ১৯৬৯
গ. ২৬ মার্চ ১৯৭১ ঘ. ৭ মার্চ ১৯৭১

উত্তর -২৫ মার্চ ১৯৬৯

১১৭. আইয়ুব খানের পতনের পর পাকিস্তানের ক্ষমতায় কে আসেন?

- ক. শেখ মুজিব খ. ইয়াহিয়া খান
গ. জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘ. নূরুল আমিন

উত্তর -ইয়াহিয়া খান

১১৮.সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়—

- ক. ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি খ. ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি
গ. ১৯৭০ সালের মার্চ ঘ. ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর

উত্তর -১৯৬৯ সালের জানুয়ারি

১১৯.গণঅভ্যুত্থান মূলত কোন ধরনের আন্দোলন ছিল?

- ক. ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন খ. সামরিক বিদ্রোহ
গ. শ্রমিক ধর্মঘট ঘ. কৃষক আন্দোলন

উত্তর -ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন

১২০.মুক্তিযুদ্ধে নৌসেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন—

- ক. কমোডর মহিউদ্দিন খ. ক্যাপ্টেন নূরুল হক
গ. ক্যাপ্টেন জলিল ঘ. মেজর রফিক

উত্তর -ক্যাপ্টেন নূরুল হক

১২১.স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম সম্প্রচার কোন তারিখে হয়?

- ক. ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ. ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ. ২৫ মে ১৯৭১ ঘ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

উত্তর -২৫ মে ১৯৭১

১২২.২ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর ছিল—

- ক. আগরতলা খ. সিলেট
গ. ত্রিপুরা ঘ. মেঘালয়

উত্তর-আগরতলা

১২৩.মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হলো-

- ক. অগ্নিশিখা খ. চরমপত্র
গ. দেশের গান ঘ. রণসংগীত

উত্তর -চরমপত্র

১২৪.মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে গঠিত বাংলাদেশ ফান্ডের বোর্ড অব ট্রাস্টার সদস্য কে ছিলেন?

- ক. রেহমান সোবহান খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ. শেখ মুজিবুর রহমান ঘ. আবু সাঈদ চৌধুরী

উত্তর -রেহমান সোবহান

১২৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় বেসামরিক গভর্নর কে ছিলেন?

- ক. ইয়াহিয়া খান খ. তাজউদ্দীন আহমদ
গ. খাজা নাজিমুদ্দিন ঘ. ডা. মালিক

উত্তর -ডা. মালিক

১২৬. মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিকে জাতিসংঘে ভাষণ প্রদানে বাধা দেয় কোন দেশ?

- ক. ভারত খ. যুক্তরাষ্ট্র গ. পাকিস্তান ঘ. চীন

উত্তর -চীন

১২৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ এলাকা নির্ধারণের জন্য কিসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়?

- ক. ভারতের সাহায্য লাভের
খ. সেক্টরগুলোকে বিলুপ্ত করার
গ. সেক্টরগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করার

ঘ. মুক্তিবাহিনীর সাহায্য

উত্তর- সেক্টরগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করার

১২৮.নবাবের ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানির দায়িত্বহীন ক্ষমতা ইতিহাসে কী নামে পরিচিত?

ক. দ্বৈতশাসন

খ. দেওয়ানি লাভ

গ. সূর্যাস্ত আইন

ঘ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

উত্তর -দ্বৈতশাসন

১২৯. দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটান কে?

ক. লর্ড কর্নওয়ালিস

খ. ওয়ারেন হেস্টিংস

গ. লর্ড ক্লাইভ

ঘ. লর্ড মিল্টন

উত্তর - ওয়ারেন হেস্টিংস

১৩০.ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের কুঠি ও দুর্গ নির্মাণের প্রধান কী উদ্দেশ্য ছিল?

ক. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন

খ. ধর্ম প্রচার

গ. আধিপত্য বিস্তার

ঘ. নাগরিকত্ব লাভ

উত্তর -অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন

১৩১. ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন কে?

ক. কলম্বাস

খ. আমেরিগো ভেসপুচি

গ. আল বুকাক

ঘ. ভাস্কো-দা-গামা

উত্তর -ভাস্কো-দা-গামা

১৩২. ভাস্কো-দা-গামা কত সালে কালিকট বন্দরে আসেন?

ক. ১৪৯৬

খ. ১৪৯৭

গ. ১৪৯৮

ঘ. ১৪৯৯

উত্তর- ১৪৯৮

১৩৩.মার্টিন লুথার কবে ৯৫ থিসিস প্রকাশ করেন?

ক) ১৪৯২ খ্রি.

খ) ১৫১৭ খ্রি.

গ) ১৫২১ খ্রি.

ঘ) ১৫৫৫ খ্রি.

উত্তর- খ) ১৫১৭ খ্রি.

১৩৪. লুথারের ৯৫ থিসিস মূলত কোন বিষয়ে লেখা হয়েছিল?

ক) রেনেসাঁ শিল্প

খ) চার্চে দুর্নীতি ও ইন্দালজেন্স বিক্রি

গ) প্রিন্টিং প্রেস

ঘ) ক্রুসেড

উত্তর -চার্চে দুর্নীতি ও ইন্দালজেন্স বিক্রি

১৩৫.ইনডালজেন্স বলতে কী বোঝায়?

ক) চার্চের অনুমতিপত্র, যা পাপ মোচনের প্রতিশ্রুতি দিত

খ) বাণিজ্যিক লাইসেন্স

গ) জমির দলিল

ঘ) রাজকীয় আইন

উত্তর -চার্চের অনুমতিপত্র, যা পাপ মোচনের প্রতিশ্রুতি দিত

১৩৬.মার্টিন লুথার কবে ৯৫ থিসিস প্রকাশ করেন?

ক) ১৪৯২ খ্রি.

খ) ১৫১৭ খ্রি.

গ) ১৫২১ খ্রি.

ঘ) ১৫৫৫ খ্রি.

উত্তর -১৫১৭ খ্রি.

১৩৭.ইয়াল্টা সম্মেলনের প্রধান তিন নেতা কারা ছিলেন?

ক) স্ট্যালিন, চার্চিল, রুজভেল্ট

খ) স্ট্যালিন, ট্রুম্যান, চার্চিল

গ) মুসোলিনি, হিটলার, চার্চিল

ঘ) চার্চিল, দ্য গল, ট্রুম্যান

উত্তর - স্ট্যালিন, চার্চিল, রুজভেল্ট

১৩৮.পটসডাম সম্মেলনে কোন নেতারা অংশ নেন?

ক) স্ট্যালিন, চার্চিল/অ্যাটলি, ট্রুম্যান

খ) স্ট্যালিন, চার্চিল, রুজভেল্ট

গ) মুসোলিনি, হিটলার, চার্চিল

ঘ) রুজভেল্ট, দ্য গল, চার্চিল

উত্তর - স্ট্যালিন, চার্চিল/অ্যাটলি, ট্রুম্যান

১৩৯. পটসডাম সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

ক) জার্মানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ

খ) জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা

গ) ন্যাটো গঠন

ঘ) কোরীয় যুদ্ধ শেষ করা

উত্তর - জার্মানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ

১৩৯. পটসডাম সম্মেলনে কোন দেশের আত্মসমর্পণ দাবি করা হয়?

ক) জার্মানি

খ) জাপান

গ) ইতালি

ঘ) ফ্রান্স

উত্তর -জাপান

১৪০.মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রতীক কী ছিল?

ক) কাস্তে ও হাতুড়ি

খ) ফ্যাসেস (কাঠের বাউল ও কুঠার)

গ) কালো পতাকা

ঘ) রোমান ঈগল

উত্তর -ফ্যাসেস (কাঠের বাউল ও কুঠার)

১৪১.হিটলারের শাসনে ইহুদিদের ওপর নির্যাতনকে কী বলা হয়?

ক) Holocaust

খ) Genocide

গ) Pogrom

ঘ) Blitzkrieg

উত্তর -Holocaust

১৪২.স্থায়ী বন্দোবস্ত কবে চালু হয়?

ক) ১৭৯৩ খ্রি.

খ) ১৮৩৩ খ্রি.

গ) ১৮১৩ খ্রি.

ঘ) ১৮৫৮ খ্রি.

উত্তর -১৭৯৩ খ্রি.

১৪৩. রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেন—

ক) স্যার থমাস মনরো

খ) কর্নওয়ালিস

গ) লর্ড রিপন

ঘ) উইলিয়াম বেন্টিন্কে

উত্তর -স্যার থমাস মনরো

১৪৪. সতীদাহ প্রথা বিলোপ করা হয় কবে?

ক) ১৮১৩ খ্রি.

খ) ১৮২৯ খ্রি.

গ) ১৮৫৩ খ্রি.

ঘ) ১৮৫৭ খ্রি.

উত্তর -১৮২৯ খ্রি.

145. সতীদাহ প্রথা বিলোপের কৃতিত্ব কার?

- ক) লর্ড রিপন খ) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্‌ক
গ) লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ) লর্ড কার্জন

উত্তর - লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্‌ক

146. ১৮৩৫ সালে কে ইংরেজি শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেন?

- ক) লর্ড ম্যাকলে খ) লর্ড রিপন
গ) লর্ড ওয়েলেসলি ঘ) লর্ড মিন্টো

উত্তর-লর্ড ম্যাকলে

147. উডস ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়—

- ক) ১৮২৯ খ্রি. খ) ১৮৫৪ খ্রি.
গ) ১৮৩৩ খ্রি. ঘ) ১৮৮২ খ্রি.

উত্তর - ১৮৫৪ খ্রি.

148. লর্ড রিপনকে বলা হয়—

- ক) ভারতীয় শিক্ষার জনক
খ) ভারতীয় স্বশাসনের অগ্রদূত
গ) আধুনিক ভারতের স্থপতি
ঘ) স্থায়ী বন্দোবস্তের জনক

উত্তর - ভারতীয় স্বশাসনের অগ্রদূত

149. ১৯০৯ সালের মরলে-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে কী প্রবর্তিত হয়?

- ক) দ্বৈত শাসন খ) পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা
গ) মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থা ঘ) নতুন রাজস্বনীতি

উত্তর - পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা

150. মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার কবে কার্যকর হয়?

- ক) ১৯০৯ খ্রি. খ) ১৯১৯ খ্রি.
গ) ১৯৩৫ খ্রি. ঘ) ১৮৮৫ খ্রি.

উত্তর - ১৯১৯ খ্রি.

151. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো—

- ক) ভারতবর্ষকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা
খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
গ) পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা বাতিল
ঘ) মন্ত্রিসভা গঠন নিষিদ্ধ

উত্তর-প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

152. ভাস্কো-দা-গামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন?

- ক. মরক্কো খ. আমেরিকা
গ. পর্তুগিজ ঘ. ফরাসি

উত্তর - পর্তুগিজ

153. সেনরা বাংলায় এসেছিল কোথা থেকে?

- ক. ব্রিটেন খ. উত্তর ভারত
গ. পশ্চিম ভারত ঘ. দক্ষিণ ভারত

উত্তর - উত্তর ভারত

154. শায়েস্তা খানের দৈনিক আয় ছিল-

- ক) পাঁচ লক্ষ টাকা খ) চার লক্ষ টাকা
গ) দুই লক্ষ টাকা ঘ) এক লক্ষ টাকা

উত্তর - দুই লক্ষ টাকা

156. বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠাকালে কতজন সদস্য ছিল?

- ক) ১০ জন খ) ১১ জন
গ) ১২ জন ঘ) ১৫ জন

উত্তর - ১৫ জন

157. বাংলায় সিপাহি বিদ্রোহে কে নেতৃত্ব দেন?

- ক) মঙ্গল পাণ্ডে খ) মোস্তফা কামাল
গ) নিসার আলী ঘ) আনসার আলী

উত্তর - মঙ্গল পাণ্ডে (সিপাহী বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাবিলদার রজব আলী। তবে, এই বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন ব্যারাকপুরের সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে, যার পরবর্তীকালে অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।)

158. ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক কয় জন মন্ত্রীকে ভারত সচিব পদে মনোনীত করা হয়?

- ক) ১ জন খ) ২ জন
গ) ৩ জন ঘ) ৪ জন

উত্তর - ১ জন

159. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে?

- ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা খ) নবাব আলীবর্দী খাঁ
গ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

ঘ) ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি

উত্তর - ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

160. কোন মুঘল সম্রাটের সময়কালে ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল?

- ক) সম্রাট আকবর খ) সম্রাট শাহজাহান
গ) সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ) সম্রাট আওরঙ্গজেব

উত্তর - সম্রাট আওরঙ্গজেব

161. ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন কোথায় পাস হয়?

- ক) ভারতীয় পার্লামেন্টে খ) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে
গ) ফরাসি পার্লামেন্টে ঘ) মার্কিন সিনেটে

উত্তর - ব্রিটিশ পার্লামেন্টে

196. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে “U-Boat” বলতে বোঝায়—

- ক) জার্মান ট্যাংক খ) সাবমেরিন
গ) যুদ্ধবিমান ঘ) রকেট

উত্তর: খ) সাবমেরিন

197. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে “ম্যানহাটন প্রকল্প” সম্পর্কিত—

- ক) ট্যাংক উন্নয়ন
খ) পারমাণবিক বোমা তৈরি
গ) রাডার প্রযুক্তি
ঘ) সাবমেরিন

উত্তর: খ)

198. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় “ডি-ডে” (D-Day) সংঘটিত হয়—

- ক) ১৯৪৩ সালে খ) ১৯৪৪ সালে
গ) ১৯৪৫ সালে ঘ) ১৯৪২ সালে

উত্তর: খ) ১৯৪৪ সালে

199. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের তারিখ—

- ক) ৬ আগস্ট ১৯৪৫
খ) ৯ আগস্ট ১৯৪৫
গ) ১৫ আগস্ট ১৯৪৫
ঘ) ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

উত্তর: ঘ) ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

200. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে “No Man’s Land” বলতে বোঝানো হয়—

- ক) শত্রু রাজধানী
খ) দুই দেশের সীমান্ত
গ) ফ্রন্ট লাইনের মাঝের বিপদজনক অঞ্চল
ঘ) নিরপেক্ষ রাষ্ট্র
উত্তর: গ)

- The End -